কিশোর রচনাসম্ভার ৩

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

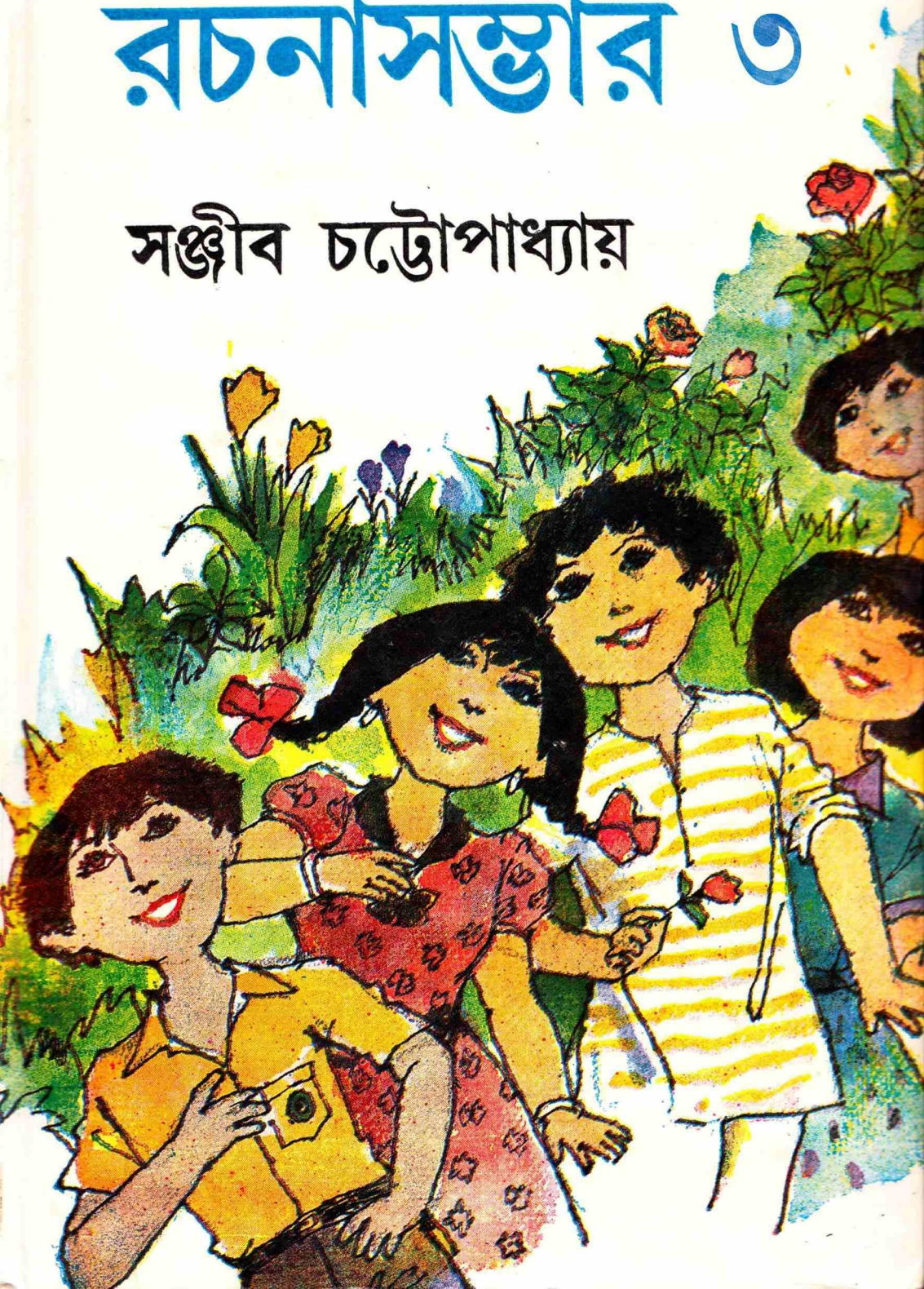

KISHORE RACHANASAMBHAR, PART - III
A Collection of Juvenile stories in Bengali
by SANJIV CHATTOPADHYAYA
Published by Subhas Chandra Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Rs. 100.00

প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ১৯৯৮, মাঘ ১৪০৪
দ্বিতীয় সংস্করণ : আগষ্ট ২০০১, শ্রাবণ ১৪০৮

প্রচ্ছদ : সুধীর মৈত্র

দাম : ১০০ টাকা

ISBN-81-7612-152-5

প্রকাশক : সুভাষচন্দ্র দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

pathagar.net

আমার শ্রদ্ধেয়া

বড়মা

পরিব্রাজিকা আনন্দহৃদয়ার

করকমলে

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাপীঠ

ঝাড়গ্রাম

pathagar.net

লেখকের অন্যান্য বই

থ্রি-এক্স
সপ্তকাণ্ড
সাত টাকা বারো আনা
হাসি কান্না চুনি পান্না
পুরনো সেই দিনের কথা
গাধা
সুখ ১ম
সুখ ২য়
সুখ ৩য়
গৃহসুখ
আন্দামান ঃ ভারতের শেষ ভূখণ্ড
শ্রীচরণকমলে
দাদুর কীর্তি
বাঙালিবাবু
কিশোর রচনাসম্ভার (১ম)
কিশোর রচনাসম্ভার (২য়)
বড়মামার কীর্তি
হেডস্যারের কাণ্ড
কাটলেট
রাত বারোটা
গাঙচিল
ফিচির মিচির

pathagar.net

সূচীপত্র

গল্প	পৃষ্ঠা
রাবণবধ	৯
হেডস্যারের সমাজসেবা	৫৪
রাত বারোটা	৯০
অবতার	৯৬
মহাপ্রস্থান	১০২
কাচ	১১৩
হাত না ডাল	১১৬
ভূতের খেলা	১২৩
ঠিক মাঝরাতে	১২৮
রহস্য	১৫৫
বাঘমারি	১৭৭
ভূত অদ্ভুত	১৮৩
কুশলের সাইকেল	১৮৯
আবিষ্কার	১৯৪
আমিই গোয়েন্দা	২০২
নিশির ডাক	২০৬
ফেরা	২১১
গোলকিপার	২১৭
সন্ধান	২২৩
গোল	২২৬
তোমার তরবারি	২২৯
জয় পরাজয়	২৬২

410
19.2005

pathagar.net

রাবণবধ

ভীষণ উত্তেজনা, হইহই কাণ্ড। স্কুলের 'অ্যানুয়েল প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সেরিমনি' এসে গেছে। এবারে খুব ঘটা হবে। স্কুলের মাঠে প্যান্ডেল বাঁধা শুরু হয়ে গেছে। হেডমাস্টারমশাই আর স্কুল সেক্রেটারি কেবল বলছেন, "অ্যাটলিস্ট থাউজেন্ড, মিনিমাম হাজার লোকের অ্যাকোমোডেশন চাই। তার কমে হবে না। গভর্নর আসছেন। এই স্কুলের ইতিহাসে এই প্রথম। রেড কার্পেট চাই। মিনিমাম এক মণ ফুল।"

অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারমশাই খুব স্পষ্টবক্তা। পান খান দোক্তা দিয়ে, সেই কারণে জিভ অতিশয় ধারালো। জমিদারের ছেলে। কারও পরোয়া করেন না। বাড়িতে রাধাগোবিন্দের মন্দির। অষ্টধাতুর যুগল মূর্তি। মাথায় ছাতা। দুই সের মিনিমাম। কমসে-কম তিনশো ভরি সোনা। পূর্বপুরুষের কেরামতি। সারারাত লাঠি হাতে মন্দির-চাতালে জেগে থাকেন। ঘুমোলেই ছাতাসমেত মূর্তি হাওয়া হয়ে যাবে। ভগবান বড়, না সোনা বড়! অবশ্যই সোনা। এ শোনা কথা নয়। প্রত্যক্ষ সত্য।

অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড পানঠাসা মুখে, ফোলা-ফোলা শব্দে বললেন, "এক মণ ফুল! ইউ আর এ ফুল। এখানে কি শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা হবে! এই স্কুল আমার পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি নয়াপয়সা হিসেব করে খরচ করতে হবে। হার্ড ডেজ। মানুষের হাঁড়ি চড়ছে না। এক মণ ফুল!" বলেই, সেই কোটেশনটা হাঁকড়ে দিলেন, যেটা আমি রচনা লিখতে গেলেই কায়দা করে ঢুকিয়ে দি, "লাইফ ইজ নট এ বেড অব রোজেস। এক মণ ফুল কী করবেন?"

হেডমাস্টারমশাই সাহিত্যের মানুষ। কল্পনার জগতে বিচরণ করেন। তাঁর চোখ ঢুলঢুলু হয়ে গেল। তিনি বলতে লাগলেন, "ফ্লোর‍্যাল ওভেশন টু হিজ একসেলেন্সি। লাল পাড় সাদা শাড়ি পরে দু'দিকে দাঁড়িয়ে থাকবে দু' সার মেয়ে, হাতে শঙ্খ।"

"শাঁখ বলতে পারেন না?"

খিঁচিয়ে উঠলেন সহপ্রধান, "সবসময় শুদ্ধ ভাষা। যেন বিশুদ্ধ গব্যঘৃত! শঙ্খ, লম্ফ, ঝম্ফ। শুদ্ধ বলবেন তো পুরোটাই শুদ্ধ বলুন, দুই পার্শ্বে রমণীগণ শঙ্খ হস্তে দণ্ডায়মান থাকিবে।"

"আপনার মশাই অত্যন্ত ইরেশেবল টেম্পারামেন্ট।"

pathagar.net

"অ্যায়, আবার ওয়েবস্টার থেকে একটা পটকা ছাড়লেন। ইংরেজিতে, বাংলাতে, সংস্কৃতে জগাখিচুড়ি। হিন্দিটা বাকি থাকে কেন! কিশমিশের মতো ঢুকিয়ে দিন।"

হেডমাস্টারমশাই আবার তাঁর নিজের ভাবে ফিরে গিয়ে বলতে লাগলেন, "এধারে কুড়িজন বালিকা, ওধারে কুড়িজন বালিকা! লাল কার্পেটের ওপর দিয়ে মাননীয় রাজ্যপাল এগিয়ে আসছেন। চল্লিশটা শাঁখ একসঙ্গে বাজছে, পুঁউউউ।"

"চল্লিশটা শাঁখ একসঙ্গে বাজতে পারে না, অসম্ভব।"

"কেন পারে না। চল্লিশটা শাঁখ, চল্লিশজোড়া ঠোঁট। ফুঁউউউ।"

"অতই সোজা! শাঁখ কোনওদিন বাজিয়েছেন নিজে? মোস্ট ডিফিকাল্ট ইনস্ট্রুমেন্ট অন আর্থ। আমার স্ত্রী একদিন বাপের বাড়ি যাওয়ার সময় বলে গেলেন, ক্রশওয়ার্ড পাজল নিয়ে বসে আছ থাকো, তাতে তোমার খাই-খাইটা একটু কমবে, তবে ঠাকুরঘরে ঠিক সময়ে সন্ধেটা যেন পড়ে। তিনবার শাঁখ বাজাবে। অতঃপর সন্ধ্যাকালে মধ্যগগনে তারার চক্ষু ফুটিবামাত্র ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলাম, দ্বারদেশে গঙ্গাজল ছিটাইলাম, তিনবারের প্রচেষ্টায় দীপ জ্বলিল, বাতাস কম্পমান, মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধার মতো খাবি খাইতেছে দেখিয়া দক্ষিণের গবাক্ষ বন্ধ করিলাম। একজোড়া ধূপ জ্বালাইয়া, নৃত্য করিতে-করিতে চিত্রপটসমূহে আরতি করিলাম। তাহার পর ওষ্ঠে তুলিলাম সিন্দূরচর্চিত শঙ্খ। ভাবিয়াছিলাম সহজ হইবে। মহাশয়, প্রথমে মৃদু ফুঁ মারিলাম। ফুস করিয়া তাহা পশ্চাদ্দেশ দিয়া বাহির হইয়া গেল। নির্গমনপথে হস্তদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া আবার মারিলাম, এইবার সবেগে। পুঁ শব্দ নির্গত হইল না। মুখে গঙ্গাজল ঢালিলাম।"

"কাহার মুখে?"

"অবশ্যই শঙ্খের মুখে। এমন মূর্খ আমাকে ভাবিবেন না, যে নিজের মুখে দূষিত গঙ্গাজল ঢালিব। জলের ব্যাপারে আমি অতিশয় সতর্ক। জলই সকল রোগের উৎস। শঙ্খের ছিদ্রে জল দিয়া হাতের তালু তাহার উপর বারকয়েক ঠুকিলাম। পুঁত-পুঁত করিয়া শব্দ হইল। ভাবিলাম, শঙ্খ এইবার আর্তনাদ করিবে। গণ্ডদেশ স্ফীত করিয়া সবেগে ফুঁ মারিলাম। ফুঁ ফসকাইয়া গেল। শঙ্খ শব্দ করিল না। আমার মেজাজ ক্ষিপ্ত হইল। স্বাধীনতাসংগ্রামীর মতো মনে মনে বলিলাম, করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। প্রতিবেশীর আলয়ে-আলয়ে শঙ্খ বাজিয়া গেল। আমার শঙ্খ নীরব। কেবল আমার ফুৎকারের শব্দ। শঙ্খের পরিবর্তে নিজেই ফুঁ-ফুঁ করিয়া বাজিয়া চলিলাম। রক্তের চাপ বাড়িয়া গেল। চক্ষুদ্বয় রক্তগোলক হইল। মানসলোকে অশ্লীল শব্দসমূহ ঘুরপাক খাইতে লাগিল। গণ্ডদেশ টাটাইয়া উঠিল। রাত্রি নয় ঘটিকার সময় আমার স্ত্রী আসিয়া

pathagar.net

আমাকে উদ্ধার করিলেন। বৈদ্য আসিয়া বিধান দিলেন, দুই গণ্ডে বরিক কম্প্রেস। গাল ফুলিয়া গোবিন্দর মা হইয়া তিন দিবস চিতপাত। আমার ধর্মপত্নী কহিলেন, পাপীরা শঙ্খ বাজাইতে পারে না। উহা পুণ্যবানের কর্ম। অতএব মহাশয়, ওয়ান, টু, থ্রি চল্লিশটি শঙ্খ একই সঙ্গে বাজিবে, এমন উচ্চাশা করিবেন না। অতিশয় বিপাকে পড়িবেন।"

হেডমাস্টারমশাই বলিলেন, "দুশ্চিন্তা অথবা আনন্দের কোনও কারণ নাই। আমি প্রতিদিন অনুশীলন করাইব। অনুশীলনে পণ্ডিতও মূর্খ হইয়া যায়। বোধ হয় ভুল করিলাম। অনুশীলনে অপটুও পটু হয়ে যায়। এইবার কল্পনা করুন সেই অনির্বচনীয়, স্বর্গীয় দৃশ্য। মহামান্য রাজ্যপাল ধীরে ধীরে আসিতেছেন। শঙ্খ নির্ঘোষে আকাশ-বাতাস কম্পিত হইতেছে। চতুর্দিক হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। নেপথ্যে গীত হইতেছে আগমনী সঙ্গীত, শঙ্খে-শঙ্খে মঙ্গল গাও, জননী এসেছে দ্বারে।"

সহপ্রধান গলা বিকৃত করে বললেন, "রাজ্যপাল যদি জননী হন তাহা হইলে আপনার ব্যাকরণ জ্ঞান সম্পর্কে আমার সন্দেহ হইতেছে। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণখানি পড়িবার অনুরোধ জানাইতেছি। বৃদ্ধ হইলেও শিক্ষা করিবার কোনও বয়স নাই। পুত্রের সহিত মূর্খ পিতাও একই শ্রেণীতে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন।"

"মহাশয়, জ্ঞান আপনারই লাভ করা উচিত। যিনি পালন করেন, তিনিই পাল, তিনিই জননী।"

"আপনার মুণ্ডু। যিনি পালন করেন, তিনি পিতা। পালের স্ত্রীলিঙ্গ পালিকা। গান বন্ধ করুন। রাজ্যপাল অপমানিত হইলে বিদ্যালয়ের 'এড' বন্ধ হইয়া যাইবে। আমাদের হাঁড়িসকল শিকায় উঠবে। আর এক মণ অক্ষত পুষ্প ভদ্রমহোদয়ের মস্তকে বর্ষিত হইলে আনন্দোৎসব শোকসভায় পর্যবসিত হইবে। পতাকা অর্ধনমিত হইবে। হত্যার অপরাধে কারারুদ্ধ হইবেন। এক মণ পুষ্প নহে, এক সের পুষ্পচূর্ণ ক্রয় করিলেই যথেষ্ট হইবে। সর্ব বিষয়ে বাড়াবাড়ি করাই আপনার চিরকালের অভ্যাস। রাজপুরুষদের তৈলমর্দন করিয়াই আপনি আখের গুছাইয়াছেন। আপনার কোনও তুলনা নাই।"

প্রধানশিক্ষকমশাই রেগে ঘরের বাইরে উঠে গেলেন। সহপ্রধানশিক্ষক হা-হা করে হাসতে লাগলেন। আমরা ছাত্ররা বোকার মতো বসে রইলুম। মিটিং-এ আরও অনেক আলোচনার বিষয় ছিল। ছেলেরা নাটক মঞ্চস্থ করবে। কী নাটক, কোন নাটক, কে-কে অভিনয় করবে, এইসব আলোচনা হলই না। বাংলার স্যার ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "যে-কোনও সভা পণ্ড করার প্রতিভা আপনার অসীম। বয়েস বাড়ছে, না কমছে। ছাত্রদের উপস্থিতিতে এই আচরণ শ্লাঘার নয় মোটেই। লজ্জিত হওয়া উচিত।"

pathagar.net

সহপ্রধান হাসতে-হাসতে বললেন, "আপনাদের এই বাংলার টিচারদের স্টকে ওই একটা শব্দই আছে, শ্লাঘা। শুনলেই কুঁই-কুঁই করে হাসতে ইচ্ছে করে। শ্লাঘা বল্যা, বল্কল, গালা। সহজ ভাষায় কথা বলতে পারেন না। শুনুন, জীবনের সব কিছুকে লঘু করে নিতে শিখুন। আনন্দ, আনন্দ।"

তিনি হাঁক পাড়লেন, "কী হল। কোথায় গেলেন মশাই। পুরুষের রাগ পাঁচ মিনিটের বেশি থাকা উচিত নয়। চলে আসুন। গরম ফুলকপির শিঙাড়া খাওয়াব।"

ঘরের বাইরেই স্কুলের দোতলার ছোট ছাত। ইংরেজ আমলের বাড়ি। সেই কারণেই আলসের খুব শোভা। অনেকটা গড় মান্দারণের মতো। ফুলগাছের টব সাজানো। গাছ নেই, ফুলও নেই। খটখটে শুকনো মাটি। কে যত্ন করবে ? হেডমাস্টারমশাই ছাত থেকে বললেন, "আমার খুব নস্যি নিতে ইচ্ছে করছে। ডিবে ফেলে এসেছি।"

সহপ্রধান বললেন, "সে-ব্যবস্থা হবে। দয়া করে ঘরে আসুন। মিটিং বন্ধ হয়ে আছে।"

হেডমাস্টারমশাই বললেন, "যাঃ, সর্বনাশ হয়ে গেল !"

"কী আবার হল !"

"করে দিয়েছে।"

"কী করে দিয়েছে ?"

"তিনতলার আলসেতে কাক বসে ছিল, একেবারে ডাইরেক্ট হিট।"

"কোথায় ?"

"পাঞ্জাবির পিঠে।"

"চলে আসুন। শুভ লক্ষণ। আগাম জানিয়ে দিয়ে গেল, আপনি স্ট্যাচু হবেন। সারা বছর ধরে কাক পার্কে-পার্কে স্ট্যাচু হোয়াইটওয়াশ করে। মশাই, আপনার যশ খ্যাতি এমনই সুবিস্তৃত হবে যে, মূর্তি স্থাপন করবেন সরকার।"

হেডমাস্টারমশাই ঘরে এলেন, "গা ঘিনঘিন করছে, কারণ কাক বড় কুখাদ্য খায়।"

"খেলেই বা, পেটে গিয়ে সব চুন হয়ে যায়। ওদের পেটে একধরনের কেমিক্যাল থাকে, ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড। ঘিনঘিন করার কোনও কারণ নেই। দেখেননি বিদ্যাসাগর, রামমোহন, স্যার আশুতোষ, গিরিশচন্দ্র, সব সাদা হয়ে বসে আছেন। তাঁদের যা ঘিনঘিন করছে কি ! ছটফট না করে স্থির হয়ে চেয়ারে বসুন।

হেডমাস্টারমশাই চেয়ারে সিঁটিয়ে বসলেন। বাংলার স্যার কনভেনার। তিনি বললেন, "কাজের কথায় আসা যাক।"

সহপ্রধান বললেন, "আসা যাক।"

pathagar.net

হেডমাস্টারমশাই বললেন, "নস্যি আর শিঙাড়া!"

অঙ্কের স্যার ডিবেটা এগিয়ে দিতে-দিতে বললেন, "নস্যিটা দিতে পারছি। শিঙাড়া আমার দায়িত্ব নয়।"

সহপ্রধান বললেন, "দোকানের শিঙাড়া খাওয়া উচিত নয়। খেলেই অম্বল। আজ সকাল গ্যাস লিখিয়ে এসেছি। দশ-বারো দিন পরে এসে যাবে, তখন একঝুড়ি ভেজে এনে খাওয়াব। বড়-বড় ফুলকপি, কড়াইশুঁটি, বাদাম। সে-জিনিস খেলে তুরীয় অবস্থা হবে।" হেডমাস্টারমশাই শাঁ করে নস্যি নিয়ে বললেন, "জানতুম। ওয়ান পাইস ফাদার-মাদার। তা না হলে বড় রাস্তার ওপর অত বড় বাড়ি এই বাজারে করা যায়!"

অবশ্যই যায়। সিগারেট, নস্যি, চা, তিনটেই খাই না। বিয়ে, পৈতের নেমন্তন্ন অ্যাটেন্ড করি না। বাড়িতে কোনও কাজের লোক রাখিনি। শ্যাম্পু ব্যবহার করি না। ট্যাক্সি চাপি না। রেস্তোরাঁয় ঢুকে চপ-কাটলেট খাই না। সেইজন্যে আমার অসুখ করে না, কথায়-কথায় ডাক্তার ডাকতে হয় না। মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ি না। পছন্দ হয়েছে বলেই জিনিস কিনে ফেলি না, প্রয়োজন হলে তবেই কিনি। ভাত-ডাল, ডাল-রুটি এই আমার খাদ্য। দু' বেলা দু'বার পেট ঠুসে খেয়ে নিই। খুচুরখুচুর জলখাবার আর খেতে হয় না। ফলে, আমার একের-চার খরচ, তিনের চার-সঞ্চয়।"

বাংলার স্যার বললেন, "এইরকম একটি জীবনকেই বলে, আমার জীবনই বাণী। করমবীর ধরমবীর।"

"সভার কাজ শুরু করুন।" গম্ভীর গলায় আদেশ করলেন অঙ্কের স্যার।

সহপ্রধান বললেন, "রাজ্যপালকে আনার কী দরকার শুনি। পুলিশে পুলিশে সব ছয়লাপ। সিকিউরিটি। কম্যান্ডো। স্বাভাবিক অবস্থা বিপর্যস্ত। আমার মনে হয় এই জায়গাটা আমরা আর-একবার রি-কনসিডার করতে পারি।"

প্রধানশিক্ষক বললেন, "হরিনারায়ণ বিদ্যাপীঠ গভর্নরকে এনেছিল।"

"এনেছিল এনেছিল, সো হোয়াট। ওরা এনেছিল বলে আমাদেরও আনতে হবে!"

"ম্যাটার অব প্রেস্টিজ।"

"বারোয়ারি পুজোর মেজাজ নিয়ে স্কুলের অ্যানুয়াল করবেন! প্রতিষ্ঠানের কথা, নিজেদের বয়েসের কথাটা একবার ভাববেন না?" মুখ বিকৃত করে বললেন, "হরিনারায়ণ এনেছিল। তা হলে তো আমাদের প্রেসিডেন্টকে আনতে হয়।"

বাংলার স্যার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, "কী যন্ত্রণা মশাই। এইভাবে মিটিং চালানো যায়!"

pathagar.net

"খুব যায়। মিটিং মানেই দু'দশ কথা। তর্কাতর্কি। পড়েননি। অ্যাসেম্ব্লিতে কী হয়! জুতো ছোড়াছুড়ি, ওয়াকআউট! এসব যদি না-ই হল, তো মিটিং হল কী!"

"হেডমাস্টারমশাই একবার ওয়াকআউট করেছেন, করে এই মিটিং-এর গর্ব বাড়িয়েছেন। এইবার নেক্সট আইটেম। কনচসেল ব্লোয়িং রাজ্যপাল ধীরে ধীরে কামিং, সামনে ভগীরথ, হাতজোড়। কে ভগীরথ হবে!"

"অবশ্যই হেডমাস্টারমশাই, কারণ তিনি এই বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের হেড।"

"বেশ, ভাল কথা, কিন্তু দেয়ার ইজ এ বাট। সেটা হল পায়ে আর্থারাইটিস। হাঁটার সময় একটু খুঁড়িয়ে হাঁটেন। দৃশ্যটা অবলোকন করুন। সামনে খোঁড়া ভগীরথ লিম্পিং, পেছনে স্ট্রেট রাজ্যপাল গ্যাটম্যাট। কেমন দেখাবে!"

"ভগীরথের বয়েস হয়েছে, বাত অবশ্যই হতে পারে।"

"আমার সাজেশান, হেডমাস্টারমশাই পেছনে থাকুন। তিনি পেছন দিক থেকে গঙ্গাকে পুশ করবেন।"

সহপ্রধান বললেন, "যদি গ্রেস আর ডিগনিটির কথা বলেন, তা হলে সামনে থাকবেন আমাদের গেমটিচার। পারফেক্ট হেল্‌থ, মিলিটারি-চলন। আর আমরা সব ফুটকড়াইয়ের মতো পেছনে-পেছনে গড়াতে-গড়াতে আসব।"

"হেডমাস্টারমশাই কী বলেন?"

"নট এ ব্যাড প্রোপোজাল। অ্যাকসেপ্‌টেড।"

"রাজ্যপাল সিঁড়ি দিয়ে মঞ্চে উঠেছেন।"

"ওয়েট। সিঁড়িটা কেমন হবে। গেল, গেল মচকে গেল টাইপ!" সহপ্রধান বাধা দিলেন, "রাজ্যপালকে দাঁড় করিয়ে রাখুন। আগে মঞ্চটা পাকা হোক। মঞ্চটা হচ্ছে কোথায়! সাইজ কী! ডেকরেশান কেমন?

হেডমাস্টারমশাই বললেন, "আপনি ট্রেজারার। দ্যাট ইউ আর টু ডিসাইড। কাট ইয়োর কোট অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর ক্লথ।"

"বাঃ, বেশ কথা! রাজ্যপাল আপনার, আর মঞ্চ আমার! সাধারণ কোনও লোক হলে আমি যেমন-তেমন তক্তা ফেলে যা হোক না হোক একটা কিছু বানিয়ে দিতুম। একটা বেঞ্চ রেখে বলতুম যা হোক কাঁধে ভর রেখে উঠে যান। আমার কম খরচে হয়ে যেত। এ এক ভি ভি আই পি-কে এনে ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। এ তো এখন রীতিমত ডায়াস চাই। শুধু তাই নয়, আগের দিন সিকিউরিটির সাতজন এসে নেচেকুঁদে শক্তি পরীক্ষা করে যাবে। যতক্ষণ রাজ্যপাল ডায়াসে থাকবেন, ততক্ষণ সিকিউরিটির দু'জন তলায় হামাগুড়ি দিয়ে বসে থাকবে। মঞ্চটাকে সেইজন্যে রীতিমত উঁচু করতে হবে।"

হেডমাস্টারমশাই বললেন, "আপনার আবার বেশি-বেশি। ভূতসব করতে হয় না!"

pathagar.net

"কিসুই জানেন না, চুপ করুন। রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, এঁদের জীবনের কোনও দাম আছে! একটু আলগা দিলেই সন্ত্রাসবাদীরা নির্মমভাবে মেরে ফেলবে। মনে নেই, রাজীব গান্ধীকে কীভাবে মারল আর ডি এক্স দিয়ে!"

"এখানে সন্ত্রাসবাদী কোথায়!"

"মাথামোটা! এখানে এখন কোনও মাছি আছে? নীল-নীল ডুমো ডুমো মাছি?"

"নেই।"

"একটা আম আনুন, আমি ছুরি দিয়ে কাটছি। দেখি মাছি আছে কি নেই। সন্ত্রাসবাদীরা গন্ধে-গন্ধে উড়ে আসে।"

"একটা নিরীহ রাজ্যপালকে মেরে লাভ?"

"আপনার ওই পোস্ত আর ডাঁটাচচ্চড়ি খাওয়া মাথায় ঢুকবে না। এটা একটা বাদ, মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, সমাজবাদ, বহুজন সমাজবাদের মতোই সন্ত্রাসবাদ। বড়-বড় কিছু লোককে বাদ দেওয়াই যাদের কাজ। উইবাদ, ইঁদুরবাদের মতো।"

"শেষের দুটো কী বললেন?"

"ইঁদুর আর উই, জিজ্ঞেস করে দেখবেন তো, রবীন্দ্র রচনাবলী খেলে কেন? দাঁত বের করে হাসবে, জানি না তো স্যার। এইটাই আমাদের বাদ, ইজ্‌ম। ইঁদুরজিম্। আপনি মশাই বহুত খরচের ধাক্কায় ফেলে দিলেন। রীতিমত একটা মঞ্চ চাই। লাল কার্পেট পাততে হবে। রাজার সিংহাসনের মতো চেয়ার। গলায় গোড়ের মালা দিতে হবে।"

বাংলার স্যার বললেন, "দ্যাট্‌স নো প্রবলেম। আমার নাতনিটা একেবারে ফুটফুটে, জাস্ট এ ডলপুতুল, সেই নাচতে-নাচতে এসে মালাটা পরিয়ে দেবে।"

"বাংলার শিক্ষক যখন ইংরেজি বলেন, তখনই জানবেন রিয়েল প্রব্‌লেম। গভর্নরের গোড়ার মালা। এ আপনার দু'দশ টাকার কর্ম নয়। মিনিমাম টুহান্ড্রেড। বাঘের লেজের মতো ইয়া মোটা। সব টাকা তো আপনার ফুল আর প্যান্ডেলেই ফৌত হয়ে যাবে। ছেলেদের পুরস্কার আর দেবেন কী করে!"

হেডমাস্টারমশাই কাঁচুমাচু মুখ করে বললেন, "রাজ্যপালকে তা হলে বাদই দিয়ে দিন।"

"কী করে দেবেন! তাঁর অ্যাক্‌সেপ্‌টেন্স চিঠি এসে গেছে। তাঁর ডায়েরিতে এন্ট্রি হয়ে গেছে।"

"পরিষ্কার একটা রিগ্রেট লেটার, অনারেবল স্যার, ডিউ টু শর্টেজ অফ ফান্ড, উই আর আনএব্‌ল টু হ্যান্ডল টু ইউ। ইউ আর টু কস্টলি ফর আওয়ার পুয়োর স্কুল।"

সহপ্রধান চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে বললেন, "সাধে মাথা মোটা বলি!

pathagar.net

আমাদের একটা প্রেস্টিজ আছে তো ! মানসম্মান ! টাকা তুলতে হবে। ডাইভ দিন। ডোনারস্, অভিভাবক। দোরে-দোরে ঘুরতে হবে। কত বড় কথা, রাজ্যপাল আসছেন ! রোমাঞ্চ হচ্ছে। আজি পুলকিত ধরণী আনন্দে।"

অঙ্কের স্যার বললেন, "এতক্ষণে মনে হচ্ছে জিনিসটা আপনাকে ধরেছে। গ্রিপ করেছে। আপনি একবার ধরে নিলে কোনও ভাবনা নেই। স্ট্রেট বেরিয়ে যাব, উইথ ফ্লাইং কলার্স।"

সহপ্রধান সোজা হয়ে বসে বললেন, "দেখি, প্যাডটা এগিয়ে দিন।"

হেডমাস্টারমশাই তড়িঘড়ি প্যাডটা এগিয়ে দিলেন।

"এ ডটপেন প্লিজ। আমারটা গেছে। কে যে মেরে দিলে !"

হেডমাস্টারমশাই ডটপেন দিলেন। সহপ্রধান প্যাডের কাগজে নকশা আঁকছেন আর বলছেন, 'মঞ্চটা ইস্ট-ওয়েস্টে লম্বা হবে, ফেসিং সাউথ। পুব দিকে তিনধাপ সিঁড়ি, নট মোর দ্যান দ্যাট। বৃদ্ধ মানুষ। হার্টে চাপ পড়ে যাবে। সিঁড়ি বেশ চওড়া, উইথ হাতল। হ্যান্ড রেল থাকা উচিত, ফর প্রোটেকশন। তিনজন পাশাপাশি উঠতে পারে এতটাই চওড়া। দু'পাশে দু'জন সিকিউরিটি. মাঝখানে রাজ্যপাল। পেছনে তিনজন। রাজ্যপালকে ঘিরে থাকবে হিউম্যান ওয়াল। মঞ্চের মাঝখানে রেড কার্পেট। সেন্টারে সিংহাসন চেয়ার, দু' পাশে সাধারণ চেয়ার। সামনে একটা লম্বা টেবিল। শক্তপোক্ত। লড়বড়ে লয়। সরি ! নড়বড়ে নয়। গর্জাস টেবিলক্লথ। ড্রয়িং পিন দিয়ে ফিক্স করা। নয়তো বারেবারে গুটিয়ে যাবে, ঝুলে যাবে, এলোমেলো হয়ে যাবে। যা অন্যসব সভায় হয়। মশাই ! দেখে শিখতে হয়। যদি শিখতেই না পারলেন, তা কিসের শিক্ষক !"

"ফুলদানি সম্পর্কে কিছু ভেবেছেন ? সবার আগে তো ওই দুটোই উলটে কিছুক্ষণের জন্য সভা পণ্ড করবে। অথচ দুটো ফুলদান তো টেবিলে রাখতেই হবে। টেবিলের শোভা।"

"নো ফুলদান। অত্যন্ত ছেঁচড়া জিনিস। দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, ফুলের ভারে টলে পড়ে যায়। মুখ আড়াল করে। দর্শকদের চিৎকার। ফুলদান আমরা রাখবই না। তার বদলে থাকবে ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট, যাকে বলে ইকেবানা। পোর্সিলেনের একটা গামলি। তাইতে নানারকম ফুলের ফ্যাসফোঁস। ঝাঁটাকাঠি, মাথায় আলু গোঁজা। একেবারে ফ্ল্যাট। কেতরে যাওয়ার ভয় নেই।"

"কে করবে ওই ইবেকানা ?"

"আঃ, ইবেকানা নয়, ইকেবানা। কে আবার করবে ? আমি করব। কসমস, অ্যাস্টার, গ্ল্যাডিওলি, নস্ট্রাসিয়ান কিনে আনব। দেখবেন, সে যা হবে না ! ফ্যান্টাস্টিক ! আচ্ছা, ডায়াস প্ল্যানিং হয়ে গেল !"

হেডমাস্টারমশাই বললেন, "মনে থাকে যেন, সবশেষে ওই মঞ্চে থিয়েটার হবে, রাবণবধ।"

pathagar.net

"ওব্বাবা, গোদের ওপর বিষফোঁড়া। থিয়েটার ঢুকিয়েছেন!"

"ঢোকাব না! ছেলেরা সব মুখিয়ে আছে। থিয়েটার করবে। একটু বিচিত্রানুষ্ঠান মতো হবে।"

"তা হলে তো স্টেজ করতে হবে। ড্রপসিন লাগাতে হবে। উইংস রাখতে হবে। হয়ে গেল! ডবল খরচ! একটা সেটেই হবে, না দৃশ্য পালটাতে হবে?"

বাংলার স্যার বললেন, "দৃশ্য তো পালটাতেই হবে। পালাটা তো আমিই লিখছি।"

"সে আপনি একটা কেন, দুশোটা লিখুন; কিন্তু সেট সেটিংস, ড্রেস, মেকআপ, এইসবের খরচ কে জোগাবে?"

"সেটা তো আমার জানার কথা নয়। আমি নাট্যকার, ডিরেক্টর। আপনারা আমাকে স্টেজ দেবেন, আমি দর্শকদের ভাল পালা দেব। টাকার চিন্তা আপনার।"

"আপনারা প্রত্যেকেই তা হলে আপনাদের স্ত্রীর একটা করে গয়না এনে জমা দিন। বিক্রয়লব্ধ অর্থে আমাদের ফাংশান হবে। তা না হলে এত টাকা আসবে কোথা থেকে!"

"কেন আসবে না! কিশোর সঙ্ঘের কালীপুজোর বাজেট কত টাকা জানেন? পাঁচ লাখ।"

"তা হলে এক কাজ করুন। কিশোর সঙ্ঘের সেক্রেটারিকে ডেকে আনুন। একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে কোন মূর্খ হাজার-হাজার টাকা চাঁদা দেবে শুনি। না দিলে প্রাণের ভয় আছে কী! ভয় না দেখালে মানুষ দান করে না। আপনারা পারবেন ছোরাছুরি নিয়ে চাঁদা আদায় করতে? জেনে রাখুন, এ-দেশে এখন স্কুলের চেয়ে ক্লাব বড়।"

বাংলার স্যার বললেন, "আপনার কাছে আমি সারেন্ডার করছি স্যার, যেভাবেই হোক আমাদের নাটকটা তুলে দিন স্যার। ছেলেরা আশা করে আছে।"

সহপ্রধান একটু যেন খুশি হলেন, কারণ পকেট থেকে পানের ডিবে আর জর্দার কৌটো বের করলেন। প্রধানশিক্ষক করুণ গলায় বললেন, "এখন আবার পান কেন, অনেকক্ষণ যে কথা বলতে পারবেন না, পানঠাসা মুখে কেবল উ-উ করবেন। এখন আমাদের ঘোর সঙ্কট, এই সময় আপনার কথা বন্ধ হয়ে গেলে কেমন করে চলে।"

"দ্যাটস ট্রু" সহপ্রধান ডিবে স্পর্শ করলেন না। বাংলার স্যারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার দৃশ্য ক'টা? নাটকটার সংক্ষেপে বলুন।"

বাংলার স্যার উৎসাহিত হয়ে বললেন, পুরোটা শুনবেন? খাতাটা আমার কাছেই আছে।"

pathagar.net

"না, না, পুরো নাটক শোনার মতো মনের অবস্থা এখন নেই। এখন শুধু টাকা আর টাকা। ইন এ নাটশেল দৃশ্যগুলো বলুন। সেইটাই মোর ইম্পর্ট্যান্ট দ্যান ইয়োর নাটক।"

বাংলার স্যার শুধু করলেন, "অযোধ্যার রাজপ্রসাদ। সিংহাসনে রাজা দশরথ। চারপাশ একেবারে ঝলমল-ঝলমল করছে।"

"কিসে ঝলমল করছে! ঝলমল করবে কেন?"

"রাজঐশ্বর্যে ঝলমল করবে। অযোধ্যা ছিল গোল্ডেন সিটি।"

"আপনার ঐশ্বর্য কোথায়? ঝলমলটা করবেন কী দিয়ে? হেডমাস্টারমশাইয়ের চেয়ারটা হবে সিংহাসন। বাকি ঝলমলের পয়সা নেই। বরং ফুটনোটে লিখে দিন, রাজা দশরথের আর আগের অবস্থা নেই।"

"এই ঝলমলের ব্যাপারে আমার একটা প্ল্যান আছে, রোলেক্সের লম্বা-লম্বা রিবন চারপাশে ঝুলিয়ে দেব। বাতাসে দুলবে আর ঝকমক-ঝকমক করবে। যে-কোনোওরকম একটা ঝকমক হলেই হল।"

"সে রোলেক্স রিবনের দাম কত?"

"ও আপনার সামান্যই দাম।"

"পরে কী কাজে লাগবে?"

"ও আর কী কাজে লাগবে! ঠিকমতো রাখতে পারলে, পরে সরস্বতী পুজোর ডেকরেশনে ব্যবহার করা যাবে। হেডমাস্টারমশাইয়ের চেয়ারটাকে একটু সিংহাসনের মতো করে সাজাতে হবে। সে আপনার ছেলেরাই করে নেবে। কিন্তু পেছনে একটা সিন চাই। একটু থামটাম, খিলান, রাজপ্রাসাদে যেমন থাকে আর কী!"

"সিন আমি ভাড়া করতে পারবে না, অনেক খরচ। কাগজে বড়-বড় করে লিখে পেছন টাঙিয়ে দেবেন রাজপ্রাসাদ। সবাই বুঝে নেবে।"

"ওটা রবীন্দ্রনাটক হলে তত। অ্যাবস্ট্রাক্ট স্টেজ। আমাদের এই পৌরাণিক পালায় একটু গর্জাস ব্যাপারস্যাপার দরকার। ঝলমলে স্টেজ, ঝলমলে পোশাক। পেছনে অন্তত দুটো সিন আপনি অ্যালাউ করে দিন। একটা রাজসভা, সেটা আমরা দশরথে লাগাব, রাবণেও লাগবে। আর-একটা বনের সিন।"

"দুটোতে হবে না, আপনার তিনটে চাই। একটা সমুদ্র না হলে হনুমান লাফ মারবে কোথায়!"

"সমুদ্রটা যদি আমরা উহ্য রাখি। বানরসেনাদের একেবারে সোজা লঙ্কায় ল্যান্ড করিয়ে দিলুম। দু'-চার ডায়লগের পরই যুদ্ধ। এক রাউন্ড কী দু'রাউন্ডের পরই রাবণবধ। ছেলেরা অবশ্য যুদ্ধটাকে একটু বাড়াতে চাইছে। আসলে ওইটাই তো মেন অ্যাট্রাকশন ওদের।"

"সেটা আমিও বুঝি; কিন্তু বানরসেনা কি হেলিকপ্টারে ল্যান্ড করবে!

pathagar.net

একটা সিন চাই, সমুদ্র, তার ওপর দিয়ে হনুমান উঠে যাচ্ছে, 'তাই এয়ারওয়েজ'-এর বিমানের মতো স্টেজে তখন সমুদ্রের দিকে মুখ করে আপনার ছেলে-হনুমানেরা খড়ের লেজ খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকবে সার-সার। দৃশ্যটা একবার কল্পনা করুন।"

"পিকচারেক্স, পিকচারেক্স। আপনি স্যার নাটকের লাইনে এলেন না কেন ?"

"ওই যে একটাই কারণ, কম বয়সেই মাথায় টাক পড়ে গেল।"

"কেন, পরচুল ?"

"অ্যালার্জি। পরামাত্রই ফ্যাঁচ-ফোঁচ হাঁচি। হাঁচব, না অভিনয় করব। যাক, এখন দেখা যাচ্ছে মিনিয়াম তিনটে সিন লাগবে। না, না, না, তিনটেতে হবে না। চারটে লাগবে। লাস্ট সিন, লঙ্কা জ্বলছে। আকাশ লাল, দাউদাউ আগুন। সামনে রাবণবধ।

হনুমানরা ধিতিংধিতিং নাচছে। সীতার পাতালপ্রবেশ হবে না ?"

"না; স্যার! অতদূর আর টানছি না। কনডেন্স করে দিচ্ছি।"

"কনডেন্সড মিল্কের মতো! তবে কী জানেন, পাতালপ্রবেশটা দেখাবার খুব স্কোপ ছিল। স্টেজের একটা পাটাতন খুলে যেত, সীতা ঝপাং করে নেমে যেত নীচে, আর সেই সময় স্টেজের তলায় রাখা ধুনুচি থেকে স্টেজের ওপরে ভলভল করে ভেসে উঠতে ধোঁয়া। দৃশ্যটা একবার কল্পনা করুন। একটা স্কুল ড্রামায় এইরকম পাকা দৃশ্য অভূতপূর্ব!"

"কিন্তু আমরা যে স্যার রাবণবধেই ফিনিশ করে দিচ্ছি। ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয়।"

"কেন, কাহিনীটা আপনি ফ্ল্যাশব্যাকে টানতে পারেন। প্রথম দৃশ্যেই সীতা স্টেজের ফুটো দিয়ে তলায় পড়ে গেল। এইবার ধুনোয় ধোঁয়ায় রামায়ণের ফ্রন্টপার্ট ভেসে উঠল। হেডমাস্টারমশাইয়ের চেয়ারে রাজা দশরথ। দশরথ, মনে করুন চোখ বুজিয়ে ঘুমোচ্ছে। দূতী গাইছে, জাগো দশরথ, জাগো জাগো রামায়ণ। অ্যান্ড ইয়োর নাটক স্টার্ট্স। ব্যাপারটা গতানুগতিক হল না। একেবারে নতুন দৃষ্টিকোণ।"

"আপনার প্রস্তাব আমি অবশ্যই বিবেচনা করে দেখব।"

"আরে মশাই, নতুন কিছু করুন, নতুন লাইনে ভাবুন। এটা জি টিভি, স্টার টিভির যুগ। আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এমন কায়দার স্টেজ করিয়ে দেব, একেবারে ফার্স্ট সিনেই মারমার কাট-কাট।"

হেডমাস্টারমশাই বললেন, "আমার মনে হয়, আজকের মিটিং এইখানেই শেষ করা ভাল ; কারণ অনেকক্ষণ ধরে হচ্ছে। সকলেরই অন্য কাজকর্ম আছে। আমাকে আবার মাদার ডেয়ারির দুধ আনতে হবে।"

pathagar.net

"কেন, বাড়িতে আর কেউ নেই। ছেলেরা কী করছে?"

"বড় ছেলেটা ভাবুক। সে কবিতা-টবিতা লেখে। সংসারের কাজকর্ম তেমন ভাল লাগে না। ছোটটা সন্ধের সময় তবলা শিখতে যায় ওস্তাদের কাছে।"

"তবলা! আর কিছু শেখার পেল না!"

"তবলার এখন খুব ফিউচার। একটু নাম করতে পারলেই ইউরোপ, আমেরিকা। ওর গুরু ও-দেশে ক'মাস থাকে!"

"লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে?"

"না, তা কেন! লেখাপড়া আর তবলা একসঙ্গেই চলছে। আজকাল তো অ্যাকাডেমিক লাইনে কোনও চাকরি নেই। বড় ছেলেটার তো তাই হল। এখন হতাশায় ভুগছে।"

"বেশ, আজকের মতো এই থাক। সামনের সপ্তাহে আবার আমরা বসব।"

মাস্টারমশাইরা উঠে পড়লেন। আমাদের মধ্যে থেকে শিবাঞ্জন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "স্যার! কমিটির মধ্যে আমরাও আছি। আমাদের কিছু দায়িত্ব দেবেন। আমি খুব ভাল স্টেজ সাজাতে জানি। আমি ওই রাজপ্রসাদ, জঙ্গল, সমুদ্র সব করে দেব। শুধু দু'একটা মেটিরিয়াল কিনে দিলেই হবে। এই যেমন, কাগজ, থার্মোকল, আঠা।

সহপ্রধান বললেন, "সে তো ভালই। তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিভা আমরা কাজে লাগাব।"

তিনদিন পরে বাংলার স্যার আমাদের নাটক কমিটির মিটিং ডাকলেন। নাটক লেখা শেষ। নাটক পড়া হবে। কে কোন ভূমিকা করবে, সেসব ঠিক হবে। স্কুল ছুটির পর আমরা হলঘরে সমবেত হলুম। স্যার এলেন। সবসময় তিনি ফিটফাট সেজে থাকেন। ফিনফিনে ধুতি, পাঞ্জাবি। শ্যাম্পুকরা ফুরফুরে চুল। খুব শৌখিন মানুষ। আমাদের খুব প্রিয় স্যার। বন্ধুর মতো মিশতে পারেন। হাসি, ঠাট্টা, মজা, সবই চলে। ভীষণ ভাল পড়ান।

স্যার বললেন, "বুঝলি, অ্যাসিস্ট্যান্ট এইচ এম-এর আইডিয়ায় জিনিসটা মন্দ দাঁড়াল না, এখন তোদের করার ওপর নির্ভর করছে। প্রথম দৃশ্যে আমি একটু কায়দা করেছি। দেখ, রাম, রামায়ণ করতে-করতে আমরা বাল্মীকিকে প্রায় ভুলেই বসে আছি। সেই কারণেই আমি ফার্স্ট সিনে কবিকে টেনে এনেছি। এটা আমাদের কর্তব্য। ড্রপসিন উঠল। স্টেজ। বাঁদিকে একটা বটগাছ। তলায় বসে আছেন বাল্মীকি। ওপর থেকে তাঁর সামনে ধপাস করে পড়ল তীরবিদ্ধ

pathagar.net

ক্রৌঞ্চ। বাল্মীকি চোখ মেলে তাকালেন, মিউজিক, সঙ্গে-সঙ্গে শ্লোক,

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং
ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমধবীঃ
কাম মোহিতম্ ॥

এ কী! এ কী নির্গত হল আমার কণ্ঠ হইতে! দৈববাণী! ঋষি! এর নাম কবিতা। পৃথিবীর প্রথম কবিতা। তুমি আদিকবি। এই দৈববাণীর সঙ্গেই আমি পাঞ্চ করে দিয়েছি রবীন্দ্রসঙ্গীত। সুযোগ যখন পেয়েছি, ছাড়ি কেন! আর তোদের মধ্যে যখন ট্যালেন্ট রয়েছে। কোরাস—

প্রথম আদি তব শক্তি—
তুমি আদিকবি, কবিগুরু তুমি হে,

গানে মেন ভয়েস থাকবে মৃণালের। এই একটাই গান, এর পর আর গানের কোনও স্কোপ নেই। তোরা যে গানও গাইতে পারিস সেটা দেখাবি না! এইবার স্টেজে একটা টেকনিক্যাল ব্যাপার ঘটবে। ঠিকমতো জমাতে পারলে তাক লেগে যাবে। স্টেজের তলা থেকে ধীরে-ধীরে সীতা জেগে উঠবে। মুকুট, কপাল, গলা, গোটা শরীর। ধোঁয়ার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে সীতার উত্থান। সীতা বাল্মীকির সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, কবি! তুমি আমার জীবন-কাহিনী লেখো। দেবী! তুমি কে? আমি সীতা, আমার প্রভু শ্রীরামচন্দ্র। আমার কাহিনী লেখার শক্তি তোমাকে আমি দিয়ে গেলুম। তুমি অতীতে চলে যাও, দূর অতীতে, অযোধ্যা নগরীতে, রাজা দশরথের রাজসভায় এই কথা বলেই সীতা আবার স্টেজের ফুটো দিয়ে নিচে নেমে যাবে। ভলকে-ভলকে ধোঁয়া। ড্রপসিন।"

রাজা বলল, "স্যার! সীতাকে কেমন করে ওঠাবেন ওইভাবে?"

"আমার সঙ্গে রাজেনবাবুর কথা হয়েছে। তিনি বলেছেন সীতাকে হাইড্রলিক প্রেসারে তুলে দেবেন।"

"সেটা কীরকম স্যার!"

স্টেজের মাঝখানে একটা গোল গর্ত। গর্তের তলায় বিশাল একটা ড্রাম ড্রামের ভেতরে মাপমতো গোল একটা বারকোশ। সীতা ড্রামে ঢুকে সেই বারকোশে দাঁড়াবে। ড্রামের একেবারে তলায় একটা ফুটো। সেখানে পাইপ। এইবার জল ঢোকানো হবে। জলের চাপে বারকোশসমেত সীতা ওপরদিকে ঠেলে উঠবে। অতি সহজ বিজ্ঞান।"

রাজা বলল, "স্যার, ওই বিজ্ঞানে কাজ হবে না। সীতার যা ওজন, ও বারকোশ-মারকোশ নিয়ে ওই ড্রামের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবে। একটা ছোট বল হলে ওই থিয়োরি খাটত। আপনি বিজ্ঞানের স্যারের কথা শুনবেন না।"

pathagar.net

"তা হলে সীতা পাতাল থেকে উঠবে কী করে?"

"আমরা ঠেলে তুলে দেব। একটা তক্তা দুটো বাঁশে বেঁধে চারজনে মিলে চাগাড় দিয়ে তুলে দেব।"

"সীতা আবার পাতালে প্রবেশ করবে কীভাবে?"

"ও ওইটার ওপরেই থাকবে, আমরা আবার ধীরে-ধীরে নামিয়ে নেব।"

"অনেক সহজ হবে, তাই না, তবে বিজ্ঞানটা বাদ গেল।"

"বিজ্ঞান বাদ যাক স্যার। গর্ত দিয়ে সীতা যদি না-ই উঠল, আমাদের নাটকটাই তো ভেস্তে যাবে। যে কায়দাটা বলছি, সেটাও খুব সহজ হবে না, রিহার্সাল দিতে হবে।"

"তা হলে প্ল্যানটা কি বাতিল করে দেব!"

"না, স্যার, জিনিসটা করতে পারলে দারুণ জমে যাবে। চেষ্টা দেখাই যাক না।"

"শিবাঞ্জন, তুই একটা বটগাছ সাপ্লাই করতে পারবি তো!"

"ওটা কোনও ব্যাপার নয় স্যার। পিচবোর্ড কেটে খাড়া করে দেব। রংটং মাখিয়ে এমন করে দেব মনে হবে রিয়েল গাছ।"

"রাজপ্রাসাদের থাম কীভাবে করবি?"

"বাহাত্তর ইঞ্চি জলের পাইপ রাস্তার ধারে বেওয়ারিশ পড়ে আছে। দুটো এনে দুধারে খাড়া করে দেব।"

"পাগল হয়েছিস, স্টেজ ভেঙে পড়ে যাবে, আর কে তুলবে অত ভারী! ওই প্ল্যানটা ছাড়।"

"খুব রিয়ালিস্টিক হত।"

"রিয়ালিস্টিকের দরকার নেই। তুই ওই প্লাইউড কেটেই করে দিস। তবে ওই তীরবিদ্ধ ক্রৌঞ্চটা একটু ভাল করে করিস। যেন বেশ জীবন্ত মনে হয়।"

"ওটা ভাবছি স্যার একটা সাদা মুরগিকে ওপর থেকে ফেলে দেব।"

"মুরগি কী রে! ক্রৌঞ্চ মানে সাদা বক।"

"বক কোথায় পাব স্যার! কে আর বুঝবে বক কি মুরগি।"

"কী বলছিস, বকের স্ট্রাকচার আর মুরগির স্ট্রাকচার এক হল! তুই বাবা ওটা কাপড়টাপড় জড়িয়ে করে দিস। বকের গলা ঠ্যাং চোখে পড়ার মতো। ও মুরগি দিয়ে হবে না। এখন আমি পার্টগুলো ডিস্ট্রিবিউট করে দিই। বাল্মীকি হব আমি। সুরেশ, দশরথ।"

সুরেশ মাথা চুলকে বলল, "স্যার, আমার যে খুব রাম হওয়ার ইচ্ছে।"

"ইচ্ছে হলেই তো হবে না বাবা। তুমি যে একটু বেশি হৃষ্টপুষ্ট। তার ওপর একটা ভুঁড়ি নামিয়েছ। রাম হব বললেই তো হওয়া যায় না! রাম হবে রাজেন।"

pathagar.net

সুরেশ ছাড়ার পাত্র নয়। সুরেশ বলল, "দশরথ স্যার রোগা ছিলেন। খুবই অসুস্থ। পাণ্ডুর।"

"এই মরেছে, এ রামায়ণ-মহাভারত গুলিয়ে ফেলেছে। পাণ্ডুর ছিলেন পাণ্ডু রাজা। দশরথ ছিলেন লম্বা-চওড়া দশাসই মানুষ।"

"সে প্রথম দিকে ছিলেন, পরে টিবি হয়েছিল।"

"এসব তথ্য তুই কোথায় পেলি ?"

"আমার নিজের ধারণা স্যার।"

"তোমার ধারণায় তো হবে না। দশরথ হতে তোর আপত্তি কিসের ?"

"মাত্র একটা সিন স্যার, তিনটে মাত্র ডায়লগ— রাম, তোমার ছোট মায়ের ইচ্ছে, তুমি বনবাসে যাও। একটা অ্যাপিয়ারেন্স আর একটা কথার জন্য অত মেকআপ পোষাবে না স্যার, আমাকে তা হলে রাবণটা দিন।"

"অসম্ভব ! রাবণের জন্য স্ট্রং অ্যাক্‌টিং চাই। রাবণ হবে প্রসূন। ওর অভিনয় আমি দেখেছি। খুব ভাল। এ ক্লাস। রাবণের রোলে প্রসূন ছাড়া আর কাউকে ভাবাই যায় না।"

প্রসূন বলল, "স্যার আমাকে রাম দিলেই ভাল হয়। রাবণ তো শেষকালে বধই হয়ে যাবে স্যার। রাম আমি খুব পারব স্যার। পাওয়ারফুল অ্যাক্‌টিং।"

"রাম হয়ে নিজের সর্বনাশ নিজেই কেন করবি। রামের অ্যাক্‌টিংই নেই। কাঁধে ধনুর্বাণ নিয়ে কেবল ঘুরে বেড়ানো। চড়া কোনও ডায়ালগই নেই। রাম, সীতা, লক্ষণ, সার বেঁধে স্টেজে তিনপাক ঘুরবে। রাম কোনওকালেই তেমন স্ট্রং ছিল না, স্রেফ স্টাইল। হাঁটা, চলা, তাকানো। ধার্মিক মানুষের কি তেমন লম্ফঝম্প থাকে ! রাম বনে যাও, বনে চলে গেল। গোটাকতক রাক্ষস খতম করল। সীতা বলল সোনার হরিণ ধরে দাও। সোনার হরিণ হয় না জেনেও পেছন-পেছন দৌড়ল। সারাটা জীবন তো দৌড়েই গেল। আসল খেল তো রাবণের। সীতা হরণের সময় তুই হাসির খেল দেখাবি, মারীচের নাক-কান কেটেছিলিস ভিখারি রাম। এইবার খেলাটা দ্যাখ তবে। সারা স্টেজ সর্বক্ষণ তুই-ই দাপিয়ে বেড়াবি। আমি লঙ্কেশ্বর রাবণ।"

মোটামুটি সব রোলই ঠিক হয়ে গেল। বানরসেনার সংখ্যা অনেক হবে। স্টেজ ভরে যাবে। তাদের মধ্যে বারোজনের লম্বা পাকানো লেজ থাকবে। লেজ তৈরি করবে শিবাঞ্জন। পেছন দিক থেকে মাথার ওপর যেন উঁচিয়ে থাকে। স্যার জিজ্ঞেস করলেন, "ওটা কীভাবে করবি ? মাথার দিকে উলটে থাকা বাঁকা লেজ।"

শিবাঞ্জন বলল, "কতটা মোটা করব স্যার ?"

"সাধারণ হনুমানের লেজ যেমন হয় আর কী ! একটা হনুমান দেখে নিস না !"

pathagar.net

"গাছের হনুমান আর রামায়ণের হনুমান কি এক হবে স্যার!"

"মোটামুটি একই হবে। ওরই মধ্যে একটু মোটা করে দিবি। বেশি মোটা করলে ছেলেরা কোমরে রাখতে পারবে না। তা হলে কী কায়দাটা করবি?"

"মোটা তার কিনে আনব। তারপর খড় জড়াব, তার ওপর লাল কাপড়।"

"কোমরে আটকাবে-কী করে! তার একটা ব্যবস্থা রাখিস। টেকনিক্যাল দিকটা তোর দায়িত্ব। আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত রইলুম। কাল থেকে আমাদের রিহার্সাল।"

শিবাঞ্জন বলল, "এই টেকনিক্যাল ব্যাপারে তুই আমাকে একটু সাহায্য করিস। তোর কারিগরি মাথাটা খুব একটা খারাপ নয়। আমি কী ভেবেছি বল তো, কাগজের পিলার তৈরি করব। মোটা কাগজ গোল করে জড়িয়ে জড়িয়ে, তার ওপর ময়দার লেই পরতে-পরতে। তার ওপর পোস্টার কালার। সোনালি রঙের লতাপাতা। কেমন হবে?"

"হবে না। বাঁশের ফ্রেম ছাড়া ও-জিনিস দাঁড়াবে না। একটা স্ট্রাকচার চাই। এ তোর ধূপের প্যাকেট নয়।"

"তা হলে থাম আমি কী করে করব!"

"দায়িত্ব নেওয়ার সময় মনে ছিল না! গরম কচুরি খাওয়া নেপালদার দোকানের, তা হলে বলব।"

"ক'টা খাবি?"

"মিনিমাম চারটে, ম্যাক্সিমাম ছ'টা।"

"দাঁড়া, লক্ষ্মীর ভাঁড় ভাঙি। বিকেলে শিওর খাওয়াব।"

বিকেলের দিকে নেপালদার দোকানে ফাটাফাটি ব্যাপার। হিংয়ের কচুরি কড়ায় ফুলছে। পাতলা বাদামি রং। পাশেই গামলাতে গোটা-গোটা মটরের ঝাল-ঝাল ঘুগনি। সেই কলতলা থেকেই গন্ধ পাওয়া যায়। শিবাঞ্জনই আমাকে এসে ডাকল, "তোর একটা কোনও চাড় নেই! পড়ে-পড়ে বেলা পাঁচটা অবধি ঘুমোচ্ছিস! চল, চল।"

"ভাঁড় ভেঙেছিস?"

"হ্যাঁ, তিনটে নাগাদ। তক্কে-তক্কে ছিলুম। মা যেই ঘুমিয়েছে, প্যাঁচার মুণ্ডু উড়িয়ে দিলুম।"

"কতটা বেরোল?"

"নেহাত খারাপ নয়। সাতচল্লিশ টাকা ষাট পয়সা।"

"ভালই জমেছে। তা হলে চ', কচুরির বদলে 'খাইখাই'তে গিয়ে ব্রেস্ট কাটলেটে খাওয়া যাক। কাটলেটে বুদ্ধি আরও ভাল খোলে।"

ছ'টার সময় খাইখাই খোলে। বনেদি ব্যাপার। দরজার পাশে মালিক সিল্কের পাঞ্জাবি পরে ক্যাশ বাক্স নিয়ে বসে আছেন। দুপুরের ঘুমটা ভালই

pathagar.net

হয়েছে। চোখমুখ ফোলা-ফোলা। খুব গম্ভীর চেহারা। আমরা ঢুকছি, একনজরে দেখে নিয়ে বললেন, "সৎপথের পয়সা, না অসৎ পথের ?"

শিবাঞ্জন যেন শুনতে পায়নি, বলল, "আজ্ঞে।"

"বলি, বাপের পকেট সাফ করেছ, না তাঁরা দিয়েছেন ?"

শিবাঞ্জন একটু রাগের চোখে তাকিয়েছে। ভদ্রলোক বললেন, "বড়-বড় চোখে তাকালে কী হবে। এইরকমই আজকাল হচ্ছে। দেশের মরালটা তো একেবারে শেষ হয়ে গেছে। স্কুল-কলেজে তো আর এসব শেখানো হয় না। শেখানো হয় ?" ভদ্রলোক ইয়া বড়-বড় চোখে শিবাঞ্জনের দিকে তাকালেন। শিবাঞ্জন ছেলেটা এমনই খুব ভাল। সহজ, সরল। কোনও ওপরচালাকি, ওস্তাদি এসব নেই। নিভাঁজ ভালমানুষ। সেই তুলনায় আমি অনেক শয়তান। মনে জিলিপি প্যাঁচ। নিজেকে খুব ওস্তাদ আর বুদ্ধিমান ভাবি। মাঝে-মাঝে দুঃখ হয়, আমি কেন শিবাঞ্জনের মতো হতে পারি না!

শিবাঞ্জন ভদ্রলোকের কথা শুনে কেমন যেন হয়ে গেল। একটু থমকে থেকে বলল, "আপনি যথার্থই বলেছেন। তবে আমরা ওসব করি না। যখন তখন কাটলেটও খাই না। আজ লক্ষ্মীর ভাঁড় ভেঙে সাতচল্লিশ টাকা পেয়েছি।"

"ভাঁড় ভর্তি হয়েছিল ?"

"আজ্ঞে না।"

21 SEP 2005

"তা হলে ভাঙলে কেন ?"

"এই যে আমার বন্ধু পলাশ, ওর কাছ থেকে বুদ্ধি কিনতে হবে বলে ভাঁড়টা ভাঙতে হল।"

"খুবই রহস্যময় ব্যাপার! বুদ্ধি কিনতে হবে মানে ? ওকে তুমি টাকা দেবে আর ও ওর মাথার ঢাকনা খুলে তোমাকে বুদ্ধি দেবে ?"

"টাকা নয়, ওকে একজোড়া কাটলেট খাওয়ালে ও বলবে।"

"কী বলবে ?"

"তা হলে আপনাকে সবটা বলতে হবে। গোড়া থেকে।"

"বলো শুনি। খুব শুনতে ইচ্ছে করছে।"

শিবাঞ্জন সব বলল, "একজোড়া কাটলেট খাওয়ালে ও আমাকে বুদ্ধিটা দেবে।"

ভদ্রলোক বললেন, "অতিশয় ধুরন্ধর ছেলে। তোমার বুদ্ধিটা শুনি।"

শিবাঞ্জন বলল, "ওকে ধুরন্ধর বলবেন না, ও ভীষণ ভাল ছেলে। আমার প্রাণের বন্ধু। ও পেটুক নয়। এমনই মজা করে বলেছিল।"

ভদ্রলোক বললেন, "ঠিক আছে। ধুরন্ধর বলছি না। বলো হে ভাল ছেলে।"

"আজ্ঞে ভেবেছি, চারটে ছ'ফুট লম্বা মোটা রেনওয়াটার পাইপ কিনে স্টেজে খাড়া করে দেব। বেশ কালো চকচকে।"

pathagar.net

"বুদ্ধি খারাপ নয়, কিন্তু খাড়া করবে কী করে!"

"চারটে বড় ফুলগাছের টবে মাটি দিয়ে পুঁতে দেব।"

"হবে না, হবে না, উলটে যাবে। আর-একটু ভাবো। বুদ্ধিটা যখন তোমার, তখন তুমিই আর-একটু খেলাও।"

হঠাৎ ঝাঁ করে বুদ্ধিটা খেলে গেল, "স্যার, একটা কাজ করলে হয়। প্যান্ডেল তো হবেই, ওর মধ্যে বাঁশ পুরে একেবারে ওপরের আড়ার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেব।"

"দ্যাটস্ রাইট।" ভদ্রলোক ক্যাশ বাক্সের ওপর একটা চাপড় মারলেন, "দ্যাট্স রাইট, আমিই তোমাদের কাটলেট খাওয়াব। যাও, ভেতরে গিয়ে বোসো। একটা কথা, হরেনদার নাম শুনেছ!"

"আজ্ঞে না।"

"সে কী শ্যামপুকুরের বিখ্যাত সিন পেন্টার হরেন মিত্তিরের নাম শোনোনি; জমিদারের ছেলে ছিলেন। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে ছেলেবেলা থেকেই ফ্যামিলির বাইরে! নিজের ভাগ্য নিজেই তৈরি করেছেন। থিয়েটার ছিল ধ্যানজ্ঞান। বড়-বড় অভিনেতারা তাঁর স্টুডিয়োয় এসে বসে থাকতেন। নতুন নাটকের সিন বলতেন। হরেনদা এঁকে দিতেন। তাকিয়ে দেখার মতো সেসব কাজ। এখন বৃদ্ধ হয়েছেন, আর আঁকতে পারেন না। তবে ভীষণ ভালমানুষ। রামায়ণের কয়েকটা সিন এখনও আছে মনে হয়। যদি ধরতে পারো ফ্রি অফ কস্ট পেয়ে যাবে। হরেনদা আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয় বুঝলে তো! তবে আমার নাম কোরো না। আমার ওপর খুব রাগ। ওই যে আমি গানের লাইন ছেড়ে কাটলেটের লাইনে চলে এলুম। সে আবার আর-এক কাহিনী। পরে বলব। ইচ্ছে করলে একটা বই লিখতে পারবে। যাও, ভেতরে গিয়ে বোসো। অ্যায়, মেধো!" ভদ্রলোক হাঁক পাড়লেন।

বেশ জমিয়ে, স্যালাড দিয়ে খোলতাই দুটো কাটলেট খাওয়া হল। ভদ্রলোককে নমস্কার জানিয়ে রাস্তায় নেমে শিবাঞ্জন বলল, "চল না, হরেনবাবুর স্টুডিয়োটা খোঁজ করে যাই।"

"চল। আমার কোনও আপত্তি নেই।"

শ্যামপুকুরে এসে একটু খোঁজ করতেই আর্ট স্টুডিয়ো, সিন পেন্টার অব রেপুট, প্রোঃ হরেন মিত্র, ইএসটিডি— ১৯৩০ পাওয়া গেল। সাইনবোর্ডটা অস্পষ্ট। স্টুডিয়োর রাস্তার দিকের দরজা বন্ধ। পাশের দিকের দরজা ঠেলামাত্রই খুলে গেল। সরু প্যাসেজ। দোতলার রেনওয়াটার পাইপ ঢাকা একটা নর্দমায় পড়েছে। আমরা ভয়ে-ভয়ে এগোচ্ছি। সিমেন্ট বাঁধানো পথ। হঠাৎ কাশির শব্দ। কাশতে-কাশতেই একজন প্রশ্ন করছেন, "কে? কাকে চাই?"

ডান পাশে-ঘর। খোলা জানলা। এক বৃদ্ধ বসে আছেন। লম্বা-লম্বা সাদা

pathagar.net

চুল। দেখলেই মনে হচ্ছে শিল্পী। শিবাঞ্জন বলল, "জ্যাঠামশাই! আপনার কাছেই এসেছি।"

"আমার কাছে? আমার কাছে তোমাদের কী প্রয়োজন বাবা!"

"ভেতরে যাব?"

"এসেছ যখন, নিশ্চয়ই আসবে। তবে কেন আসবে সেইটাই বুঝতে পারছি না।"

ভদ্রলোক কাশছেন। ঘরে কম পাওয়ারের আলো। চাদরপাতা চৌকি। তার ওপর শিল্পী বসে আছেন। মেঝের ওপর একটা আলবোলা। নলটা খাটের পাশে। দুটো বেতের মোড়া। ঘরের ডান পাশের দেওয়ালটা পুরো ঢাকা। সেখানে একটা সিন। নীল আকাশ। বন। একটা সোনালি হরিণ ছুটে পালাচ্ছে।

শিবাঞ্জন মোড়ায় বসতে যাচ্ছিল। "মারীচ, পলাশ, মারীচ", বলে ধপাস করে মেঝেতে পড়ে গেল। প্যাঁক করে একটা শব্দ। শিবাঞ্জন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে উঠল। দেখছে,শব্দটা হল কোথায়! মেঝেতে একটা পুতুল পড়ে ছিল।

ভদ্রলোক বললেন, "ওটা আমার নাতনির। তোমাদের ব্যাপারটা তো বুঝতে পারছি না। পাগল নাকি!"

শিবাঞ্জন ছুটে এসে ভদ্রলোক পা জড়িয়ে ধরল, "শিল্পী, শিল্পী, উঃ আপনি শিল্পী!"

ভদ্রলোক বললেন, "দেখো, কামড়ে-টামড়ে দিয়ো না যেন। শান্ত হও, শান্ত হও।"

শিবাঞ্জন কেঁদে ফেলেছে। আমিও সিনটা দেখছি, তবে আমার অত আবেগ আসছে না। আমি ঘোর বিষয়ী। দুর্দান্ত আঁকা, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মানুষ যে কী করে এমন আঁকে!

ভদ্রলোক বলছেন, "আশ্চর্য ব্যাপার, তুমি কাঁদছ কেন?"

শিবাঞ্জন কথা বলবে কী, সে তো কেবল ফ্যাঁসফ্যাঁস করছে। আমি ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে দিলুম, "জানেন তো, ও ভীষণ ভাল ছবি আঁকে, দুর্দান্ত ভাল ওর হাতের কাজ, তাই ও আপনার প্রতিভা দেখে আবেগ চাপতে পারছে না। ভাবছে, ও কেন আপনার মতো হতে পারছে না।"

বৃদ্ধ এইবার একটু হাসলেন, "সে কী! এখনও এমন ছেলে এই শহরে আছে নাকি! এত সূক্ষ্ম মনের ছেলে। এ তো বহুদূর যাবে। মনে হচ্ছে জীবনে খুব বড় হবে। টাকাপয়সা হয়তো হবে না, তবে একটা মানুষের মতো মানুষ হবে। তা তোমরা এই পরিত্যক্ত বৃদ্ধের কাছে হঠাৎ এলে কী মনে করে! সন্ধানই বা পেলে কার কাছে?"

শিবাঞ্জন একটু সামলাতে পেরেছে, সে-ই বলল, "আমরা ভুবিলি স্কুলের ছাত্র।"

pathagar.net

"জুবিলি! জুবিলি ওয়াজ মাই স্কুল। ও কি আজকের স্কুল! ওয়ান অব দ্য বেস্ট স্কুলস্ ইন বেঙ্গল। তোমরা সেই স্কুলের ছাত্র! তার মানে, বার্ডস অব এ ফেদার। দেখি ওই কৌটোটা আনো! অন দ্য টপ অব দ্যাট ড্রয়ার।"

শিবাঞ্জনই এগিয়ে গেল। ঘরটা বেশ বড়। একেবারে শেষ মাথায় একটা দেরাজ। তার ওপর সুদৃশ্য একটা কৌটো। কৌটোটা এনে বৃদ্ধের হাতে দিল। তিনি কৌটো খুলে একমুঠো লজেন্স বের করলেন। কোনওটা হালকা কমলালেবু রঙের, কোনওটা পিঙ্ক, কোনওটার রং ডিপ চকোলেট। শিবাঞ্জনের হাতে দিয়ে বললেন, "ভাগ করে নাও।" নিজে একটা নিলেন।

মোড়ক খুলে মুখে পুরে বললেন, "খুব সুন্দর, টেস্ট করে দ্যাখো, যেকোনও দোকানে পাবে না! স্পেশ্যাল।"

ভদ্রলোকের মুঠোয় এগারোটা লজেন্স উঠেছিল, শিবাঞ্জন পাঁচটা রেখে ছ'টা আমাকে দিল।

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "কী সমান ভাগে হয়েছে?"

শিবাঞ্জন চুপ করে আছে দেখে আমি বললুম, "হয়নি স্যার, ও পাঁচটা রেখে ছ'টা আমাকে দিয়েছে।"

কিছুক্ষণ শিবাঞ্জনের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "তোমার পরিচয় জানি না, কিন্তু এইটা বুঝতে পারছি, তুমি খুব ভাল বংশের ছেলে, তোমার সংস্কার খুব ভাল। তুমি জীবনে অনেক বড় হতে পারবে। তোমার ভেতর ক্ষুদ্রতা নেই। আচ্ছা বলো তো, কেন তোমরা এসেছ?"

শিবাঞ্জনই বলল, "আমাদের স্কুলের ফাংশান। আমরা থিয়েটার করছি রাবণবধ। আমাদের তো তেমন পয়সা নেই, তাই স্টেজটা ঠিকমতো করতে পারছি না। আপনার কাছে আগের আঁকা কিছু সিন থাকতে পারে ভেবে এসেছি। যদি আপনি অনুগ্রহ করে দেন!"

"রাবণবধ! তা হ্যাঁ রামায়ণের কিছু সিন তো আমার গোডাউনে থাকার কথা। তেমন যত্নে নেই। হয়তো ধুলো পড়েছে। ইঁদুরে একটু কাটতেকুটতেও পারে। তা হলেও তোমাদের কাজ চলে যাবে।"

শিবাঞ্জন প্রায় লাফিয়ে ওঠে আর কি, "অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ আছে?"

"থাকার তো কথা! সেবার খুব যত্ন করেই এঁকেছিলুম।"

"অরণ্য?"

"অরণ্য তো থাকবেই। চিত্রকুট পাহাড়।"

"সমুদ্র? হনুমান মেরেছে লাফ।"

"সমুদ্র আছে। হনুমান তো নেই।"

"ঠিক আছে, হনুমান ছাড়াই হবে। লঙ্কা আছে?"

"অবশ্যই আছে। লঙ্কায় অগ্নিকাণ্ড আছে।"

pathagar.net

যতই শুনছে, শিবাঞ্জন যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করল, "অরণ্যে সীতার কুটির। রাবণ যেখান থেকে ধরেছিল ?"

"সেটা না থাকলে রামায়ণের থাকলটা কী ? ওইটাই তো রামায়ণের কেন্দ্রবিন্দু।"

শিবাঞ্জনের আবেগ এসেছে, আবার চোখ ছলছলে। কথা আটকে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কীভাবে পাব ?"

"দ্যাখো বাবা, আমি অথর্ব। এক-পাও হাঁটতে পারি না। আগামীকাল বহরমপুর থেকে আমার ম্যানেজার গুপি আসবে। গুপি তোমাদের নিয়ে যাবে গ্রে স্ট্রিটের গোডাউনে। তোমরা সেইখান থেকে তোমাদের লোক দিয়ে বের করে নেবে। প্রথমে নরম বুরুশ দিয়ে আগাপাশতলা ঝাড়বে। যদি দ্যাখো, খুব ময়লা হয়েছে, তা হলে সাবানজলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে একটু মুছে নেবে। তোমাদের একটু খাটতে হবে। পারবে তো ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা খুব-খাটতে পারি।"

"ভেরি গুড, তা হলে এসো। এইবার আমি শুয়ে পড়ব। বয়েস হয়েছে তো, সন্ধের মুখেই ঘুমটা ধরতে না পারলে, ট্রেন বেরিয়ে যাবে, আমি সারারাত প্ল্যাটফর্মেই পড়ে থাকব একা।"

আমরা নমস্কার করে বেরিয়ে এলুম। শিবাঞ্জন নাচছে। "দেখেছিস, ভগবান আছেন। যা চাইছি তাই পেয়ে যাচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে। চল খাইখাই-এর ভদ্রলোককে বলে আসি। ভাগ্যিস তুই কচুরির বদলে কাটলেট খেতে চাইলি। এখনও কত ভাল লোক বেঁচে আছেন বল ?"

"আগের মানুষরা বেশিরভাগই ভাল।"

খাইখাই-তে তখন রাতের ভিড় লেগে গেছে। দপাদ্দপ কাটলেট উড়ে যাচ্ছে। স্ট্রেচারে শুয়ে থাকা আহত মানুষের মতো লম্বা-লম্বা ফিশফ্রাই প্লেটে চেপে রান্নাঘর থেকে সোজা চলে যাচ্ছে খদ্দেরদের টেবিলে। বয়রা সব মাকুর মতো ছোটাছুটি করছে। নামতা পড়ার মতো একঘেয়ে সুরে বলে যাচ্ছে, তিন নম্বরে ফিশফ্রাই। একটা ডবল হাফ। পাঁচ নম্বরে একটা কবিরাজি।

ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকালেন, "কী হল আবার ?"

শিবাঞ্জন বলল, "আপনার কথায় খুব কাজ হয়েছে। সেই কথাটাই জানাতে এলুম।"

"হবেই তো, হবেই তো ! একেবারে দিলদরিয়া মানুষ। তা, তোমাদের লেখাপড়া নেই, এখনও বাইরে-বাইরে ঘুরছ ?"

"না, আমাদের তো পরীক্ষা হয়ে গেছে।"

"হয়ে গেলেও, তোমাদের বয়সে সন্ধের পর বাইরে থাকা উচিত নয়। পড়ার বই ছাড়াও অন্য অনেক বই আছে, যা তোমরা এই সময় পড়ে ফেলতে পারো।

pathagar.net

এই সময়টাকে কাজে লাগাও। পৃথিবীতে সবচেয়ে দামি কী বলো তো ? সময়। আমরা সেই কোন ছেলেবেলায় পড়েছিলুম, টাইম অ্যান্ড টাইড ওয়েট ফর নান।"

আমরা দোকান থেকে বেরিয়ে এলুম। শিবাঞ্জন বলল, "কথাটা উনি ঠিকই বলেছেন। আমরা এখনও অতটা বড় হইনি যে, রাত আটটা পর্যন্ত রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরব। দেখেছিস পলাশ, সব ভাল মানুষের মধ্যেই একজন করে শিক্ষক বসে আছেন। চল, বাংলার স্যারকে সুখবরটা দিয়েই আমরা বাড়ি চলে যাই।"

স্যার তাঁর বাড়ির সামনের রকে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে পায়চারি করছিলেন। আমাদের দেখে বললেন, "কী ! তোমরা দুটোতে এত রাতে !"

"আপনি স্যার এখানে ঘোরাঘুরি করছেন ?"

"কী করব বলো, দরজায় তালা দিয়ে আমার স্ত্রী চলে গেছেন। এই একঘণ্টায় আমার প্রায় চার মাইল হাঁটা হয়ে গেল। তোমাদের কী খবর বলো !"

"একটা ভীষণ সুখবর এনেছি স্যার। আমরা প্রায় সমস্ত দৃশ্যের সিন পেয়ে গেছি।"

"সে কী ! আঁকা সিন ?"

"হ্যাঁ স্যার, আঁকা সিন। অসাধারণ সুন্দর।"

শিবাঞ্জন পুরো অভিযানের একটা বর্ণনা দিল। স্যার একবার এপাশ থেকে ওপাশে যাচ্ছেন, আমরাও যাচ্ছি পেছন-পেছন। তিনি ওপাশ থেকে এপাশে আসছেন, আমরাও আসছি। অনেকটা লেজের মতো। সব শুনে তিনি বললেন, "পৃথিবীর সমস্ত আবিষ্কারই প্রায় অ্যাক্সিডেন্ট ! তোমার ওই এক্সরেই বলো আর পেনিসিলিনই বলো। পলাশ বলল, খাওয়াতে হবে। কী খাওয়াতে হবে, না কচুরি। হঠাৎ মতের পরিবর্তন—কাটলেট খাব। সেই কাটলেট থেকে এই আবিষ্কার। এর নাম লাক।"

"কালই তোমরা সিনগুলো এনে স্কুলের হলঘরে ডাম্প করে ফ্যালো। শুভস্য শীঘ্রম্, অশুভস্য কালহরণম্। একদম দেরি কোরো না।"

স্যারের স্ত্রী চটির ফটাস-ফটাস শব্দ তুলে এলেন। হাতে একটা বাজারের থলে। তাঁকে দেখেই স্যার আমাদের বললেন, "তোমরা যাও। আমার রক্ত চড়ছে। এখন ধুম ঝগড়া হবে। তোমাদের না শোনাই ভাল।"

আমরা লাফিয়ে রাস্তায়। শুনতে পেলুম তিনি চিৎকার করে বলছেন, "এতক্ষণ ছিলে কোথায় ?"

ঠিক সেইরকম জোরেই উত্তর, "যমের বাড়ি।"

শিবাঞ্জন আপন মনে বলল, "ঠিকই করে ফেলেছি, জীবনে বিয়ে করব না। বিয়ে মানেই অশান্তি।"

"ঠিক বলেছিস ! আমি তো ঠিক করেছি, সারাজীবন ছাত্রই থাকব।"

"মানে কী, প্রত্যেক বছর ফেল করবি !"

pathagar.net

"তা কেন, একের পর এক পাশ করে যাব, এম এ, এল এল বি, ডি লিট, ডি ফিল, আবার এম এ। চালিয়েই যাব, চালিয়েই যাব।"

"আমি পেন্টার হব। ছবির পর ছবি এঁকে যাব।"

"টাকা ?"

"ও ম্যানেজ হয়ে যাবে। খুব কম খাব। খাটিয়াতে শোব। পায়ে হেঁটে সবজায়গায় ঘুরব। একটা-দুটো ছবি নিশ্চয় বিক্রি হবে। খুব কষ্ট করব। কষ্ট করলে মানুষ খাঁটি হয়। দেখবি সব পশুর মধ্যে বলদ আর গাধাই সৎ।"

"কেন, কুকুর ?"

"নিজেদের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া করে।"

"ঘোড়া ?"

"ঘোড়ার খুব ডাঁট। অহঙ্কারী। বড়লোকেরা পিঠে চাপে তো।"

"পাখি ?"

"অমিশুক। মানুষের সঙ্গে মিশতে চায় না। উড়ে পালায়।"

"মাছ ?"

"মানুষের মনে লোভ জাগায়।"

শিবাঞ্জন আর আমি এক পাড়ায় থাকি। শিবাঞ্জনের বাড়ির একতলায় একঘর ভাড়াটে আছে। ভদ্রলোক পোস্টাপিসে চাকরি করেন। অবসর পেলেই তাঁর কাজ হল শিবাঞ্জনদের সঙ্গে ঝগড়া করা। সকাল, বিকেল, সন্ধে—সবসময় ঝগড়া। শুনতে পাচ্ছি, আজও হচ্ছে।

শিবাঞ্জন থেমে পড়ল, "বাড়ি যাব কি না ভাবছি রে পলাশ !"

"এখন আর কোথায় যাবি এত রাতে বাড়ি ছাড়া !"

"যতক্ষণ না ঘুমোচ্ছে ততক্ষণই তো চালাবে।"

"তোরা চুপ করে গেলেই তো পারিস।"

"মা শুনবে না, সমানে চালিয়ে যাবে।"

"কী নিয়ে হয় ?"

"কোনও ঠিক নেই, যা হয় একটা কিছু বেধে গেলেই হল। কাল হচ্ছিল আরশোলা নিয়ে। দোতলার আরশোলা কেন একতলায় নেমেছে ?"

"তা তোরা কী করবি ?"

"আমরা কেন আরশোলা কন্ট্রোল করছি না !"

আমাদের বাড়িতে এই সময় একটা কাণ্ড হয়। সেটা হল দিদির গলা সাধা। উচ্চাঙ্গ শিখছে। তানের ঠেলায় পাড়া কাঁপছে। সবাই বলে মারাত্মক গলা। আমার ভেতরটা কেমন যেন অস্থির-অস্থির করে। গলগল করে ঘাম বেরোচ্ছে। সে আর থামে না। আমিও বাড়ি ঢুকব কি না ভাবছি। শেষে দু'জনেই ঢুকলুম।

pathagar.net

এই সময় আরও একটা কাণ্ড হয় আমাদের পাড়ায়। সেটা হল আমতলায় যে বস্তি আছে, সেইখানকার একটা ছেলে বলা নেই কওয়া নেই, অকারণে দুমদাম করে পটকা ফাটাতে থাকে। তার বাবা নাকি বাজির কারখানায় কাজ করেন। সেই পটকার আওয়াজও শুরু হয়ে গেল। আমার মাঝে-মাঝে মনে হয় আমার দিদিটাকে হারমোনিয়াম সমেত শিবাঞ্জনদের বাড়ির দোতলার দক্ষিণের ঘরে বসিয়ে দিয়ে এলে হয়। ওদিকে ঝগড়া, এদিকে তেড়ে-তোড়ে মাপা, ধাপা, গামা, মাগা। হয়তো একদিন তাই হবে, কারণ যা শুনছি তাতে মনে হচ্ছে, শিবাঞ্জনের দাদার সঙ্গে আমার দিদির বিয়ে হবে। দু'জনের নাকি খুব ভাব হয়েছে। মা গয়না-টয়না সব গড়াতে শুরু করেছে। বাবা বলে, শিবাঞ্জনের দাদা নীলাঞ্জন ফার্স্টক্লাস ছেলে, জেম অব এ বয়। অঙ্কে একশোর মধ্যে একশো পেয়ে এসেছে সব পরীক্ষায়। আমি বিয়ে-টিয়ে বুঝি না। আমি বুঝি খাওয়া। ফিশ ফ্রাই, ফিশ রোল, মাটন চাঁপ। ঘুরব, ফিরব, গপাগপ খাব। দিদি ভাইফোঁটায় আমাকে জামা-প্যান্ট দেবে।

আমাদের স্কুলের নিউ হলে আজ নাটকের মহলা।

বাংলার স্যার নির্মলবাবু মাঝখানে বসেছেন স্ক্রিপ্ট হাতে। হাতে পেন্সিল। কোন-কোন জায়গায় এফেক্ট মিউজিক ঢুকবে, সেইসব ঠিক করবেন। চরিত্রদের প্রবেশ, প্রস্থান। ছেলেদের আর আসল নামে এখন ডাকছেন না। বলছেন, "রাম কই, রাবণ কোথায়, সীতাকে কান ধরে মাঠ থেকে টেনে আন।"

জাম্বুবানের ঠাণ্ডা লেগে তিনটেই একসঙ্গে হয়েছে। সর্দি, কাশি, জ্বর। একটা খদ্দরের চাদর মুড়ি দিয়ে কোণে বসে ক্রমান্বয়ে কেশে চলেছে।

স্যার বলছেন, "মানুষমাত্রেরই কাশি হয়, কিন্তু সে-কাশিতে একটা কমা, ফুলস্টপ থাকে। এইরকম ননস্টপ কাশি খুব কম দেখেছি। এত ইরিটেশান হচ্ছে, মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছে, রাবণবধের বদলে হনুমানবধ করে ফেলি।"

রাবণ বলল, "স্যার, হবে না কেন কাশি! কাল দুপুরে আমাদের ছাতে বসে তেঁতুলের আচার খেয়েছে।"

"তেঁতুল!" স্যার আঁতকে উঠলেন, "একে রোদে রক্ষে নেই তার ওপর তেঁতুল। তেঁতুল এল কোথা থেকে?"

রাবণ বলল, "মা বাসন মাজার জন্যে আনিয়েছিল, ও দুপুরে এল। রোজই আসে। মা ওকে খুব খাতির করে তো!"

স্যার খুব রেগে গেলেন, "আই ওয়ার্ন ইউ। টেলিভিশনের ল্যাঙ্গোয়েজ ব্যবহার করবেন না।"

pathagar.net

রাবণ বলল, "টেলিভিশন নয় স্যার। আমরা তো ইউ পি-তে ছিলুম তাই কিছু হিন্দি ঢুকেছে।"

জাম্বুবান কাশতে-কাশতে বলল, "স্যার, আমি জানতুম না, তেঁতুলের সন্ধানটা ও-ই দিয়েছিল, বললে, মা ঘুমোচ্ছে। চল এই ফাঁকে তেঁতুলটা সাবাড় করি।"

রাবণ বললে, "স্যার, তেল, লঙ্কা আর চিনি দিয়ে জিনিসটা ও-ই তৈরি করেছিল। আমাকে একটুখানি দিয়ে সবটা নিজেই সাবড়ে দিল।"

"এটা তোর চক্রান্ত। তুই আগেই রামকে উইক করে দিতে চাইছিস। হনুমান অসুস্থ হলে তোরই তো পোয়াবারো।"

রাবণ হতাশ হয়ে বলল, "রামায়ণ তো আগেই লেখা হয়ে গেছে স্যার, আমি যাই করি না কেন, আমাকে মরতেই হবে, নতুন রামায়ণ তো লেখা হবে না।"

স্যার আর-এক প্রস্থ রেগে গিয়ে বললেন, "জাম্বুবানকে ঘর থেকে বের করে দাও। কেশো হনুমান আমি চাই না। বাড়িতে গিয়ে নুনজলের গার্গল কর। থ্রোট পেন্ট লাগা। তেঁতুলের আচারে যার লোভ, সে কোনওদিন পারফেক্ট হনুমান হতে পারে না। ইমপসিবল্। রামায়ণে এমন কোনও দৃষ্টান্ত নেই।"

জাম্বুবান কাশতে-কাশতে নিজেই দরজার দিকে এগোচ্ছে, স্যার একটা হুঙ্কার ছাড়লেন, "কালকের মধ্যে তোর কাশি না সারলে হনুমানের লিস্ট থেকে তোর নাম কাটা যাবে।"

জাম্বুবান মনের দুঃখে বেরিয়ে গেল। স্যার এইবার আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমরা যদি এ-ক'দিন একটু সংযমে থাকতে না পারো, আমি নাটক বন্ধ করে দিতে বাধ্য হব।"

আমরা সবাই সমস্বরে বললুম, "ইয়েস স্যার।"

"খুব লাইট ঝোল-ভাত খাবে। ঝোলে গাঁদালপাতা দিতে বলবে। যখন-তখন চান করবে না। দই, টক খাবে না। চানাচুর, ফুচকা ছোঁবে না। রাত দশটার মধ্যে শুয়ে পড়বে।"

"ইয়েস স্যার।"

"আচ্ছা, এইবার সব হনুমান একপাশে ফল-ইন করো।"

বারোটা হনুমান একপাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

"তোমাদের আমি সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ করাব। সামরিক বাহিনীতে যদি ডিসিপ্লেনের অভাব হয় যুদ্ধ জয় করা অসম্ভব! আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। রামের সামনে তোমরা যখন প্রথমে আসবে, তখন তোমরা হাতজোড় করে রামের বন্দনা গাইবে। তখন তোমাদের লেজ মাটির দিকে নিচু হয়ে থাকবে। পয়েন্টিং ডাউনওয়ার্ডস।"

pathagar.net

শিবাঞ্জন বলল, "সেটা কী করে হবে স্যার। লেজগুলো তো ওদের ওরিজিন্যাল নয়। আমি তো সব মাথা-ওঁচানো লেজ করছি।"

"সে আমি জানি না। করতেই হবে। ভগবান মাথা দিয়েছেন, মাথা খাটাও।"

হনুমানরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, মানুষরা বসে-বসে মাথা খাটাতে লাগল। শিবাঞ্জন বলতে গিয়েছিল, "স্যার একমাত্র বেড়ালের লেজ আপ অ্যান্ড ডাউন করে।"

এক দাবড়ানি, "তোর কোনও অবজারভেশন নেই। মানুষ হয়ে হনুমানের মর্ম বুঝবি কী! হনুমানের লেজ যেমন লতিয়ে থাকে, সেইরকম খাড়া হয়ে মাথার দিকেও উঠে যায়। হ্যান্ডপাম্পের হাতলের মতো। একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের যে-কোনও অ্যাঙ্গেলেও ওঠানামা করে।"

শেষে একজন হনুমানের মাথা থেকেই বুদ্ধিটা বেরোল।

"স্যার হবে।"

"কী হবে?"

"লেজ অধোমুখ হবে। আমরা প্রথমে লেজটা ঘুরিয়ে পরব। বাঁকা দিকটা মাটির দিকে ফেরানো থাকবে। পরে সেইটা ঘুরে যাবে মাথার দিকে, পরার কায়দায়।"

স্যার লাফিয়ে উঠলেন, "আঃ দেখেছ, ঠিক বের করে ফেলেছে সমাধান। এই না হলে হনুমান! আচ্ছা আমরা তা হলে বন্দনাটা ঝালিয়ে নিই। সুর করে আমার সঙ্গে বলো, হাত জোড় করে—

ভজে বিশেষসুন্দরং সমস্তপাপখণ্ডনম্।
স্বভক্তচিত্তরঞ্জনং সদৈব রামমদ্বয়ম্॥
জটাকলাপশোভিতং সমস্তপাপনাশকম্।
স্বভক্তভীতিভঞ্জনং ভজে হ রামমদ্বয়ম্॥

এই দুটো স্তবক আগে হোক। হনুমানদের মধ্যে কে একজন 'স স' করছে। হনুমানের স-এর দোষ থাকে না। স-এর উচ্চারণ ঠিকমতো করো, নয়তো নাম কেটে দেব। সুর যেন ঠিক থাকে। সুরট মল্লার। আবার বলো, রিপিট, ভজে বিশেষসুন্দরং। আবার বলছি, বিশেস নয়, বিশেষ, বিশেষ। সমস্তপাপখণ্ডনম্। শমস্ত নয়, স স, সমস্ত, সমস্ত। কে একজন গাঁক-গাঁক করে গাধার মতো চেল্লাচ্ছ! মনে রাখো, হনুমান স্তোত্রপাঠ করছে। গাধা নয়। হনুমানের দলে গাধার কোন স্থান নেই।"

সে এক হিমশিম অবস্থা! একটাও সুরেলা হনুমান নেই। যাই হোক, হনুমানদের প্যারেড শুরু হল। লেফ্‌ট রাইট, রাম সীতা, রাম সীতা, অ্যাবাউট টার্ন। হল্ট। স্ট্যান্ড অ্যাট ইজ। আবার লেফ্‌ট রাইট।

pathagar.net

শিবাঞ্জন হঠাৎ বলে বলল, "প্যারেড হবে না স্যার।"

"কেন ? কেন হবে না। হওয়ালেই হবে।"

"তা হলে সব হনুমানকে বেঁড়ে হতে হবে। লেজ থাকলে চলবে না। এক-একটা হনুমানের পেছনে মিনিমাম দু'থেকে তিন ফুট ক্লিয়ারেন্স রাখতে হবে লেজের বাঁকের জন্যে। সেটা কি সম্ভব হবে !"

স্যার একটু চিন্তায় পড়লেন। শিবাঞ্জন ধরেছে ঠিক। আবার এক সমস্যা।

স্যার বললেন, "ঠিক বলেছিস ! আচ্ছা, একটা কাজ করলে কেমন হয় ?"

"কী কাজ স্যার ?"

"সাঁওতালি নৃত্যের মতো, হনুমানরা সার বেঁধে সামনে এগিয়ে যাবে, মাথা নিচু করে আবার পেছিয়ে আসবে। মাথা যখন নিচু করবে, মাথার ওপরে লেজটা নেচে উঠবে। কী বলিস, আইডিয়াটা কেমন ?"

শিবাঞ্জন বলল, "খুব ভাল। পিকচারেস্ক।"

"তা হলে সেইভাবেই হোক। হনুমান্‌স গেট রেডি। সামনে এগোও, মাথা নিচু, পেছিয়ে এসো। মাথা তোলো, আবার এগোও। মাথা নিচু, মাথা নিচু। পেছোও।"

এই চলল বেশ কিছুক্ষণ। হনুমানরা ঘর্মাক্ত। স্যার বললেন, "এইবার বিশ্রাম তোমাদের, এইবার আমি মেন ক্যারেক্টারদের নিয়ে পড়ি। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, রাবণ এগিয়ে এসো।"

রিহার্সালের পরেই স্কুলের মাঠে সীতার সঙ্গে রাবণের এক হাত খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেল। রাবণ তিন-চারদিন ধরেই সীতার সঙ্গে ঠুসঠাস চালাচ্ছিল, "তোকে আমি হরণ করব। আমার অশোক কাননে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখব। রামকে মেরে তোকে শিক্ষা দেব। সীতা দেবী তোকে কে রক্ষা করবে। ম্যায় হুঁ, ম্যায় হুঁ ম্যায় হুঁ রাবণ।" মাঝে-মাঝে মাথায় গাঁট্টা-টাট্টাও মারছিল। রিহার্সালের পর মাঠে নেমে, যেই 'সীতা দেবী' বলে হাত ধরেছে অমনই সীতা দেবী সোজা ঝেড়ে দিয়েছে এক ঘুসি রাবণের চোয়ালে। সীতা মারামারিতে ওস্তাদ। হালকা শরীর। কিছুদিন ক্যারাটে শিখেছিল। রাবণটা গোদা। নড়তেচড়তেই পারে না। সীতা পাকা বক্সারের কায়দায় ঝড়াঝন একরাউন্ড ঘুসি ঝেড়ে দিল। প্রায় দশ-বারোটা। রাবণের ঠোঁট কেটে গেছে। আমরা সবাই মিলে ছাড়িয়ে দিলুম। শিবাঞ্জন বলল, "এই সীতাকে রাবণ হরণ করবে কী করে ! এ-ই তো রাবণকে হরণ করে নিয়ে যাবে। এ তো ইচ্ছে করলে রামকেও ফ্ল্যাট করে দিতে পারে।"

আমাদের সীতার অনেক গুণ। লেখাপড়ায় ভীষণ ভাল। ভাল ফুটবলার। ফরওয়ার্ডে খেলে। বিদ্যুৎগতিতে লেফ্‌ট উইং দিয়ে ছোটে। ফাঁক পেলেই জোর

pathagar.net

শটে বল জড়িয়ে দেয় নেটে। সীতা আমাদের স্কুল টিমের নাম্বার ওয়ান স্কোরার। সেই সীতাকে রাবণ গেছে খোঁচাতে। বাল্মীকির ব্যাকিং না থাকলে পারবে সীতা হরণ করতে! রাবণ সেই কথাটা বুঝে কারও সঙ্গে কোনও কথা না বলে সোজা বাড়ি চলে গেল।

রাম আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়। সে শুধু লেখাপড়া নিয়েই থাকে। চোখ দুটো বড়-বড়। বেশ লম্বা। সাতেও থাকে না, পাঁচেও থাকে না। ঠাকুরদা নামকরা পণ্ডিত। বয়স প্রায় নব্বই। টকটকে ফরসা, ঋজু চেহারা। এখনও সোজা হাঁটেন। নিজে রান্না করে খান। কেউ তাঁর সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। রামের মধ্যেও সেইরকম একটা সাত্ত্বিক, তেজী ভাব। ভীষণ সিরিয়াস। এই রামের ওই সীতা, ভাবাই যায় না! স্যারের যেমন নির্বাচন!

শিবাঞ্জন বলল, "দেখবি, এই হয়ে রইল। অভিনয়ের রাতে কী হবে কে জানে!"

পরের দিন সকালে হেডস্যার আর অ্যাসিস্ট্যান্ট স্যার প্যান্ডেল, স্টেজ আর তোরণ নিয়ে পড়লেন। "তোরণ ইজ এ মাস্ট হোয়েন রাজ্যপাল ইজ কামিং।" এই কথাটা সহপ্রধান পানঠাসা মুখে বারেবারেই বলতে লাগলেন। আর হেডস্যার কেবলই বলছেন, "পিকটা ফেলে আসুন না। এনি মোমেন্ট ওভারফ্লো করবে।" বাংলার স্যার একটা নকশা হাতে মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন। চক দিয়ে লিখছেন, অশ্বত্থগাছ, সীতার পাতাল প্রবেশের স্পট। হনুমান ব্যালকনি। দশরথের চেয়ার।

এইসব হচ্ছে দেখে আমি আর শিবাঞ্জন গেলুম সিন আনতে। হরেনদা স্নান সেরেছেন। বাবরিচুল বেশ পাটে-পাটে আঁচড়ানো। খাটে বসে আছেন হাতজোড় করে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির সামনে ধূপ জ্বলছে। সুন্দর, মিষ্টি গন্ধ। আমরা দু'জনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি ধ্যান করছেন। নিথর শরীর। একসময় চোখ খুললেন। চোখ দুটো যেন সমুদ্রে স্নান করে উঠল। ঠাকুরের ছবির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমাদের দিকে তাকালেন। চিনতে পেরেছেন, "অ, তোমরা এসেছ! বেশ করেছ। বোসো। আমি গুপেকে ডাকি।"

হাতের কাছে একটা পেতলের ঘণ্টা। তিনবার নাড়লেন।

একটা ঝড় এসে ঢুকল ঘরে। পরদা ফেঁড়ে ঘরে একজন এলেন। পালোয়ানের মতো চেহারা। পরনে গামছা। গোটা শরীর তেলে চপচপ করছে। হরেনবাবু অবাক, "এ কী, তেল মেখে কী হচ্ছে?"

"তেলটা মাখতে বাধ্য হলুম। এখন আমার তেল মাখার কথা নয়। আমি তেল মাখব আর এক ঘণ্টা পরে।"

"তা হলে মাখলে কেন?"

"মাখতে বাধ্য হলুম। টিন থেকে তেল ঢালতে গেলুম শিশিতে। ধার

pathagar.net

কাটল না, পড়ে গেল মেঝেতে। অতটা তেল নষ্ট হবে, তাই মেখেই নিলুম।"

"কতটা ফেললে ?"

"তা পোয়াটাক।"

"সরষের তেলের দাম জানো ?"

"জানি বলেই তো কষ্ট করে মাখতে হল।"

"সেই ছেলে দুটি এসেছে, যাও গোডাউনে নিয়ে যাও।"

"এখন এই অবস্থায় যাব কী করে ! চান করব ! চান করলেই খিদে পাবে। ভাত খাব। ভাত খেলেই ঘুম পাবে। ঘণ্টা দুয়েক ঘুমোব। উঠতে-উঠতে বিকেল। তার মানে আজ আর হল না। সেই কাল।"

শিবাঞ্জন প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি, "কাল হলে হবে না স্যার। সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

হরেনবাবু আশ্বস্ত করলেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও, উতলা হওয়ার কিছু নেই। লোকটার স্বভাবই এইরকম। সব কাজেই প্রথমে না করবে, তারপরে তেল-টেল মাখালে হ্যাঁ হবে। জাত বাঙালি।

হরেনবাবু গলাটা নরম করে বললেন, "হ্যাঁ, রে সত্যিই হবে না ! ছেলে দুটো এত আশা নিয়ে এল। ধর তোকে যদি একটা কিছু উপহার দিই, তা হলে !"

"সেটা আমাকে তা হলে বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হবে, কী উপহার, কেমন উপহার।"

"ধর এক কেজি ভাল রাবড়ি, মোহনের দোকানের।"

"তা হলে ঝাঁ করে আমি দু'বালতি, বালতি তিনেকও হতে পারে, জল ঢেলে আসি। টাকাটা অ্যাডভান্স হবে কি ?"

"কথা ইজ কথা। হাতি কা দাঁত, মরদ কা বাত।"

হরেনবাবু বললেন, "ও আসতে-আসতে তোমাদের একটা স্কেচ করে ফেলি। তোমরা বোসো যেমন বসে আছ। বুঝলে, আর্টিস্টের হাত সবসময় চালু রাখতে হয়, ফেলে রাখলেই জং ধরে যায়। আর স্কেচ তুমি যত স্পিডে করতে পারবে, ততই লাইন ভাল আসবে, ফ্লোয়িং লাইনস। এইট বি পেনসিল, মোটা কাগজ।"

আমরা বসে আছি, হরেনবাবু ঘচঘচ পেনসিল চালাচ্ছেন। দশ মিনিটও লাগল না। আমরা কাগজে ধরা পড়ে গেলুম। শিবাঞ্জন খাটের ধারে উঠে গেছে। এইসব দেখলে তার খুব উত্তেজনা হয়। পাগলের মতো হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করছে, "আগে কোন দিকটা ধরলেন ?"

"আগে-পরে নেই। সবটাই একসঙ্গে। তুমি যখন সমুদ্র দ্যাখো, তখন কীভাবে দ্যাখো ?"

pathagar.net
SEP 2005

"ঢেউ দেখি, একের পর এক।"

"নো শুধু ঢেউ দ্যাখো না, তুমি প্রথমে দ্যাখো নীল আসমান, জমিন, সব নীলে নীল, সেইখানে দ্যাখো একের পর এক ঢেউ আর সাদা ফেনা। আর দ্যাখো হলুদ বালি। এইবার ওইখানে যদি কিছু লোক, ধরো জলে কি সৈকতে বসে আছে, তুমি আর্টিস্ট, তুমি কোনটা দেখবে। তোমাকে সবটা একসঙ্গে দেখতে হবে। খুব ভাল শিল্পী সমুদ্রের ফনফনে বাতাসটাও দেখবে। বাতাস তো দেখা যায় না, অনুভব করা যায়, বাতাসের অ্যাকশান দেখা যায়, চুলে, পোশাকে, ছিটিয়ে পড়া ঢেউয়ের ফেনায়। আর ঢেউই তো বাতাস। বড় ঢেউ, ছোট ঢেউ, রিপলস। একেই বলে সমগ্র দর্শন। সাধকেরও ওই এক কথা। স্রষ্টা আর সৃষ্টিকে এক করে দ্যাখো। যা নুড়ি, তাই পাথর, তাই পর্বত।"

হরেনবাবু শিবাঞ্জনের দিকে তাকিয়ে হাসছেন। গুপিবাবু একেবারে ফিটফাট হয়ে ঘরে এলেন। হরেনবাবু বললেন, "আবার সেই তেলটা মাথায় মেখেছিস গুপি! আমাকে এইবার বাড়িছাড়া করবি! তোমরা একটা গন্ধ পাচ্ছ না! হ্যাঁ গা, একটা ছারপোকা-ছারপোকা গন্ধ!"

আমি হ্যাঁ বলতে যাচ্ছিলুম, শিবাঞ্জন আমার হাতে চিমটি কাটল। সঙ্গে-সঙ্গে বুঝে গেলুম কী বলতে চাইছে। গুপিবাবু গোলমেলে, একবগ্‌গা লোক। হাতে রাখতে হবে। তাই চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

গুপিবাবু বললেন, "তোমার আর কী! একমাথা চুল। আমার যে ক'গাছা আছে, তাও তো সব ভুস-ভুস করে উঠে যাচ্ছে।"

"ওরে মূর্খ! ওই দুর্গন্ধী কবিরাজি তেলে যে টাক পড়ে যাবে গবেট! উঃ এই গন্ধটা আমার অসহ্য লাগে।"

"এটা কিসের গন্ধ জানো! জেসমিন, জেসমিন।"

"তোর মুণ্ডু। জেসমিন আমার কাছে আছে। শুঁকে দেখিস।"

"তোমার জেসমিন কী জানি না। আমার জেসমিন এইটা।"

গুপিদা উত্তেজিতভাবে আমাদের বললেন, "তোমাদের কী চাই?"

সেরেছে! সিন বুঝি আর কপালে জুটল না। শিবাঞ্জন মিষ্টিগলায় বলল, "সবে চান করেছেন, পিত্তি পড়বে। চলুন, ঘোষমশাইতে বসে একজোড়া চমচম খাবেন।"

"বাঃ, অতিশয় স্নেহপ্রবণ ভদ্রসন্তান! এ-ছেলে দেশের, দশের মুখ উজ্জ্বল করবে। মনুমেন্টের মাথায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবে। কলকাতার দুঃখমোচন করবে। চলো, চলো। পিত্তাধিক্যে শরীর বিকল হয়।"

রাস্তায় বেরিয়ে দু'পা হাঁটতে-না-হাঁটতেই শিবাঞ্জনের সঙ্গে গুপিবাবুর হলায়গলায় ভাব হয়ে গেল। ঘোষমশাইতে আমাদের গোটাদশেক টাকা খরচ

pathagar.net

হল। সে আর কী করা যাবে! গোডাউন বটে একখানা। কী নেই সেখানে! বাঘ-ভালুক ছাড়া সবই আছে। সে এক সিন!

শিবাঞ্জন বলল, "ঘাবড়াবার কিছু নেই। মানুষ সমুদ্রের অতল থেকে জাহাজের মালপত্র তুলে আনছে, আর আমার ডাঙা থেকে রামায়ণের সিন বের করে আনতে পারব না!"

গুপিদা তালা খুলে দিয়ে উদাস হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আবার গুনগুন করে গান গাইছিলেন, না চাহিলে যারে পাওয়া যায়। শেষে কী মনে হল, বললেন, "সরো, দেখি, কী করা যায়! আছে, সে তো আমিও জানি। এখন শুয়ে আছে, না খাড়া আছে!" গোটাকতক প্যাকিং বাক্স টপকে ভেতরে চলে গেলেন। সেইখান থেকে শোনা গেল, "ওঃ, দুটো চমচমের কী ঠেলা বাবা। দয়া করে ভেতরে এসো না! জামাইয়ের মতো দাঁড়িয়ে না থেকে।"

আমি জিজ্ঞেস করছি, "যাব গুপিদা!"

শিবাঞ্জন বলল, "কেন, সন্ধেবেলা এক কেজি রাবড়ি! চমচম তো ভূমিকা।"

ভেতরে হুড়মুড় করে কীসব পড়ে গেল। গুপিদার সাড়াশব্দ নেই। মরে গেল নাকি। বাক্স-টাক্স টপকে দু'জনে ভেতরে গেলাম। গুপিদা সিন চাপা পড়ে গেছে। মুণ্ডুটা বেরিয়ে আছে।

শিবাঞ্জন বলল, "কী গো গুপিদা!"

গুপিদা বলছে, ক্ষীণস্বরে, "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। রাবড়ির লোভে আজ জীবনটা গেল।"

"জীবন যাবে কেন, আমরা তোমাকে তুলছি ভাই!"

"তোদের ক্ষমতায় কুলোবে না রে চম। একসঙ্গে তিনটে ঘাড়ে পড়েছে।"

সত্যিই সে এক ভজঘট ব্যাপার। এক-একটার কম ওজন! তার ওপর ওই ঢাউস সাইজ। যাই হোক আধ ঘণ্টার মতো কসরত করে মানুষটাকে বের করা গেল। ফিটফাট বাবুটি আর নেই। ঝুলকালি-মাখা ভূত।"

ভদ্রলোক আমাদের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে, দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, "নাও, এইবার সিন দ্যাখো। অবস্থাটা একবার দেখেছ। এত জায়গায় আগুন লাগে, এই হতচ্ছাড়া গুদোমে লাগে না কেন! নাও, হাত লাগাও। এই চারটে হল রামায়ণের সিন।"

"আর ওই পাশের ওইগুলো!"

"শাহজাহান। তার ওপাশে চাণক্য। এইসব শিশিরবাবুর জন্যে আঁকা হয়েছিল। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাম শুনেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ভেরি গুড, তিনি আমার গুরু ছিলেন। তাঁর কাছেই আমার সব শিক্ষা।"

pathagar.net

"আপনি অভিনয় করতেন গুপিদা!"

"অভিনয় অতি তুচ্ছ জিনিস, আমি তার চেয়ে বড় কাজ করতুম। প্রত্যেকটা সিনের শেষে চা খাওয়াতুম। চা খাওয়াতুম বলে আমার কত আদর ছিল! তাই তো গুরু আমাকে সন্দিকরে বলতেন চাদর, গুরু বলতেন তুই আমাদের চা দিস তাই আমরা এনার্জি পাই, তুই চাদর। পুরনো কথা বলতে বসলে দিন খতম হয়ে যাবে। যাও, একটা টেম্পো কি দু'জন লোক ভাড়া করে আনো। ফিরে গিয়ে আমাকে আবার ওস্তাদের জন্যে রান্না চাপাতে হবে। আজ আবার শখ হয়েছে মৌরলা মাছ ভাজা খাবেন।"

সেই দুপুর দেড়টা থেকে শুরু হয়েছে, হ্যালো, হ্যালো, মাইক্রোফোন টেস্টিং, ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর। আজই আমাদের অনুষ্ঠান। তোরণ তৈরি হয়ে গেছে। তার মাথায় গার্মোকল কেটে শিবাঞ্জন লিখেছে, স্বাগত, মাননীয় রাজ্যপাল। তলার দিকে দু'পাশে খাড়া করে আটকেছে দুটো কাটআউট। দুটি মেয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শাঁখ বাজাচ্ছে। নিজের বন্ধু বলে বলছি না, কাজ দুটো ভীষণ ভাল হয়েছে। প্রধানশিক্ষক পিঠ চাপড়ে বলেছেন, সুপার্ব!

মঞ্চ রেডি। মাঝখানে বাংলার স্যার দাঁড়িয়ে তদারকি করছেন। পাশে সহপ্রধান। রাজ্যপাল আসছেন, সেই কারণেই চুল কেটেছেন। সে যা হয়েছে! যেন ঘাস ছাঁট। তাঁরা দু'জনে সীতার গর্ত তৈরি করাচ্ছেন। সহপ্রধান মিস্ত্রিকে বলছেন, "আরে রাস্তার ম্যানহোল দ্যাখোনি! এগজ্যাক্টলি সেই কায়দা।"

মিস্ত্রি বলছেন, "গোলটোল হবে না, চারচৌকো হতে পারে।"

বাংলার স্যার বলছেন, "আরে তাই হোক না।"

"বেশ, আমি করে দিচ্ছি, তবে পরে আপনারা বিপদে পড়বেন। সব ভণ্ডুল করবে ওই গর্ত। স্টেজের তলাটা কেমন, কোনও ধারণা আছে বাবু! খোঁটা আছে কম-সে-কম সত্তরটা। বড়জোর একটা কুকুর ঢুকতে পারে। আপনি বলছেন একটা ডালা নিয়ে চারটে ছেলে ঢুকবে, তার ওপর আবার আর-একটা ছেলে। জিন্দিগিতে এমন থিয়েটার শুনিনি। নাটকটা কি সিঁদেল চোরের কাহিনী!"

"শুনবে কী করে! তুমি যে বাবু পুরনো কালেই পড়ে আছ। স্টেজক্র্যাফট কোথায় এগিয়েছে জানো? আমেরিকা স্টেজে হেলিকপ্টার নামাচ্ছে।"

"এটা আমেরিকা নয়, ইংল্যান্ড নয়, ইন্ডিয়া। এ-দেশে এখনও রিকশা চলে। মানুষ গামছা পরে ঘুরে বেড়ায়।"

সহপ্রধান আর বাংলার স্যার দু'জনে মিলে মঞ্চের তলাটা দেখতে গেলেন, সঙ্গে আমি আর শিবাঞ্জন। সহপ্রধান দেখেই বললেন, "অসম্ভব। প্ল্যান বাতিল। রামায়ণে সীতার ওপর যথেষ্ট অত্যাচার করা হয়েছে, ফের এখন এই অত্যাচার

pathagar.net

করাটা মানবিক কারণেই অনুচিত। কেমন করে একটা ট্রলি এই খোঁটার জঙ্গলে ঢুকবে! চারপাশে গজালের মতো বড়-বড় পেরেক। প্ল্যান পালটান, প্ল্যান পালটান। সীতা কি শেষে যিশু খ্রিস্ট হয়ে ঝুলবে।"

"আপনারই প্ল্যান, লাস্ট মোমেন্ট আপনিই চেঞ্জ করছেন। আর ওই প্রথম দৃশ্যটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে গোটা নাটকটা।"

"আরে মশাই, নাটকটা তো দাঁড়িয়ে আছে, আপনার সীতা কোথায় দাঁড়াবে! এক হয়, পাতাল আর স্বর্গ যদি স্থান পরিবর্তন করে। পাতালটা মনে করুন ওপরে, স্টেজের মাথায় আকাশ। সেখান থেকে দড়ি বেঁধে সীতাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হল।"

"অ্যাবসার্ড! আপনি আপনার সুবিধে দেখছেন, ভাষার দিকে একবারও তাকাচ্ছেন না! আকাশ মানে আকাশ। মানে গগন, অন্তরীক্ষ, ব্যোম, শূন্য, আ যুক্ত কাশ ধাতুর অ (ধি)। আর পাতাল মানে, পুরাণোক্ত ত্রিভুবনের সর্বনিম্নস্থ ভুবন, নাগলোক, পৃথিবীর অধোদেশস্থ ভুবন, ভূগর্ভ। অভিধানের এই অর্থ বদলে আকাশকে পাতালে, পাতালকে আকাশে পাঠানো যায়! ব্যাকরণ ইজ ব্যাকরণ!"

হঠাৎ পেছনে প্রধানশিক্ষক মহাশয়ের গলায় আমরা চমকে উঠেছি, "মাস্টারমশাই, আপনি নাটক লিখেছেন না ব্যাকরণ! ছি ছি, বড় মানুষের এ কী আচরণ! মশাই, ওপরে কত কাজ এখনও বাকি, আর আপনারা দু'জন রেসপনসিবল মানুষ এখানে ধাতুরূপ শব্দরূপ করছেন! অভাবনীয়। ওসব ছেলে-ছোকরাদের হাতে ছেড়ে দিন।"

হেডমাস্টারমশাই গটমট করে চলে গেলেন। আমরা সবাই অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রইলুম। এরই মাঝে শিবাঞ্জন, 'ইউরেকা' বলে লাফিয়ে উঠেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল, "উরে বাবা।" মাথার ওপর বাঁশ, খেয়াল করেনি।

"জল দে, জলদি জল দে," বলে সহপ্রধানের চিৎকার।

শিবাঞ্জন সামলে নিয়ে বলল, "স্যার, তেমন লাগেনি। মাথার মাঝখানটা সুড়সুড় করছে। মনে হয় একটু রক্ত বেরিয়েছে, এখনই জমে যাবে। শুভকাজে একটু রক্তপাত ভাল স্যার।"

"তা, তুমি বাবা অমন লাফিয়ে উঠলে, কেন কারণটা কী!"

"স্টেজে ম্যানহোল করতে হবে না স্যার, আমার মাথায় অন্য আইডিয়া এসেছে।"

"বলো না, বলো না।" স্যার কেমন যেন হয়ে গেলেন। যাকে বলে অভিভূত।

শিবাঞ্জন দুষ্টু-দুষ্টু হেসে বলল, "সে দেখবেন যখন হবে চমকে যাবেন।"

হেডমাস্টারমশাই হাতজোড় করে বললেন, "শুধু নিজেদের ফ্যাশান নিয়ে

pathagar.net

থাকবেন না স্যার। আমার ফাংশানটাও একটু উদ্ধার করতে হবে তো! আই রিকোয়েস্ট।"

সহপ্রধান আবার মুখে পান ঠুসেছেন, তার ওপর ছেড়েছেন তিন টিপ জর্দা। সেই অবস্থায় কিছু একটা বলতে চাইলেন। প্রধানশিক্ষক দু'হাত তুলে বাধা দিলেন, "থাক, থাক, আর কিছু শুনতে চাই না। আমি বুঝে গেছি! একেই বলে অন্তর্ঘাত। একটা দিন, মাত্র একটা দিনের জন্যে আপনার এই বদঅভ্যাসটা বন্ধ রাখতে পারছেন না! জাস্ট ফর এ ফিউ আওয়ার্স। গভর্নরের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন, মুখে পান-জর্দা, হাতে পানের বোঁটায় চুন। হোয়াট এ সিন।"

সহপ্রধান একপাশে হেলে প্যাঁক করে খানিক পানের পিক ফেলে বললেন, "বাঃ, এরই মধ্যে ফাংশানটাকে ফেঁড়ে ফেললেন, দু'ভাগে, আমার-তোমার! এটা কিন্তু আপনিই করলেন, আমরা করিনি। আমরা এই যে তলায় এসেছি, এটা একটা টেকনিক্যাল কারণে, অকারণে আসিনি স্যার।"

হেডমাস্টারমশাই ইশারা করে দেখালেন, সহপ্রধানের পাঞ্জাবির বুকে একফোঁটা পানের পিক লেগেছে।

সহপ্রধান একবার দেখে নিয়ে বললেন, "এই বাজারে একটু লালের স্পট থাকা ভাল। ওটা হল রক্ষাকবচ। আচ্ছা, এইবার চলুন, ওদিকটা দেখা যাক। নির্মলবাবু চলে আসুন।"

ওঁরা চলে যেতেই শিবাঞ্জনকে বললুম, "তোর আবিষ্কারটা কী শুনি?"

"একবার বাড়িতে যেতে হবে, চল আমার সঙ্গে।"

শিবাঞ্জনদের বাড়ি স্কুলের খুব কাছেই। শিবাঞ্জন আমাকে নিয়ে তরতর করে চিলেকোঠায় চলে এল। সেইখান থেকে দু'জনে টেনেটুনে বিশাল বড় একটা কাগজের বাক্স বের করলুম। বাক্সটা বেশ শক্তপোক্ত। একসময় টিভি এসেছিল।

শিবাঞ্জন বলল, "ভেতরে বোস তো।"

বসলুম। মাথার চাঁদিটা জেগে রইল।

শিবাঞ্জন বলল, মাথাটা নিচু কর।"

নিচু করলাম। শিবাঞ্জন বলল, "হবে ফাসক্লাস হবে। সামনের দিকটায় কালো কাগজ মেরে দিই।" বাক্স নিয়ে যখন ফিরে এলুম, স্টেজ তখন রেডি। লাল-কার্পেট, সাদা চাদর ঢাকা লম্বা টেবিল। সাদা-সাদা চেয়ার। দুটো ফুলদান, সুন্দর তোড়া। পেছনে ভেলভেটের পরদা। তার ওপর শিবাঞ্জনের আর্ট, সাদা একটা রাজহাঁস, একটা বীণা। একটা পদ্ম। একেবারে ফেটে গেছে। রাজ্যপাল যেদিক দিয়ে উঠবেন সেদিকে রেলিং লাগানো বেশ শক্ত সিঁড়ি।

মঞ্চের ভারবহন ক্ষমতা পরীক্ষা করা হচ্ছে। প্রথমে সিঁড়ি। আমাদের জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষক খুব মোটা। তিনি বারবার উঠছেন, নামছেন। ধপাস-

pathagar.net

ধপাস করে। দু-চারবার করে বললেন, "নাঃ, কোনও ভয় নেই। আমি ইজিকলটু চারটে সাধারণ লোক। রাজ্যপালের চেহারা সাধারণ চেহারা, কোনও ভয় নেই।"

হেডমাস্টারমশাই মেয়েদের ডাকলেন। তিরিশজন। সকলকেই মঞ্চে তোলা হল।

সহপ্রধান বললেন, "জাম্প।"

তারা লাফাচ্ছে। হেডমাস্টারমশাই বললেন, "টেস্ট করতে গিয়ে খোলনলচে খুলে পড়ে না যায়!"—বলতে-না-বলতেই ফুলদানি দুটো উলটে পড়ে গেল।

সহপ্রধান বললেন, "নুইসেন্স। আমি আগেই বলেছিলুম, যে-কোনও সভা পণ্ড করার পক্ষে গোটা দুই ফুলদানিই যথেষ্ট। অ্যায়, এই দুটোকে ঘাড় ধরে মঞ্চ থেকে বিদায় কর। আমি যে বলেছিলুম টেবিলের মাঝখানে একটা ইকেবানা ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট রাখতে। সেটা কই! শিবাঞ্জন!"

"ভুলে গেছি স্যার!"

"ভুললে তো চলবে না স্যার। এখনও এক ঘণ্টা সময় আছে, করে ফ্যালো। তোমার প্রতিভা আছে। রাজ্যপালের সামনে সেই প্রতিভা প্লেস করো।"

বেচারা শিবাঞ্জন আর পারছে না। জিজ্ঞেস করল, "কিসে করব স্যার?"

"আমার মাথায়, আমার খুলিতে।" যত সময় এগিয়ে আসছে, ততই সকলের টেম্পার চড়ছে। শিবাঞ্জন আবার লাফিয়ে উঠল, "ইউরেকা।" মৃদুলা কুঁক-কুঁক করে হেসে উঠল। ফার্স্টক্লাসে পড়ে মৃদুলা। লেখাপড়ায় যেমন ভাল, তেমনই ভাল নাচে গায়। মৃদুলা শিবাঞ্জনকে ভালবাসে। আমরা সবাই জানি। শিবাঞ্জন জানে না! সে নিজের খেয়ালেই বনবন ঘোরে। শিল্পীরা মনে হয় এইরকমই হয়। শিবাঞ্জন গ্রাহ্যই করল না। এক লাফে নেমে গেল মঞ্চ থেকে। ছুটল বাড়িতে। সেখান থেকে নিয়ে এল এক বিশাল বড় একটা ঝিনুকের খোলা। জিনিসটা আন্দামানের। আধ ঘণ্টার মধ্যে সে একটা কাজ নামাল, হাঁ করে তাকিয়ে দেখার মতো।

তখনও কিন্তু শাঁখের রিহার্সাল চলছে। ওয়ান-টু-থ্রি, পোঁ!

সহপ্রধান পরিচালনা করছেন, "হল-না, হল না। তিনটে পোঁ করেনি, ফোঁ করেছে।"

রিহার্সাল শেষ হওয়ার পর ফাঁক পেয়ে মৃদুলা শিবাঞ্জনের পাশে এসে দাঁড়াল, "কী দারুণ করেছিস রে!"

আমার খুব হিংসে হচ্ছিল। বাংলার স্যার দাবড়ানি দিলেন, "তাতে তোমার কী! ওর মাথাটা খারাপ করে দিয়ো না মা। এখনও অনেক কাজ বাকি। দয়া করে এসো এখন। আমাদের শ্রাদ্ধটা হয়ে যাক।"

pathagar.net

ঠিক পাঁচটায় গভর্নর আসবেন। সাড়ে চারটে বাজল। প্রধানশিক্ষক সমস্ত দিক একবার ঘুরে দেখে এলেন। হেঁ, মনে হচ্ছে নিখুঁত। কোথাও কোনও ত্রুটি তো চোখে পড়ছে না। তোরণ থেকে গেট সব ঝাড়ু দিয়ে ধুয়েমুছে ঝকঝকে, তকতকে। দুটো বড় গর্ত ; সে গর্ত আজ পনেরো বছর ধরেই আছে। সারানো হবে না। বলা হল, গভর্নর আসছেন, যদি একটু তাপ্পিতুপ্পি মেরে দেন। তাতে রাস্তা মেরামত দফতরের বড়কর্তা বললেন, "ওসব নকশা আমাকে দেখাবেন না। আজকাল একটা কায়দা হয়েছে, যে-কোনও ছেঁচড়া অনুষ্ঠানে গভর্নরকে ধরে আনা। চালাকিটা আমরা বুঝি। আসল উদ্দেশ্যটা হল, ওই ছুতোয় রাস্তাটা মেরামত করিয়ে নেওয়া। আমরা ধরে ফেলেছি ভাই। গভর্নর বড় রাস্তা ছেড়ে গলিঘুঁজিতে ঢুকতে চাইলে আমরা কী করতে পারি!"

ওই গর্ত দুটো আমরাই রাবিশ ঢেলে পিটিয়ে যা হয় একরকম করেছি।

সিকিউরিটি অফিসার বললেন, "সেকেলে বুদ্ধি নিয়ে একেলে টেররিস্ট ধরতে হলে আপনার কবে চাকরি চলে যেত! আর. ডি. এক্স. জানেন কাকে বলে! ট্যাঁকে, ট্যাঁকে থাকে আধুলির মতো। একটা ঘষা, এই প্যাঙেল-ফ্যাঙেল, গ্রাম-ট্রাম উড়ে যাবে।"

হঠাৎ ড্রামের আওয়াজ, ডুডুডুম, ড্রাম ড্রাম। আর. এসে গেলেন নাকি?

সবাই হুড়মুড় করে দৌড়লেন, দেখা গেল কিছুই নয়, শুভাশিস ড্রামের চার্জে, সে একবার দেখে নিচ্ছে যন্ত্রপাতিগুলো ঠিক মেজাজে আছে কি না। হেডমাস্টার মশাই একটু অসন্তুষ্ট হয়েছেন, মুখ দেখেই বোঝা গেল : কিন্তু অসহায়! সবাই রিহার্সাল দিচ্ছে, শুভাশিসও দেবে। বাধা দিলে চলবে না।

এই সময় সহপ্রধান মনে করিয়ে দিলেন, "শাঁখের সঙ্গে গান হবে বলেছিলেন, শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে।"

"রাজ্যপালকে জননী বলা যায় না।"

"তা হলে জননীর জায়গায় জনক বসিয়ে দিন।"

"ছন্দ মিলবে না।"

"হ্যাঁ, তাও তো বটে! তা হলে একটা কাজ করুন, গায়ে তো ফুল ছুড়ে মারা হবে, সেই সময় যদি গাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের গান :

পুষ্প দিয়ে মারো যারে চিনল না সে মরণকে।
বাণ খেয়ে যে পড়ে সে যে ধরে তোমার চরণকে॥

হেডমাস্টারমশাই আঁতকে উঠে বললেন, "আমাকে জেলে পাঠাতে চান! রাজ্যপালকে বাণ মারব! কোনও গানের প্রয়োজন নেই, কেবল শাঁখ আর ব্যান্ড। তাইতেই দেখবেন ব্লাড প্রেশার টু ফর্টি। গেট রেডি। আর মাত্র টেন মিনিটস। রাজ্যপালকে আপনি রিসিভ করবেন।"

"তা হলে এই দশ মিনিটে ঝপ করে আমি একটু পান খেয়ে নিই।"

pathagar.net

"প্লিজ হেমন্তবাবু, ওই কাজটা আপনি করবেন না। আমি বড় হয়েও আপনার পায়ে ধরছি।"

স্কুলের গেটে ওসি। এক ব্যাটেলিয়ান পুলিশের লাইন আপ। ওসির কানে ওয়াকিটকি। তিনি আওয়াজ দিলেন, "আসছেন?" আর ঠিক সেই সময় বেপাড়ার একটা কুকুর এল কী হচ্ছে দেখতে। সঙ্গে-সঙ্গে স্কুলের গেট ফুঁড়ে বেরিয়ে এল আমাদের বিগ ভোলা। বিদ্যুৎবেগে! নিমেষে ঝটাপটি। মেয়েরা লাইন ভেঙে চিল-চিৎকার করতে করতে যে যেদিকে পারল দৌড়ল। শিবাঞ্জন চেঁচাচ্ছে, "আমার গেট, আমার গেট।" গেটের দু'পাশের ঘট রাস্তায় গড়াচ্ছে। ধুন্ধুমার মারামারি। ওসি চিৎকার করছেন, "চার্জ, চার্জ, ফায়ার, টিয়ারগ্যাস।" সেই মুহূর্তে দূরে শোনা গেল, সাইরেন, ওঁয়া ওঁয়া। সহপ্রধান বললেন, "সর্বনাশ! রাজ্যপাল আ গিয়া!"

পুলিশের বেধড়ক লাঠি চার্জ। কুকুর দুটোর একটানা কেঁউ কেঁউ। রাজ্যপাল নামলেন। প্রধানশিক্ষক অর্ডার দিলেন, শঙ্খ। শঙ্খধারিণীরা যে যেখানে ছিল, সেইখান থেকেই শাঁখ বাজাতে লাগল। শুভাশিসের ব্যান্ড, ধ্যাপ্‌পড়, ধ্যাপ্‌পড়। মেয়েরা নেই। প্রধানশিক্ষকই পুষ্পবৃষ্টি করছেন। কলাগাছ সমেত ঘট রাস্তায় শুয়ে আছে। সহপ্রধান এগিয়ে এসে মাথা নিচু করে, হাতজোড় করে বলছেন, "স্বাগতম, স্বাগতম, ওয়েলকাম, ওয়েলকাম, ফর্চুনেট উই আর দ্যাট ইউ হ্যাভ কাম। ওয়েলকাম, ওয়েলকাম।"

সহপ্রধানের জন্য রাজপাল এগোতে পারছেন না। তিনি কেবল বলছেন, "থ্যাঙ্কস্, থ্যাঙ্কস্।"

শেষে সিকিউরিটির একজন, এক ধাক্কা মেরে সহপ্রধানকে পাশে সরিয়ে দিলেন। রাজ্যপাল ধীরে-ধীরে মঞ্চে উঠে সিংহাসন চেয়ারে বসলেন। বাংলার স্যার মাইক্রোফোনের সামনে। স্বাগত ভাষণ, "আজ আমাদের..." মাইক্রোফোনের নিজের ভাষায় নিজের কিছু বলার ছিল, "চ্যাঁ চোঁ, সিঁ, কোঁড়র কোঁত।"

যাঁরা সামনের আসনে ছিলেন চিৎকার করে উঠলেন, "মাইক, মাইক।"

ওপাশ থেকে আওয়াজ এল, "টয়লেটে।"

বাংলার শিক্ষক অসহায়। আবার চেষ্টা, "আজ...।"

এবারে মাইক্রোফোন ক্ষিপ্ত, "চোঁও ও চোঁক।"

স্যার বললেন, "ইমপসিব্‌ল"।

মাইক বললে, "ভোঁচ।"

এমন সময় মাইকম্যান এল। সবাই বলে তেএঁটে বিশ। মাইক ঠিক হল। স্যার শুরু করলেন, "আজ আমাদের পরম সৌভাগ্যের দিন। এই সুপ্রাচীন বিদ্যালয়ে প্রথম এক রাজ্যপাল এলেন। আমরা কৃতজ্ঞ, আমরা ধন্য, আমরা অভিভূত, অমরা উচ্ছ্বসিত, আমরা বাক্যাহত।"

pathagar.net

হেডমাস্টারমশাই ইশারা করছেন, আর না, আর না।

শেষে সহপ্রধান স্টেজে সাতটা বাচ্চা মেয়ে নামিয়ে দিলেন। ফুটফুটে সুন্দর, প্রত্যেকের হাতে মালা। তারা নেচে-নেচে আসছে। পেছনে বসে গান গাইছেন উমাদির দল—

ফুল বলে, ধন্য আমি মাটির পরে
দেবতা ওগো, তোমার সেবা আমার ঘরে ॥
জন্ম নিয়েছি ধূলিতে দয়া করে দাও ভুলিতে,
নাই ধূলি মোর অন্তরে ॥

গানের সুরে আদেশ এল, "বড় মালাটা পরিয়ে দাও।" কুচো ফুলের বৃষ্টি। অমিতা নাচতে-নাচতে গিয়ে মালা পরাল। সঙ্গে সঙ্গে ঝুপুস ঝুপুস গোলাপের পাপড়ি বর্ষণ। আবার গান—

নয়ন তোমার নত করো,
দলগুলি কাঁপে থরোথরো।
চরণপরশ দিয়ো দিয়ো, ধূলির ধনকে করো স্বর্গীয়
ধরার প্রণাম আমি

গানের সুরে আদেশ, "ওয়ান বাই ওয়ান, প্লেস ইয়োর মালা অন হিজ হাইনেসেস ফিট। নেচে নেচে, তিক তিক, তেরে কেটে, তিক, ধারার প্রণাম আমি তোমার তরে। ওয়ান ব্যাক, তোমার তরে, টু ব্যাক। স্টার্ট ব্যান্ড, হালকা নোট, ওনলি কেট্‌ল ড্রাম, কুটুল কুটুল। শাঁখ, পুঁওঁওঁ। স্টপ।"

এরপর একেবারে তেড়ে গান, "জনগণমন অধিনায়ক জয় হে, জয় হে।"

বিগ ড্রামের, ড্যাম্ভ ড্যাম্ভ।

অভ্যর্থনা পর্ব শেষ হয়ে গেল। শোভনা, আমাদের সুন্দরী শোভনা, রাজ্যপালকে চন্দনের টিপ পরিয়েছে। রাজ্যপাল আবার তাকে একটা পালটা টিপ পরিয়ে দিয়েছেন। সে কী গর্বের কথা! দেখি-দেখি করে সব মেয়ে তেড়ে-তেড়ে এসে দেখছে।

প্রধানশিক্ষকমশাই একটা সিল্কের উত্তরীয় রাজ্যপালকে পরিয়ে দিলেন। দু'জনের করমর্দন হল।

সহপ্রধান এইবারে মাইক্রোফোনে দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠানের পর্ব ঘোষণা করলেন। স্কুলের সেক্রেটারি বিখ্যাত ব্যবসায়ী চাঁদপাল সরকার স্বল্প কথায় স্কুলের পরিচিতি দিলেন, "দিস ইজ অ্যান ওল্ড ইনস্টিটিউশন বাট স্টিল ইয়াং। এই স্কুল থেকে যাঁরা পাস করে বেরিয়ে গেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ আজ বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, মন্ত্রী। একমাত্র আমিই এক মূর্খ, কিস্যু, কিস্যু হতে পা...।"

হাউহাউ কান্না। সহপ্রধান সরিয়ে আনলেন। উমাদি বেঁচেই ছিলেন, সঙ্গে

pathagar.net

সঙ্গে ধরে দিলেন গান, "ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়।"

চাঁদপালবাবুর সমস্যা তখনও মেটেনি। তিনি আমাদের সাজঘরের একটা টুলে বসে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে সমানে কাঁদছেন আর হাপুস-হাপুস করে শ্বাস ফেলছেন হাপরের মতো। ক্রমশই যেন নেতিয়ে পড়ছেন। আমরা স্যারকে ডেকে আনলুম, "দেখুন, সেই থেকে কেমন করছেন হাপরের মতো। মনে হচ্ছে দম আটকে যাবে যে-কোনও মুহূর্তে।"

পণ্ডিতমশাই কবিরাজি করেন। নাড়ি টিপে বললেন, "ভয়ঙ্কর এলোমেলো, হনুমানের নাড়ির মতো। দুর্বলে সবলা নাড়ি সা নাড়ি প্রাণঘাতিকা। এঁকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করাই বিধেয়।"

শুরু হল দৌড়ঝাঁপ। হেডমাস্টারমশাই মঞ্চ ছেড়ে এলেন, সহপ্রধান ছিটকে চলে এসেছেন। রাজ্যপালের ভাষণ হচ্ছে, "এডুকেশান মেক্‌স এ ম্যান। শিক্ষা ছাড়া মানুষ তার জীবনের অর্থ বুঝতে পারে না। শিক্ষা মানুষকে সহ্যশক্তি দেয়, উদারতা দেয়। শিক্ষিতের সমাজের চেহারা শান্ত, কল্যাণমূলক, আনন্দের, অগ্রগতির, ভ্রাতৃত্বের, ভালবাসার। অশিক্ষিত মানুষের সঙ্গে বনের পশুর তফাত নেই কোনও। গোরু শান্ত প্রাণী, হনুমান ছটফটে, বাঘ হিংস্র, হরিণ অহিংস, সব একজায়গায় আছে তাই এত অশান্তি। এদের যদি এডুকেশন দেওয়া যেত, হিংসা নয়, শান্তি, বৈরিতা নয়, ভ্রাতৃত্ব, যদি মিনিমাম একটা এডুকেশানে ফেলা যেত, জঙ্গল হত সিট অব ডিপ কালচার।"

চাঁদপালবাবু চিত হয়ে শুয়ে ধড়ফড় করছেন। হেডমাস্টার বলছেন, "এ শিওর হার্ট অ্যাটাকের দিকে যাচ্ছে। এই বয়সে রোজ রাতে গাওয়া ঘিয়ের লুচি সহ্য হয়! হার্টে ফ্যাট ঢুকেছে। হয়ে গেল! সেক্রেটারি মারা গেলে ফাংশান আর হয় কী করে? পতাকা অর্ধনমিত। ব্যায়লা বাজিয়ে ড্রপ সিন। কোনওরকমে আজকের মতো প্রাণটা ধরে রাখতে পারেন না! অন্তত রাত বারোটা পর্যন্ত!"

চাঁদপালবাবু ডুকরে উঠলেন, "এ হার্ট নয়, এ হল গভার্নার শক। হল না, কিছু হল না আমার জীবনে।"

হেডমাস্টারমশাই বললেন, "আপনার হতে আর বাকিটা কী আছে! এই শহরে তিনখানা বাড়ি। মধ্যমগ্রামে বাগানবাড়ি। নির্বাচনে একবার দাঁড়িয়েছিলেন, পনেরো হাজার ভোট পেয়েছিলেন। আবার কী! আর কী হতে পারে?"

"আমি দান করব, এই মুহূর্তে আমি সায়েন্স ল্যাবরেটরির জন্যে স্কুলকে দশ লাখ দান করব।"

"আগেও বহুবার বলছেন, ফল্‌স।"

"এবার সত্য। আমার ভেতর থেকে হৃৎপিঞ্জর ভেদ করে সেই দান বেরিয়ে আসতে চাইছে। আপনি গভর্নরকে দিয়ে অ্যানাউন্স করান।"

pathagar.net

"আগে চেক।"

"আগে অ্যানাউন্সমেন্ট।"

"আগে চেক।"

"বই বাড়িতে।"

"নিয়ে আসুন। পাশেই বাড়ি।"

"পাঁচ লাখ দেব।"

"তাই দিন।"

"এক লাখ।"

"বেশ তাই।"

"ভেবে দেখলুম, হঠকারিতা ভাল নয়, পরে ভেবেচিন্তে করা যাবে।"

"তা হলে এখন আপনি বাড়ি গিয়ে একটু বিশ্রাম করুন। খুব উত্তেজনা হয়েছে তো!"

"আমি যদি এখানে একটু শুয়ে থাকি তা হলে আপনাদের কোনও অসুবিধা আছে কি? রাজ্যপালের সঙ্গে আমার প্রাইভেট কথা আছে। আমি রাজ্যপালের ফান্ডে দু' লাখ টাকা দান করে পদ্মশ্রী হব।"

তা সে আপনার প্রাইভেট ব্যাপার, প্রাইভেটলি বুঝে নিন।"

"বক্তৃতা শেষ হওয়ামাত্রই অ্যানাউন্স করে দিন, মাননীয় চাঁদপাল সরকার, সেক্রেটারি, প্রখ্যাত সমাজসেবী, দানবীর, মহাবীর রাজ্যপালের ফান্ডে দু' লক্ষ টাকা দান করছেন, শিক্ষার প্রসারে, আর্তের সেবায়। প্রতিশ্রুতবদ্ধ টাকা তিনি কাল রাজ্যপালের দপ্তরে জমা করে দিয়ে আসবেন।"

সহপ্রধান বললেন, "আপনার অনেক ঢং আমরা দেখে-দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছি মশাই। পরের কাঁধে বন্দুক রেখে অনেক দেগেছেন, আর না। ওই দেখুন আপনার স্ত্রী এসে গেছেন, এইবার নিজেরা বোঝাপড়া করুন। দু' লাখ টাকা দেবেন কি দেবেন না! আপনার স্ত্রীর অনুমতি আছে কি না!"

সেই মহিলা রণরঙ্গিনী। মহিলা সমিতির নেত্রী। এগিয়ে এসে হাত ধরে হ্যাঁচকা টান, "ওঠো। আর সাতদিন দেখব তারপর হাতে-পায়ে বেড়ি দিয়ে ফেলে রাখব। মাথাটা কতটা বিগড়েছে তখন বুঝবে।"

ভদ্রলোক কেঁচো হয়ে গেলেন। বলা নেই কওয়া নেই বেসুরো গাইতে লাগলেন, "জীবন আমার বিফলে গেল, লাগিল না কোনও কাজে।"

চাঁদপালবাবুর স্ত্রী পাড়ার সবাই যাঁকে বউদি বলেন, তিনি এইবার আসল কথাটি বলে দিলেন, "এইরকম কেন করছেন জানেন? চিটফান্ড। আজ হোক কাল হোক শ্রীঘরে এঁকে যেতেই হবে। কত লোকের টাকা মেরে বসে আছেন। আর তা না হলে গণধোলাই। হাড় একদিকে, মাস একদিকে।"

সহপ্রধান বললেন, "ও, সেই কারণে রাজ্যপালের তহবিলে দান!"

pathagar.net

চাঁদপালবাবু "ঘরের শত্রু, ঘরের শত্রু" বলতে-বলতে উঠে পড়লেন। চটি গলিয়ে হাওয়া।

রাজ্যপালের ভাষণ শেষ। সহপ্রধান দৌড়ে গেলেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। "আমাদের বিদ্যালয়ের সুদীর্ঘ ইতিহাসের স্মরণীয় দিন হয়ে রইল আজকের দিনটি।"

রাজ্যপালের ভাষণ কিছুই শোনেননি, তবু বললেন, "সমাজ, জীবন, শিক্ষা, চরিত্রগঠন ও কর্তব্য সম্পর্কে আপনি যা বললেন, তা আমাদের মনে রাখতে হবে। দেশের বিভেদকামী শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। অখণ্ড ভারত। অখণ্ড মানব ঐক্য। বর্ণমালার নতুন পাঠ হবে এইরকম, অ-এ অজগর আসছে তেড়ে নয়, অ-এ অখণ্ড ভারত। আ-এ আম নয়, আত্মত্যাগ। ই-তে ইঁদুর নয়, ইনকিলাব। ঈ-তে ঈগল নয়, ঈষা মানে লাঙ্গলদণ্ড। প্লাউ। মানে কর্ষণ, মানে মানবজমিনকে চাষ করতে হবে। এমন মানবজমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা।"

ফাটাফাটি হাততালি। রাজ্যপাল বাংলা বোঝেন না, কিন্তু হাততালির অর্থ বোঝেন তো! সহপ্রধান তাঁর চেয়ে বেশি হাততালি পেয়েছেন। আমাদের গর্ব। জিন্দাবাদ। বন্দেমাতরম।

এইবার আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শুভব্রতর গলা খুব ভারী। মাস্টারমশাইরা বলেন, বাস ভয়েস। শুভব্রত নিজে বলে, আমার গোল্ডন ভয়েস। তার জীবনের একমাত্র অ্যাম্বিশান হল, টেলিভিশানে খবর পড়বে। সেই শুভব্রত ঘোষণা করছে। "এখন শুরু হচ্ছে আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রথমে তিনটি রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করছে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রিবৃন্দ। তারপরেই আমাদের নাটক, রাবণবধ। রচনা, আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহাশয়, নির্মলকুমার, মুখোপাধ্যায়, অভিনয়াংশে...।" হড়হড় করে নাম পড়ে গেল। সবশেষে হনুমানের দল। সে আবার কত কায়দা, হনুমানশ্রী পঞ্চানন পাল, নির্মল দুবে, সনাতন সরকার, শ্যামল সর্বাধিকারী...।

সামনের ফালিমঞ্চে গান বসে গেল। তারস্বরে। পেছনের পরদা, তার পেছনে আমরা। শিবাঞ্জন নেতা। গাছের কাট আউট বাঁ পাশে। তার তলায় বেদি। বাল্মীকি বসবেন। কাটআউটটা হয়েছে ভাল। তবে একটু নড়বড়ে। একটু দূরেই টিভির বাক্স। সীতা ঘাপটি মেরে থাকবে। তুলো দিয়ে ক্রৌঞ্চ তৈরি হয়েছে। প্যাকাটির তীর মারাই আছে। স্টেজের মাথায় কালো সুতো দিয়ে ঝোলানো। ঠিক সময়ে ধপাস করে পড়বে। পরদা ওঠামাত্রই দেখা যাবে, বাঁ দিকে বাল্মীকি। পেছনে হনেরবাবুর আঁকা সিন। বনের দৃশ্য। একটা নদী থাকলে ভাল হত। তমসা নদী। যাক, সেটা নেই। মাঝখানে ইঁদুরে খাওয়া একটা গর্ত। শিবাঞ্জন বলেছে ভালই হয়েছে। ওই ফুটো দিয়ে লাইট মারবে। সূর্যের কিরণ।

ওদিকে একটা ঘরে মেকআপ চলেছে। রাম আর সীতাকে নিয়ে তেমন

pathagar.net

সমস্যা হল না। সীতার ঠোঁটের ওপর সামান্য গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছিল। সকালে সেলুনে গিয়ে পোঁচ মেরে এসেছে। জীবনের প্রথম দাড়ি কামানো। স্যার খুব সহজেই বাল্মীকি হলেন বটে। সমস্যা একটাই হল, নকল দাড়ি, গোঁফ, চুলের জন্য মাঝে-মাঝে হাঁচি। সহপ্রধান বললেন, "মরেচে, এঁর তো উইগ অ্যালার্জি রে ভাই! তমসার তীরে বাল্মীকি যদি ফ্যাঁচফ্যাঁচ করে হাঁচেন তা হলেই তো হয়ে গেল! শিগগির অ্যান্টি অ্যালার্জিক ট্যাবলেট এনে খাওয়া।"

ননী দৌড়ল দোকানে।

বাংলার স্যার বললেন, "দাড়িটা তেমন প্রবলেম করছে না। ট্রাব্‌লসাম হল গোঁফটা।"

সহপ্রধান বললেন,"সময় থাকতে-থাকতেই হনুমানদের রেডি করে ফ্যালো। লেজ ফিট করে দাও, লেজ ফিট করে দাও।"

সার-সার হনুমান লাল কাপড় মালকোঁচা মেরে পরে দাঁড়িয়ে আছে। শিবাঞ্জন বাঁকা-বাঁকা, খাড়া-খাড়া, সোঁটা-সোঁটা লেজ ফিট করছে। এক-একজনের লেজ লাগানো যেই হয়ে যাচ্ছে সহপ্রধান বলছেন, "লাফাও, লাফাও। জাম্প, জাম্প।" এর আবার একটা গান তিনি কোথা থেকে পেয়েছেন কে জানে, "রথে চড়িকিড়ি যাঁউছি।"

মহা সমস্যা দেখা দিল রাবণের মাথা নিয়ে। একসারিতে দশটা পেপার পাল্পের মুণ্ডু। ভাবা গিয়েছিল, কানের তলা দিয়ে স্ট্র্যাপ ঘুরিয়ে বেঁধে দিলেই হয়ে যাবে। হিসেব মিলছে না।

শিবাঞ্জন বলছে, "স্যার এদিকে পাঁচ ওদিকে পাঁচ হচ্ছে না তো!"

"কেন হচ্ছে না! বাঁ দিকে পাঁচ, ডান দিকে পাঁচ, সোজা হিসেব।"

"হিসেব তো সোজা হবে ভেবেছিলুম। হচ্ছে না যে, মাঝখানে ওর ওরিজিন্যাল মুণ্ডুটাই তো প্রবলেম করেছে।"

"ওটাকে ফেলে দে না।"

"আসল মুণ্ডুটা ফলব কী করে! ওটা তো জন্মের সময় থেকেই ওইখানে সেন্টারে ফিক্‌সড হয়ে আছে। ও তো সরানো যাবে না।"

"তা হলে এক কাজ কর, ওটা যেমন আছে থাক। এপাশে পাঁচটা ওপাশে পাঁচটা ফিট করে দে।"

"তা হলে তো রাবণের এগারোটা মুণ্ডু হয়ে যাবে স্যার।"

"রাবণের মুণ্ডু ক'টা ছিল, শাস্ত্র কী বলছে! পণ্ডিতমশাইকে ডাক।"

"দশটা মাথা ছিল স্যার, দশানন।"

"তা হলে কি রাবণের কোনও মাথাই সেন্টারে ছিল না! একটা ছবি দ্যাখ না।"

"রাবণের ছবি কোথায় পাব স্যার!"

pathagar.net

"কেন, ক্যালেন্ডার!"

"রাবণের ক্যালেন্ডার হয় না স্যার। রামচন্দ্রের হয়।"

"ডাক ডেকে নিয়ে আয় অঙ্কের স্যারকে। এসব হিসেবের ব্যাপার।"

অঙ্কের স্যার এলেন, "কী সমস্যা!"

"খুব জটিল অঙ্ক। এই হল রাবণ। এই দেখুন সেন্টারে ওর জন্মগত মাথা। এইবার দেখুন ওইখানে দশটা নকল মাথা। সেন্টার থেকে আসল মাথা সরানো যাবে না। কিন্তু ওর দশটা মাথা করতে হবে। হিসেবটা কী হবে!"

"কেন? আসল মাথাটা রেখে ন'টা মাথা ফিট করে দিন।"

"তা হলে তো সমান হচ্ছে না। ধরুন এপাশে চারটে ওপাশে চারটে করলে, ন'টা হচ্ছে। দশটা হচ্ছে না। একপাশে পাঁচটা, আর-একপাশে চারটে হয়ে যাচ্ছে। একপাশে একটা মাথা বেরিয়ে থাকছে।"

অঙ্কের স্যার একটু ভেবে বললেন, "রাবণ দেখছি সারাটা জীবন জ্বালাবে। এপাশে চারটে ওপাশে চারটে ওই ন'টা মাথাই থাক না, কে আর গুনে দেখছে।" শিবাঞ্জন বলল, 'স্যার, একটা মাথা আমি রাবণের বুকে আটকে দিই।"

"আইডিয়া!" সহপ্রধান তুড়ি লাফ মারলেন, "এই ছেলেটা আইনস্টাইন হবে রে। হোয়াট এ মাথা! রাবণের দশটা মাথা এই একটা মাথার কাছে নাথিং।"

গান শেষ। দশ মিনিটের বিরতি। দর্শকদের আসনে লোক আর ধরে না। বাচ্চাদের ক্যাঁচম্যাঁচ। অঙ্কের স্যার একটা বেত হাতে, "অ্যায়, অ্যায়" করে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। মায়েরা এসেছেন ছেলেদের অভিনয় দেখতে। স্কুলের বাইরে গেটের দু'ধারে লম্ফ জ্বালানো ঘুগনি, আর কুপি জ্বালানো ফুচকা এসে গেছে। ঠ্যাং করে ঘণ্টা বাজল।

ঘিস-ঘিস করে পরদা সরে গেল দু'পাশে। শেষের দিকটায় আটকে গিয়েছিল। কে হাত দিয়ে টেনে সরিয়ে দিলে। তমালের তলায় বাল্মীকি। টেপে পাখির ডাক। পেছনের সিনের ফুটো দিয়ে নীল একটা আলো আসছে, যেন ভোর হচ্ছে। বাল্মীকি বসে আছেন আলো-আঁধারে। টিভির বাক্সে সীতা ঘাপটি মেরে আছে।

এই পর্যন্ত বেশ ছিল। হঠাৎ বাল্মীকি ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে একবার হাঁচলেন। সারের হাঁচি কখনও আস্তে হয় না। যেন বোমা ফাটল। এইবার হল কী, একটাতে খতম হল না। পরপর, সিরিজ। অন্তত গোটা দশ-বারো। সঙ্গে দর্শকদের চিৎকার, "বাল্মীকির ফ্লু হয়েছে, বাল্মীকির ফ্লু।"

অঙ্কের স্যার দাবড়ানি দিলেন, "মেরে সবক'টাকে বাইরে বের করে দেব।" সহপ্রধান উইংয়ের পাশেই ছিলেন। প্রম্পটার। তিনি বললেন, "নির্মলটা ডোবালে। আমাদের আগেই বলে দেওয়া উচিত ছিল, তমসায় চান করে বাল্মীকির সর্দি হয়েছে। সিনটা নষ্ট হওয়ার আগেই পরেশ তুই ক্রৌঞ্চের দড়িটা কেটে দে।"

পরেশ রেডিই ছিল। মারলে কাঁচি। এমনই বরাত, ক্রৌঞ্চ স্টেজের সামনে

pathagar.net

না পড়ে, পড়ল সীতার বাক্সে। সীতা এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। প্যাকাটির আচমকা খোঁচায়, "উরে বাব্বা রে" চিৎকার করে উঠল।

সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেরা চিৎকার করে উঠল, "কে আছিস ভেতরে বেরিয়ে পড়, বেড়িয়ে পড়।"

সীতা সটান উঠে দাঁড়াল। দু'হাতে ধরে আছে ন্যাকড়া আর তুলো দিয়ে তৈরি সেই বক। বকটাকে ফেলে দিলেই পারত, তা না করে ক্যাবলার মতো জিজ্ঞেস করল, "এটাকে কী করব স্যার!"

বাল্মীকি ভীষণ রেখে গিয়ে বললেন, "আমার শ্রাদ্ধ করবি গাধা।" সীতা বলল, "আমি কি আবার শুয়ে পড়ব স্যার!"

সহপ্রধান চিৎকার করলেন, "ড্রপ সিন, ড্রপ সিন।"

যার ওপর পরদা টানার দায়িত্ব ছিল, সে কেমন করে জানবে সিন এত তাড়াতাড়ি শেষ হবে। এদিকে বাল্মীকির আবার ফ্যাঁচাত-ফ্যাঁচাত শুরু হয়েছে। এর ওপর আর-এক কাণ্ড। শিবাঞ্জনের প্লাইউড কাটা তমালবৃক্ষ বাল্মীকির ঘাড়ের উপর দিয়ে সামনে শুয়ে পড়ল।

সবাই চিৎকার করে উঠলেন, "সমূলে উৎপাটিত, সমূলে উৎপাটিত। স্যারকে বাঁচা, স্যারকে বাঁচা।"

নির্মল-স্যার মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, তার ওপর শিবাঞ্জনের কেরামতি। হড়হড় করে পরদা নেমে এল। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের যবনিকা। সহপ্রধান দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন, "আর কী হবে! এই নাটক এইখানেই শেষ। রামায়ণ আর লিখবে কে, বাল্মীকিই তো হাসপাতালে চলে গেল।"

প্রধানশিক্ষক বললেন, "ঘাবড়াবার কিছু নেই, এই বাল্মীকি কাত হলেও আসল বাল্মীকি অনেক আগেই রামায়ণ লিখে রেখে গেছেন। এটা তো শেষ থেকে শুরু হচ্ছিল, এইবার শুরু থেকে শেষ হবে।"

যাই হোক, কিছুক্ষণের মধ্যে আবার শুরু হল নাটক। বাংলার স্যার এরই মধ্যে ফোটোগ্রাফারকে দিয়ে নিজের একটা ছবি তুলিয়ে নিলেন। তারপর দাড়ি, গোঁফ, চুল সব খুলে ফেলে গুম মেরে বসে রইলেন একপাশে।

হেডমাস্টারমশাই বলতে গেলেন, "একটু কেটেকুটে গেছে, ওষুধ লাগাবেন?" গম্ভীর গলায় বললেন, "ত্রেতাযুগে কোনও মেডিসিন ছিল না।"

"কিন্তু এটা তো কলি। পিঠে পেরেক ফুটে গেছে, টিটেনাস হলে কে দেখবে!"

"আমি এখন রামায়ণের যুগে আছি। সীতাটাকে আমি পরে পেটাব, কলিতে আগে ফিরে আসি।" আবার শুরু হল নাটক। বেশ ভালই এগোচ্ছে। প্রম্পট শুনতে না পেয়ে রাম একবার বলে ফেলেছিল, "কী বললেন স্যার?"

সহপ্রধান বললেন, "বলো, পিতা আপনার আদেশ শিরোধার্য।"

pathagar.net

রাম বলল, "বলো, পিতা আপনার আদেশ শিরোধার্য।"

সহপ্রধান বললেন, "গাধা।"

রাম বলল, "গাধা।"

এক্সপার্ট দশরথ, কায়দা করে জায়গাটা মেরামত করে দিলে, "বাবা, তুমি রাজার ছেলে, গাধা কেন, ঘোড়ায় চেপে যাবে, সাদা ঘোড়া।"

রাম সপরিবারে বনবাসে গেল। দেখতে-দেখতে এসে গেল সীতাহরণের দৃশ্য। রাবণ এসেছে। রাবণের এখন একটা মাথা। সন্ন্যাসীর বেশ। রাবণ বলছে, "ভগবতি! ভিক্ষাং দেহি!"

সীতা ভিক্ষে দেবে। গণ্ডির বাইরে আসবে না। তানা-নানা করছে সীতা। নাটকে সেইরকমই ছিল। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, রাবণ সীতার হাত ধরে মারল এক হ্যাঁচকা টান। সীতা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। এইবার রাবণ সীতার চুল ধরে হিড়হিড় করে টানতে-টানতে উইংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। রাবণ এই সুযোগটাই খুঁজছিল। সীতার সঙ্গে অনেকদিনের, অনেক ব্যাপারের ফয়সালা। পাছে পরচুল খুলে যায়, সীতা বোকার মতো দু'হাতে চুল চেপে ধরে আছে। হিন্দি ছবিতে ভিলেনকে যেমন গাড়ি বা ঘোড়ার পেছনে বেঁধে টানতে-টানতে নিয়ে যায়, রাবণ সীতাকে সেইভাবে নিয়ে যাচ্ছে। পাশেই পুষ্পকরথ। সেদিকে একবার ফিরেও তাকাল না।

উইংস দিয়ে স্টেজের পেছনে আসামাত্রই প্রধানশিক্ষক একেবারে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। রাবণের রাবণামি তিনি বরদাস্ত করবেন না। রাবণের রাবণত্ব তিনি শেষ করবেন। শেষ করবেন। মার মার, "হতভাগা! এই তোর সীতাহরণ!" রাবণের পরচুল ছিঁড়েখুড়ে চারপাশে ছত্রাকার। দাড়ি উপড়ে পড়ে একপাশে। রাবণ আর রাবণ রইল না। প্রসূন হয়ে গেল।

হঠাৎ রাম ছুটে এল, "এ কী করছেন স্যার! রাবণকে তো আমি বধ করব। তার আগে আপনিই যে বধ করে দিলেন!"

হেডমাস্টারমশাই বললেন, "নিজের বউকে সামলাতে পারিস না, তুই করবি রাবণবধ!"

লেজখাড়া হনুমানরা বলল, "আমরা হাত লাগাব স্যার!"

"কোনও প্রয়োজন নেই, আমি একাই তুলোধুনে দিচ্ছি।"

সহপ্রধান মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমাদের নাটক এইখানেই শেষ। আপনাদের চিন্তার কোনও কারণ নেই। স্টেজের পেছনে খুব সহজেই প্রধানশিক্ষকমশাই রাবণবধ করে দিয়েছেন। সীতাকে আমরা টিংচার আইডিন মাখিয়ে ফেলে রেখেছি। বাল্মীকি মনের দুঃখে বাড়ি চলে গেছেন। তাঁর প্রেশার এই মুহূর্তে একশো আশি, নব্বই। নমস্কার!"

ভটাভট হাততালি। হে-হে চিৎকার। আমাদের অনুষ্ঠান খতম।

pathagar.net

7 SEP 2005

Book No

হেডস্যারের সমাজসেবা

হেডমাস্টারমশাই আজকে তিনটের সময় স্কুলের নিউ হলে একটা মিটিং ডেকেছেন। আমাদের ক্লাস টেনের দশজন ছেলে সেই মিটিং-এ হাজির থাকবে। তার মধ্যে আমার নামও আছে। সকাল থেকে নিজেকে খুব ইম্পর্ট্যান্ট লাগছে। কথায় কথায় হ্যা-হ্যা করে হাসতে ইচ্ছে করছে না। বাবার দাড়ি কামাবার সেটটা দেখে ইচ্ছে করছে আমিও দাড়ি কামাই। দাড়িই নেই তো দাড়ি কামাব। আফটার শেভ লোশনের খানিকটা হাতে ঢেলে মুখে মাখলুম। আমার বোন রুমা দেখতে পেয়ে বলল, "ওইসব মাখছিস তো, দেখবি খোঁচা-খোঁচা দাড়ি বেরিয়ে যাবে। তখন বুঝবি ঠেলা। বড় হওয়ার জন্যে যেন আর তর সইছে না।"

কী বোকার মতো কথা বলে! মিনিটে-মিনিটে সবাই বড় হচ্ছি আমরা অটোমেটিক্যালি। লোশন মাখি আর না মাখি, দাড়ি আমার বেরোবেই। গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। গলার স্বরটা কেমন যেন একটু মোটা মোটা হয়েছে। চিৎকার করে যখন মা বলে ডাকি, আমার জামা কোথায়, তখন চমকে উঠি, এ কী রে ভাই! বাবার গলা না কী! —'হ্যাঁ গো, আমার ব্যাগটা কোথায় রাখলে!'

মা হওয়ার কী মজা। সকলের সব দায়িত্ব মায়ের। দাদু চিলেকোঠা থেকে হাঁক মারছেন, "বউমা, আমার চশমাটা কোথায় ফেলে দিলে! তোমার গোছানোর ঠেলায় আমি পাগল হয়ে যাব।" মুদিখানার জিনিস এসেছে, চেল্লাচ্ছে, "ফর্দ মিলিয়ে জিনিস বুঝে নিন।" জমাদার চিৎকার করছে, "মা, পয়সা দাও।" বোন বায়না ধরেছে, "মা, আমি আজ শাড়ি পরব।" এতসব ঝপ্পরঝাঁইয়ের মধ্যেও মায়ের মুখে সবসময় হাসি। মাকে আমার যে কী ভাল লাগে! পৃথিবীতে এমন মা আর হবেন না।

বাবা! থ্যাঙ্ক ইউ। এমন একজন মা উপহার দিয়েছ বলে তোমাকে থাউজেন্ড থ্যাঙ্কস।

কখন মা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন খেয়াল করিনি। কথা শুনে চমকে উঠেছি, "কী ব্যাপার! আজ এত সাজের ঘটা! স্কুলে যাচ্ছিস, না বিয়ে করতে যাচ্ছিস?"

মায়ের যেমন কথা! বিয়ে বললে কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা করে। আমি

pathagar.net

যখন বহুত বড় হয়ে যাব, তখনও আমি বিয়ে করব না। আমি তো এঞ্জিনিয়ার হব। ব্রিজ বানাবার এঞ্জিনিয়ার। বাইরে, দূর-দূর দেশে চাকরি করব। সেখানে আমার মাকে নিয়ে যাব। বিরাট কোয়ার্টার। চারপাশে বাগান। ফুলে-ফুলে ভরা। ওই তো একটু দূরেই আকাশের গায়ে নীল পাহাড়। সেখানে আবার একটা ঝরনা আছে। আমার একটা গাড়ি থাকবে। বিকেলে মাকে নিয়ে বেড়াতে যাব। মাকে সুখে রাখতে হবে, ভীষণ সুখে, তা না হলে আমি ছেলেই নই।

"জানো মা, আজ আমাদের মিটিং আছে। হেডমাস্টারমশাই আমাদের পনেরোজনকে স্পেশ্যাল মিটিং-এ ডেকেছেন। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। খুব সম্মান লাগছে।"

রুমা একটু ব্যঙ্গ করে বলল, "গাড়ি পাঠাবে তো, বিশেষ অতিথি সম্মানিত অতিথি!"

"শোন দিদি, আজ আমাকে টন্ট করছিস তো, কর, করে যা; তবে তোকে আমি বলে রাখছি, একদিন আমাকে নিতে গাড়ি আসবে। আসবেই আসবে। যেভাবেই হোক আমি ফেমাস হব। চ্যালেঞ্জ।"

আমাকে আমার যোগের মাস্টারমশাই বলেছেন, "শানু, থিঙ্ক টল, ইউ উইল বি টলার; থিঙ্ক গ্রেট, ইউ উইল বি গ্রেটার। থিঙ্ক স্ট্রং, ইউ উইল বি স্ট্রংগার। এই নে পড়, পড়ে দ্যাখ স্বামীজি কী বলছেন, "যদি জড়জগতে বড় হতে চাও, তবে বিশ্বাস করো তুমি বড়। আমি হয়তো একটি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ, তুমি হয়তো পর্বততুল্য উচ্চ তরঙ্গ, কিন্তু জানিও আমাদের উভয়েরই পিছনে অনন্ত সমুদ্র রহিয়াছে, অনন্ত ঈশ্বর আমাদের সকল শক্তি ও বীর্যের ভাণ্ডারস্বরূপ, আর আমরা উভয়েই সেখান হইতে যত ইচ্ছা শক্তি সংগ্রহ করিতে পারি। অতএব নিজের ওপর বিশ্বাস করো।" আমার এই গুরুর নাম সন্তোষ দেবদাস। কখনও পণ্ডিচেরিতে, কখনও কলকাতায় থাকেন। কত যে বয়স হল, আশি, একাশি, তবু কী শক্তি কী ভয়ঙ্কর মনের জোর! যে-কোনও পালোয়ানকে একটা থাপ্পড় কষালে কাত হয়ে যাবে। আমাকে বলেছেন, 'স্বামীজির এই কথাটার ওপর ধ্যান লাগাবি :

এই যে ক্রোশব্যাপী বৃহৎ বটবৃক্ষ, তাহা ওই সর্ষপ বীজের অষ্টমাংশের তুল্য ক্ষুদ্র বীজে ছিল—

ওই মহাশক্তিরাজি উহার ভিতরে নিহিত রহিয়াছে।'

দিদি! তোকে আমি সেই শক্তির খেলা দেখাব। আমি যখন বড় হব, আরও বড়, তখন তোর বিয়ে হয়ে যাবে। তোর শ্বশুরবাড়িতে আমি নিজে গাড়ি চালিয়ে যাব। কত মিষ্টি, সিল্কের কাপড়, সোনার ঘড়ি নিয়ে যাব। ছ'ফুট লম্বা, ইয়া মাস্‌ল, আটচল্লিশ বুকের ছাতি। একমাস ভারতবর্ষে থাকি তো তিনমাস ভারতের বাইরে। আমি রকেট এঞ্জিনিয়ার হব। হবই হব।

pathagar.net

অঙ্কটা আমার খুব ভালই আসে। ক্যালকুলেশান করে এমন একটা রকেট ছাড়ব, এইসব গ্রহনক্ষত্র পার হয়ে আর এক বিশ্বে চলে যাবে। কী খাতির আমার! প্রোফেসর শঙ্কুর মতো।

এইসব ভাবতে-ভাবতে স্কুলে। গিজগিজ করছে ছেলে। আমাদের স্কুলের ছাত্রসংখ্যা অনেক। স্কুলটার নাম আছে খুব। অনেক ভাল-ভাল ছাত্র এখান থেকে বেরিয়ে গেছে। নিউ হলের তিনটে দরজার একটামাত্র খোলা। ভেতরে মাস্টারমশাই ও ছাত্ররা। আমি একটু দেরি করে ফেলেছি। ভেরি ব্যাড। এমন হওয়া উচিত নয়। বাবা বলেছেন, 'এমনভাবে সময় রাখবে, যেন তোমাকে দেখে লোকে ঘড়ি মিলিয়ে নিতে পারে।' কী করব, ওই বিশুটার জন্য দেরি হয়ে গেল। 'কোথায় যাচ্ছিস শানু?' এই উত্তরটা দিতে গিয়েই হল কাল। স্কুলে গেলেও, ব্যাপারটা যে ক্লাস নয়, হেডমাস্টারমশাইয়ের স্পেশ্যাল মিটিং, সেটা না বললে তো মিথ্যে কথা বলা হবে। সেই শুরু হল,'কিসের মিটিং, কেন মিটিং, সেই মিটিং-এ তুই যাচ্ছিস কেন! মিটিং-এ কী খাওয়াবে!' বিশুটা মহা পেটুক। আধবালতি খিচুড়ি খেয়ে ফেলে। নেমন্তন্ন খেতে গেলে বড়রা ব্যাপারস্যাপার দেখে শেষমেশ কান ধরে টেনে তুলে দেন। বাইশটা কমলাভোগ খেয়ে আবার! বাড়ি গিয়ে জোয়ানের আরক খা। খাবারটা পরের, পেটটা তো তোর নিজের! আত্মহত্যা করার ইচ্ছে!

আমাদের হেডমাস্টারমশাইয়ের চেহারাটা একটু মোটার দিকেই। থলথলে। ওই যে কলেজে পড়ার সময় ওয়াই এম সি এ-তে কুস্তি করতেন, ভেবেছিলেন জাপানে গিয়ে সামুরাই হবেন, সেই হল কাল। চৌষট্টিটা ডিমের তাগড়া ওমলেট, এক কেজি বাদাম বেটে শরবত, পাঁচ সের দুধ, এক কেজি মালাই। শেষে দরজা-জানলা কাটার অবস্থা। কাঠের খাটে শুতে ভয় পেতেন। রিইনফোর্সড কংক্রিটের খাট তৈরি করিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের পাঞ্জাবিতে তিনগজ কাপড় লাগে। ওঁর লাগত ছ'গজ। সে ভালই, পর্বতের মতো চেহারা হওয়াটা কিছু খারাপ নয়। সমস্যা হল বাসে, ট্রামে ট্রেনে খুব অসুবিধে। ফাঁকা মাঠে মানিয়ে যায়। বাড়িতে বড্ড বড় দেখায়। আরও কত যে বড় হতে পারতেন তিনি নিজেও জানতেন না, একটা দুর্ঘটনায় সব বরবাদ।

গল্পটা আমাদের বলেছিলেন। সাধারণ মানুষের জীবনে অমন ঘটনা ঘটলে গল্পটা বলার জন্য বেঁচে থাকতেন না। এমারেল্ড সার্কাসে গিয়েছিলেন মাস্টারমশাই। মালিক খাতির করে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন সন্ধের শোতে। অতবড় একজন মানুষ! সব দিক থেকে বড়। লেখাপড়ায় ভীষণ ভাল। সবেতেই ফার্স্ট। একবার তাঁকে সেকেন্ড করেছিল। মাস্টারমশাই প্রতিবাদে অনশন শুরু করলেন। একদিন গেল, দু'দিন গেল। সকলের কত অনুরোধ! জীবন একবার না হয় সেকেন্ড হলে বিমান! তোমার জন্য কি কেউ কোনওদিন

pathagar.net

ফার্স্ট হতে পারবে না! এ তো তোমার ভারি অন্যায় গোঁ বাবা! শেষে অনশনের তৃতীয় দিনে হেডমাস্টারমশাইয়ের হেডমাস্টারমশাই ঘোষণা করলেন, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বিমানের খাতা রিএগজামিন করা হবে। খাতার বান্ডিল খুলে পরীক্ষা শুরু হল। সারা স্কুলবাড়ি থমথমে। কী হয়, কী হয়! এরই মাঝে বিমান কুঁই-কুঁই করে বলল, আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য নম্বর বাড়ানো চলবে না। সবাই বললেন, 'সে তোমাকে ভাবতে হবে না।' যে ফার্স্ট হয়েছে তার দলবল অলরেডি স্লোগান দিতে শুরু করেছে। বেলা তিনটের সময় হেডমাস্টারমশাই স্কুলের লনে নেমে এসে বললেন, 'দেয়ার ওয়াজ এ গ্রেট মিস্‌টেক। অঙ্কের খাতায় একটা নম্বর যোগ করতে ভুল হয়ে গিয়েছিল। ওভারসাইট। বিমানের দশটা নম্বর বেড়ে গেড়ে। ফলে বিমান শুধু ফার্স্ট হল না, রেকর্ড মার্ক্‌স পেয়ে ফার্স্ট। আমি রামাধরকে কমলালেবুর রস করে আনতে বলেছি। হলধর মালা আনতে চলে গেছে। বিমান আমাদের গর্ব আমাদের গৌরব, আমাদের সৌরভ।'

হঠাৎ স্কুলপ্রাঙ্গণে হইহই করে ঢুকে পড়ল বিশাল এক কীর্তনের দল। খোল, করতাল, উদ্দাম নৃত্য। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। বিমানস্যারের হেডমাস্টারমশাই অবাক, এ কী কাণ্ড! চিৎকার করে বললেন, 'আপনারা ভুল করছেন, এটা শ্মশান নয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। খঞ্জনি বাজাতে-বাজাতে দল থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলেন বিমানস্যারের বাবা। তিনি বৈষ্ণব বিনয়ে সামনে মাথা ঝুলিয়ে, জোড়হাতে বললেন, 'পুত্রের সাফল্যে প্রভুর নামগানই বিধেয়।'

এইসব গল্প স্কুলের মাস্টারমশাইদের মুখে-মুখে ফেরে। সব সময়েই কিছু বাড়ে কিছু কমে। এখন বাঘের কথায় ফেরা যাক। এমারেল্ড সার্কাস। স্যারকে খাতির করে সামনের ভি আই পি আসনে বসিয়েছেন মালিক। ট্রাপিজের খেলা, এক চাকা সাইকেলের খেলা হয়ে গেছে। এইবার বাঘ বেরিয়েছে। রিংমাস্টার টাঁই-টাঁই করে ইলেকট্রিক চাবুক মেঝেতে হাঁকড়াচ্ছেন। সামনে সাত-সাতটা কেঁদো বাঘ, কেউ টুলে, কেউ চেয়ারে, কেউ বেঞ্চে। চাবুকের শব্দে বিশ্রী দাঁত বের করে গর্‌র-গর্‌র শব্দ করছে। তাঁবুর সমস্ত দর্শক ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। সাতটা বাঘ, একটা লোক। বাঘেরা ইচ্ছে করলে নিমেষে কিমা করে দেবে। চাপা সুরে বিলিতি বাজনা বাজছে, ট্রাকটাক, ট্রারা ট্রারা। দুটো ক্লাউন সমানে রঙ্গরসিকতা করছে। খেলা বহুত জমেছে।

এমন সময় ঠিক মাঝখানের একটা বাঘ তুড়ুক করে বেঞ্চ থেকে লাফ মেরে নেমে পড়ল। তারপর থুপুক্‌-থুপুক্‌ করে স্টেজ পেরিয়ে লাফিয়ে পড়ল দর্শকদের সামনের সারিতে। এ টাইগার, বলে সামনের তিনটে সারির লোক একই সঙ্গে পালাতে গিয়ে পায়ে-পায়ে জড়িয়ে চিতপটাং। গ্যালারির সমস্ত দর্শক ততক্ষণে বাঘের বার্তা পেয়ে মারামারি, গুঁতোগুঁতি করে বেরোবার

Pathagar.net

দরজার দিকে গ্যালারি-ফ্যালারি ভেঙে ছুটছে। বিমানস্যারই কেবল একা স্থির হয়ে সামনের আসনে বসে আছেন। সেটা কোনও সাহসের কথা নয়, ভয়ে পাথর। বাঘ সামনের দিকে খানিক পায়চারি করে বিমানসারের দু'হাঁটুর মাঝখানে হাঁড়োল মতো মাথা ঢুকিয়ে কুতুকুতু আদর করতে লাগল। আদরের ঠেলায় তিনি চেয়ার থেকে উলটে ঘাসের ওপর পড়ে গেলেন। বাঘটা ইচ্ছে করলেই ডিনারটা সেরে নিতে পারত। তা কিন্তু করল না। বিমানস্যারের পাশে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। বিশাল একটা হাই তুলে স্যারের বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

সার্কাসের রিংমাস্টার আর অন্য কর্মচারীরা অবাক! কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। কুকুরের মতো ব্যবহার করলেও আসলে তো বাঘ। বিমানস্যার এই গল্পটা ছাত্রদের প্রায়ই বলেন। কতটা সত্যি, কতটা মিথ্যা সে বিচারের প্রয়োজন নেই। গল্পটা বলার জন্য তিনি যে বেঁচে আছেন এইটাই তো সত্যি। আমাদের মহান হেডমাস্টারমশাই। আসল বাঘ ব্যাঘ্রসম মানুষটিকে চিনতে পেরেছিল। ক্লাসে যখন হুঙ্কার ছাড়েন, অন্য শিক্ষকমশাইরা বলেন, 'রয়েল ওয়েস্টবেঙ্গল ইজ রোরিং।' তারপরেই সমস্বরে সুর করে গেয়ে ওঠেন, 'বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি।'

সেই বাঘ, সেই সন্ধ্যায় হেডমাস্টারের বুদ্ধি থমকে দিলেও এখন যে-অবস্থায় আছেন সেটাও কম কিছু নয়। জমিদার বাড়ির পিলারের মতো। ধুতি, পাঞ্জাবি পরে চেয়ারে বসে আছেন, একাই একশো। ছাত্র, শিক্ষক উভয়েরই প্রিয়। একবার হাসতে শুরু করলে সহসা থামেন না। বর্ষার আকাশে মেঘের গুরুগুরুর মতো।

শিক্ষকমশাইরা হেডমাস্টারকে মধ্যমণি করে একপাশে বসে আছেন। সামনে লম্বা টেবিল। এপাশে ছাত্রদের বসার জন্য দু'সার চেয়ার। জোড়হাতে শিক্ষকমশাইদের প্রণাম করে আমরা চেয়ারে সভ্য, সংযত হয়ে বসলুম। আমাদের স্কুলে এইসব নিয়ম খুব আছে। লাইন দিয়ে ক্লাসে ঢোকো, ছবির মতো বসে থাকো। লাইন দিয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাও। হইহল্লা, গুলতানি নট অ্যালাউড। বিদ্যালয়, বিদ্যার আলয়, মানুষ গড়ার মন্দির। প্রতিটি ইট পবিত্র। প্রতিটি ধূলিকণা তীর্থরেণু। আমার বিদ্যালয় বলতে বুক যেন গর্বে দশহাত হয়। চওড়া বুকে দু'হাত রেখে হেডমাস্টারমশাই যখন এইসব কথা বলতে থাকেন, তখন তাঁর দু'চোখে জল চিকচিক করে। আমাদের স্কুল একেবারে ঝকঝকে তকতকে। হেডস্যার বারবার বলেন, "পণ্ডিত অসভ্যের চেয়ে মূর্খ সভ্য অনেক ভাল। পড়াশোনা কিছু কম হলেও ক্ষতি কিছু নেই, এলোমেলো, বিশৃঙ্খল হলেই বিপদ। তিনি আমাদের কয়েকটা মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছেন।

pathagar.net

সকালে সূর্যোদয়কে দেখার চেষ্টা করবে।
মানুষের চোখের দিকে সরাসরি তাকাবে।
নতুন বন্ধু করবে ; কিন্তু পুরনোদের ভুলবে না।
গোপনীয়তা রাখতে শিখবে।
নিজের ভুল সব সময় স্বীকার করবে।
কাউকে ঠকাবে না।
শোনাবার চেয়ে শুনতে শেখো।
জিনিস চেয়ো না, চাও জ্ঞান আর সাহস।
সোজা হয়ে বসতে শেখো।
গালগল্পে সময় নষ্ট কোরো না।
নোংরা আর আবর্জনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করো।
'আমি জানি না', বলতে লজ্জা পেয়ো না।
'আমি দুঃখিত' এই কথাটি বলতে শেখো।

এর পর আর একটি কথা ইংরেজিতে শিখিয়েছেন, ভীষণ সুন্দর, Trust in God, But lock Your Car. কোথায় কোন দেশের কত বড় কলেজে অধ্যাপক হওয়ার কত আমন্ত্রণ এসেছে, কতবার, হেডস্যার নো করে দিয়েছেন। অসম্ভব ! আমি ছোটদের হাত ধরে বড় করব। কী হবে, বিলেতের কলেজে পড়িয়ে ! খুব খাতির বাড়বে আমার, ডলার, পাউন্ড, মোটরগাড়ি, ঠান্ডা, সুন্দর আবহাওয়া, ছবির মতো রাস্তা, পার্ক। কোনও প্রলোভনই আমাকে কাবু করতে পারবে না। আমার ময়লা টাকাই ভাল। নিজের ঘরের দেওয়ালে, কী সুন্দর লিখে রেখেছেন,

Hold your chield's hand every chance you get.
The time will come when he or she won't let you.

মাস্টারমশাইদের সামনের চেয়ারে বসে বেশ ভারিক্কি লাগছে। মনে হচ্ছে বেশ বড় হয়ে গেছি। হেডস্যার সকলের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, "তোমরা এসেছ, গ্রেট বয়েজ ! কীভাবে শুরু করা যায় সভার কার্যক্রম !"

সহপ্রধান বললেন, "ছোট্ট করে একটা ভূমিকা হোক আগে। ভূমিকা ছাড়া ভাল প্রবন্ধ হয় না।"

ইংরেজির স্যার বললেন, "দ্যাট্‌স ট্রু।"

হেডস্যার স্যার বললেন, "ভূমিকাটা কে করবে ?"

"আপনিই করবেন।"

"আপনারা তা হলে কী করবেন ?"

"আমরা শুনব।"

pathagar.net

"তা হলে শুনুন। মানুষ কী করে হয়?"

"একেবারে অতটা আগে চলে যাবেন! সেই অ্যামিবা থেকে হোমোস্যাপিয়েন অনেকটা পথ। কয়েক কোটি বছর।"

"আমি ওটা মিন করিনি। আমি বলতে চাই মানুষের কর্তব্য কী! লিভ ফর আদার্স। অন্যের জন্যে বাঁচা। বলো, জন্ম হইতেই আমরা মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত। আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমার আরাধ্য দেবতা স্বামীজির কথার একটি অনুচ্ছেদ উপস্থিত করছি। বসে-বসে হবে না, উঠে দাঁড়াই।"

হেডস্যার উঠে দাঁড়ালেন। চোখ বুজে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর অন্য মানুষ, "পরোপকারই জীবন, পরহিতচেষ্টার অভাবই মৃত্যু। জগতের অধিকাংশ নরপশু মৃত প্রেততুল্য : কারণ যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, সে মৃত, প্রেত বই আর কী? হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র অজ্ঞ ও অত্যাচার-নিপীড়িত জনগণের জন্য তোমাদের প্রাণ কাঁদুক, প্রাণ কাঁদিতে-কাঁদিতে হৃদয় রুদ্ধ হউক, মস্তিষ্ক ঘূর্ণ্যমান হউক, তোমাদের পাগল হইয়া যাইবার উপক্রম হউক। তখন গিয়া ভগবানের পাদপদ্মে তোমাদের অন্তরের বেদনা জানাও। তবেই তাঁহার নিকট হইতে শক্তি ও সাহায্য আসিবে — অদম্য উৎসাহ, অনন্ত শক্তি আসিবে।"

স্যার ধীরে-ধীরে চেয়ারে বসে পড়লেন। যেন ঘোর লেগে গেছে। সেই ঘোর আমাদেরও লেগেছে। জমাট, ভরাট কণ্ঠস্বর। গং সিম্ব্যাল, ঘণ্টা স্যাকসোফোন, সব যেন একসঙ্গে বাজছে। শুনেছি স্বামীজির গলায় এইরকমই ছিল। ঝঙ্কার।

সব স্যার একসঙ্গে বলে উঠলেন, "অনবদ্য, অনবদ্য। ভেরি ইন্‌স্পায়ারিং। সত্যি, কীভাবে আমরা জীবনটা কাটালুম! ঘেন্না করছে, ঘেন্না।"

সহপ্রধান সহসা উঠে দাঁড়ালেন। একবার ঢোক গিলে বললেন, "আমিও কিছু যোগ করতে চাই। স্বামীজি আমাতেও এসেছেন—তোরা ভাবছিস—আমরা শিক্ষিত। কী ছাই মাথামুণ্ডু শিখেছিস? কয়েকটি পরের কথা ভাষান্তরে মুখস্থ করে মাথার ভেতর পুরে পাস করে ভাবছিস— আমরা শিক্ষিত! ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! এর নাম আবার শিক্ষা! তোদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কী? হয় কেরানিগিরি, না হয় একটা দুষ্ট উকিল হওয়া, না হয় বড়জোর কেরানিগিরিই রূপান্তর একটা ডেপুটিগিরির চাকরি, এই তো? এতো তোদেরই বা কী হল, আর দেশেরই বা কী হল? একবার চোখ খুলে দ্যাখ..."

আমার পাশ থেকে বিমান সড়াত করে দাঁড়িয়ে উঠল। সহপ্রধানের মুখের কথা টেনে নিয়ে বলতে লাগল—

"স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের জন্য কী হাহাকারটা উঠেছে। তোদের ওই শিক্ষার সে অভাব পূর্ণ হবে কি? কখনও নয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর চাকরি-বাকরি করে নয়, নিজের

pathagar.net

চেষ্টায় পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান সহায়ে নিত্য নতুন পন্থা আবিষ্কার করে। ওই অন্নবস্ত্রের সংস্থান করবার জন্যেই আমি লোকগুলোকে রজোগুণতৎপর হতে উপদেশ দিই।"

প্রধানশিক্ষক টেবিলের ওধার থেকে দু'হাত সামনে প্রসারিত করে বলে উঠলেন, "বুকে আয়, বুকে আয়। তুই বিবেকানন্দ শুধু পড়িসনি। মুখস্থ করে বসে আছিস! অভাবনীয়, অভাবনীয়। আমাদের কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছে। এইবার আমরা আমাদের কাজের কথায় আসি। আমাদের পরিকল্পনা, মাস্টারপ্ল্যান। শুধু লেখাপড়া করলেই হবে না, সমাজের কাজে লাগতে হবে। সমাজের উন্নতি করতে হবে। আমি কালিয়া-পোলাও খাব, আর তুমি উপোস করে থাকবে, আমি কলার উলটে স্কুলে যাব, তুমি রাস্তার ধারে ধুলোয় লুটোপুটি খাবে, তা তো হতে পারে না! সকলকে সমান তালে এগোতে হবে। স্বামীজি বলছেন, 'দেশের ইতর সাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ।'

সহপ্রধানের ধৈর্যচ্যুতি হল। তিনি বললেন, "কাজের কথায় এলে হয় না!"

"যথেষ্ট হয়েছে। এইবার দয়া করে প্রোগ্রামে আসুন।"

"আমরা একটা গ্রামে যাব।"

"কোন গ্রামে?"

"সেটা ঠিক করতে হবে।"

E 1 SEP 2005

"সেখানে গিয়ে কী করব? পিকনিক?"

"কেন আপনি আমাকে ব্যঙ্গ করছেন, মোস্ট রেসপেকটেড স্যার?"

সহপ্রধান একটা ধাক্কা খেয়ে চুপ করে গেলেন। মানুষটি ভীষণ ভাল, তবে ওই, থেকে-থেকে দুষ্ট সরস্বতী মাথায় ভর করে।

প্রধানশিক্ষক ততক্ষণে বলতে শুরু করেছেন, "স্বাস্থ্য, শিক্ষা আর জীবিকা ও সংস্কৃতি, এই চারটে পিলারের ওপর মানুষের জীবনের ছাত ঢালাই করতে হবে। আপনারা সবাই জানেন, ঢালাই কীভাবে করতে হয়! প্রথমে লোহার খাঁচা তৈরি করতে হয়। তারপর পরিমাণমতো বালি, সিমেন্ট, স্টোন চিপ্‌স ও জল মিশিয়ে মসলা তৈরি করে ঢালতে হয়, তারপর পিটতে হয়। লক্ষ করুন, স্টোন নয় স্টোন চিপ্‌স। এই চিপ্‌স হল শিশু। লোহার খাঁচা হল চরিত্র, সিমেন্ট হল আদর্শ, বালি হল সমাজ, আর জল হল স্নেহ, ভালবাসা, প্রেম, আর পেটাই হল শিক্ষা।"

প্রধানশিক্ষক বাংলার শিক্ষক নির্মলবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এইবার আপনি ভাবসম্প্রসারণ করুন। ব্যাপারটিকে যথেষ্ট ফলাও ও বিস্তৃত করুন। আমি একটু বিশ্রাম করি।"

pathagar.net

নির্মলবাবু তৎপর মানুষ। তরতর করে পথ চলেন, তরতর করে কথা বলেন। তরতর করে পড়ান। তবে যা পড়ান, সে ভোলার নয়। মনে একেবারে কেটে-কেটে বসে যায়।

কোনওরকম ভণিতা না করেই বলতে লাগলেন, "অশিক্ষিত, নিরক্ষরকে অক্ষরজ্ঞান দিতে হবে। অ, আ, ই, ঈ, প্রভৃতি ইত্যাদি।"

অঙ্কের মাস্টারমশাই বললেন, "বাংলার এই এক দোষ। আন-ইকনমিক ইউজ অব ওয়ার্ড্স। অপ্রয়োজনে শব্দ ব্যবহার। প্রভৃতিই যদি বললেন তা হলে আবার ইত্যাদি কেন!"

নির্মলবাবু বললেন, "গাছে একটা পাতা থাকলেই হয়, অত পাতা কেন? কারণটা হল শোভা। ভাষা আর ভাববৃক্ষের শোভা হল কথা। অঙ্ক তো কৃপণের শাস্ত্র।"

কুমুদবাবু বললেন, "তা হলে বাড়ান, বাড়িয়ে যান, প্রভৃতি, ইত্যাদি, বিভিন্ন, বিবিধ, সমূহ, বাড়িয়ে যান, একেবারে লেজে-গোবরে করে দিন উদার চিত্তে, বদান্য হৃদয়ে।"

নির্মলবাবু বললেন, "আপনাদের সব ভাল, একটাই দোষ, ছোটখাটো ব্যাপারে নিজেদের জ্ঞান জাহির করা। আপনারা যদি এইরকম করতেই থাকেন, করতেই থাকেন এবং করতেই থাকেন তাহলে এই সভা পণ্ড হয়ে যাবে। অক্ষরপরিচয় বা বর্ণপরিচয়ে আমরা এক জীবন্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। জীবন্ত বর্ণপরিচয়।"

"অর্থাৎ যে শিখবে সে মাস্টারের হাতে মার খেয়ে মৃতপ্রায় হবে না, যেমন আগে পাঠশালায় হত।"

"মহাশয়, ধরেছেন ঠিক। সবাই হেসে-হেসে নেচে-নেচে, কথাকলির ঢঙে শিখবে অ-এ অজগর আসছে তেড়ে, আ-এ আমটি খাব পেড়ে। শিক্ষা আর সংস্কৃতিকে আমরা চটকে, যেমন আলুভাতের সঙ্গে পেঁয়াজ, যেমন চিঁড়ের সঙ্গে কলা, যেমন ছানার সঙ্গে চিনি, যেমন..."

"উপমার আর প্রয়োজন নেই, সম্যক বোধগম্য হয়েছে।"

নির্মলবাবু হাসলেন। তৃপ্তির হাসি। কেউ কিছু বুঝলে তিনি ভীষণ আনন্দ পান। আমরা ণত্ববিধান, ষত্ববিধান শিখতে পেরেছিলুম বলে, তিনি স্কুল কম্পাউন্ডের মেহগনি গাছের তলায় আধঘণ্টা নৃত্য করেছিলেন। 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে/তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ ॥' বলাইবাবু দোতলার জানলা থেকে প্রশ্নটা করলেন, "বুড়ো বয়সে এমন বানর নাচের কারণটা কী?"

"দুটো ন, আর তিনটে স-এর মুণ্ডপাত করেছি। পাষণ্ড পাষাণ তুমি, মুক্ত বৃষ, অকাল কুষ্মাণ্ড। মহিষ না মেষ তুমি? মূষিক? পুরুষ? নাকি ষণ্ড?"

pathagar.net

হেডস্যার বললেন, "এইবার আমি এক্সপ্লেন করি ; কারণ আইডিয়াটা আমার। এই যে আমার ছেলেরা, এরাই আমার জীবন্ত বর্ণপরিচয়ের বর্ণমালা।"

সঙ্গে-সঙ্গে সহপ্রধান বললেন, "ক্যাপিটাল লেটার, মানে ধেড়ে-ধেড়ে অক্ষর। বোল্ড টাইপ। ক্লাস টু, থ্রি-র ছেলেদের দিয়ে করালে ভাল করতেন মনে হয়। হয়তো অনধিকার চর্চা হয়ে গেল, তবু বলতে বাধ্য হলুম। কারণ আমি না বলে থাকতে পারি না। এটা আমার চরিত্রের দোষ বলতে পারেন, আবার একটা মহাগুণও বলতে পারেন। অ এগিয়ে আসছে, ঠোঁটে গোঁফের রেখা। অ, আ-র গোঁফ-দাড়ি বেরোতে পারে না, তারা সবসময় শিশু চিরশিশু।"

"আ,আ কোনওদিন সাবালক হবে না? প্রশ্ন করলেন অনন্তস্যার। ইতিহাস পড়ান।

"ইতিহাস তো মহাকাল, চিরবৃদ্ধ। ইতিহাসের তো শিশু নেই। জন্মাবেই একশো বছর বয়েস নিয়ে।" নির্মলবাবু বললেন, "ব্যাপারটা আপনাদের মাথাতেই ঢোকেনি। ভাল করে বোঝাই। ধরুন, যেই গানের সুরে বলা হল, অ-এ অজগর আসছে তেড়ে, অমনি একটা ছেলে অজগর সেজে তেড়ে আসবে। যেই বলবেন, আ-এ আমটি খাব পেড়ে, অমনই একটা আমগাছ হয়ে স্টেজে এসে দাঁড়াবে।"

কুমুদবাবু বললেন, "ইঁদুর ছানার বেলায় কী হবে? ধরুন শানু ইঁদুর হল। ওই তো ওর সাইজ! ইঁদুরের বাবা কেন, ইঁদুরের ঠাকুর্দারও অতবড় সাইজ হবে না।"

ড্রয়িং-এর টিচার বিমলবাবু বললেন, "পারস্পেকটিভটা জানা থাকলে এই প্রশ্ন হত না। মঞ্চে ইঁদুর, তার সাইজটা নেংটির মতো হলে পেছনের সারির দর্শক দেখতে পাবে পাবে কিছু! ছবি আঁকার জ্ঞান থাকলে এইসব বাজে প্রশ্ন আসত না, আমাদের সময়ও নষ্ট হত না। আমরা দূরে গেলে ছোট দেখি, কাছে এলে বড় দেখি। আমরা দূরের বাড়ি ছোট দেখি তার মানে এই নয় যে দূরের বাড়িটা সত্যিই ছোট। আর্টের ভাষায় একেই বলে পারস্পেকটিভ।"

"পরস্পরবিরোধী কথা বলে এই ভরদুপুরে মাথাগরম করে দেবেন না মশাই। দূরের বাড়ি, কাছের বাড়ি সবই এক সাইজ যেমন দূরের ইঁদুরে কাছের ইঁদুর দুটোই এক সাইজ। দূর থেকে দেখব বলে, দূরের ইঁদুরটাকে পাম্প করে বড় করে দেব? ইজ ইট পসিব্‌ল?"

"তা হলে দেখব কী করে? আচ্ছা মুশকিল তো!"

"কোনও মুশকিল নেই। দূরের ইঁদুর দেখা যায় না, আমরাও দেখব না।"

"তা হলে, ইঁদুর ছানা ভয়ে মরে হবে কী করে?"

pathagar.net

"তার আমি কী জানি ? দ্যাট্‌স ইয়োর প্রবলেম। ইঁদুর দেখা যাবে না বলে একটা হাতিকে ইঁদুর বলে চালাবেন। এইসব তঞ্চকতার মধ্যে আর যেই থাকুক, আমি নেই। অ, আ, ক, খ শেখাবার জন্যে এত কাণ্ড করার কী দরকার ! মশা মারতে কামান দাগা !"

"আপনি যদি বুঝতেই পারবেন তা হলে অঙ্কের টিচার হবেন কেন ? নীরস সংখ্যা ?"

ধুমধাড়াক্কা লেগে যায় আর কী ! হেডস্যার উঠে দাঁড়িয়ে জোড়হাতে বলতে লাগলেন, "ফোলডেড হ্যান্ড রিকোয়েস্ট ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল। নীরস অ-আ-কে একটু সরস করতে না পারলে গ্রামের ছেলেমেয়েরা পালাবে। সমাজে কতরকমের সর্বনেশে প্রলোভন। দিবারাত্র টিভি ভুটুর-ভুটুর, হিন্দি সিনেমা, বারোয়ারি, মেলা, আড্ডা, বাপ-মায়ের উদাসীনতা, এইসব থেকে ছেলেমেয়েদের বের করে আনতে হবে। মাছ ধরার কায়দা, চার করো, টোপ দাও, মারো টান। দেখেননি, করপোরেশন টিকে দেওয়ার আগে তারস্বরে সিনেমার গান বাজায়। আধুনিক যুগটাই অন্যরকম মাস্টারমশাই। আমাদের কাল কি আর আছে ! তবে ওই যে বলেছে, গতস্য শোচনা নাস্তি।"

ইতিহাসের স্যার অনন্তবাবুকে অনেকটা ইতিহাসের মতোই দেখতে। যেন একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ। সমস্ত চুল সাদা, অথচ বয়স খুব একটা বেশি নয়। পায়ে তালতলার চটি। ফাটাফাটা। মোটা ধুতি, হাফ হাতা বাংলা শার্ট, যা একালে কেউ পরে না। চোখে কালো ফ্রেমের পুরু লেন্‌সের চশমা। দেখলেই মনে হয়, চামড়া বাঁধাই একটা সচল ইতিহাসের বই। কেমব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া। লাইব্রেরি-শেল্‌ফ থেকে নেমে এসে স্কুলের করিডর ধরে হাঁটছেন। ইতিহাস বেড়াতে বেরিয়েছে বর্তমানের বাজারে। সবাই বলেন, মানুষটার নলেজ বটে ! লিভিং এনসাইক্লোপিডিয়া। স্রেফ সালটা একবার ধরিয়ে দাও, গড়গড়, গড়গড়। বাবর, আকবর, হুমায়ুন, জাহাঙ্গির যেন তাঁর চার ছেলে। ওই যে রে জাহিরুদ্দিন বাবর, মাত্র চার বছর ১৫২৬ থেকে ১৫৩০। আবার হুমায়ুন এল। ১৫৩০ থেকে ৫৬। এইবার শুরু হল আকবরের রাজত্বকাল। গ্রেট জালাল-উদ-দিন আকবর। ছেলেটা কী ভালই না ছিল ! এদিকে সময় এগোচ্ছে। যেন কালের কপোতাক্ষ ধরে নৌকা এগোচ্ছে। সময়ের ব্যবধানে-ব্যবধানে যাত্রী পালটাচ্ছে। এই আকবর তো, এই জাহাঙ্গির, তো শাহজাহান, ঔরঙ্গজেব।

সেই অনন্তস্যার, চেয়ারে শরীর শিথিল করে বিশাল একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। আমরাও শুনতে পেলুম সেই ফোঁস। তারপর উদাস গলায় বললেন, "স্যার ! সে আমাদের দিন গেছে। সেই সোনার শৈশব। গোল্ডেন বয়হুড ডেজ। কিস্যু ছিল না আমাদের। নো ঐশ্বর্য। কিন্তু কী আনন্দ ! একালের

pathagar.net

শিশুদের এরা যুক্তি করে মেরে দিল ! বুলডোজার চালিয়ে শৈশবটা থেঁতলে দিল। পরনে একটা দড়িবাঁধা ইজের। দেড় হাত লম্বা দড়ি সামনে পায়ের ফাঁকে পেন্ডুলামের মতো দুলছে। গায়ে মোটা কাপড়ের হাফহাতা জামা। ইস্তিরির বালাই নেই। কুঁচকে-মুচকে যেন কলসি থেকে বেরিয়েছে। বুকের বোতাম একটাও নেই। খোলা হাওয়াখানা। বুকে লটকে আছে ঢোলকের মতো একটা মাদুলি। তখন সব ছেলেরই আষ্টেপৃষ্ঠে মাদুলি বাঁধা হত। কত রকমের ফাঁড়া। জলে ডোবার, আগুনে পোড়ার, নজর লাগার। আমাদের কোনও লজ্জা ছিল না। পায়ে ফকফকে জুতো। বগলে খানসাতেক ছেঁড়া-ছেঁড়া বই আর বাড়িতে হাতে সেলাই করা খাতা। তখনকার কালে একধরনের শস্তার কাগজ তৈরি হত। লাল, বালি-বালি। ছেলে স্কুলে চলেছে। চান করেছে, চুল তখনও ভিজে। কানের পাশ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। বাড়ির পাশেই ইস্কুল, ঘণ্টার শব্দ শোনা যায়।

"আর এখন"— হেডস্যার খেই ধরলেন। "এখন উত্তরের ছেলে স্কুলবাসে দক্ষিণে যায় পড়তে। পাড়ার স্কুলে ছাত্র নেই। মাছি তাড়াচ্ছে। লেখাপড়ার চেয়ে এখন বড় হয়েছে স্কুল। নামী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ছেলেমেয়েকে যেভাবেই হোক ভর্তি করতে হবে। ফর্মের জন্য সাড়ে তিন মাইল লম্বা লাইন। একই সঙ্গে তিনজনের পরীক্ষা, বাবা, মা আর যে ভর্তি হবে। উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় বাপ-মায়ের চোখে ঘুম নেই। কী হবে ! চান্স পাবে তো ! না পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আচ্ছা মশাই বলতে পারেন, স্কুল পড়বে, না ছেলে পড়বে।"

কুমুদবাবু বললেন, "সেই কেস তো আমার বাড়িতে চলছে। নাতনিকে ভর্তি করবে। কলকাতার কাউকে আর ধরতে বাকি নেই। শুধু লাটসাহেবই বাকি। নাতিটাকে রোজ সাতসকালে তুলে টানতে-টানতে শহরের সেই আর-এক প্রান্তের এক মিশনারি স্কুলে নিয়ে যায়। সকাল হলেই আমার ভয় করে। নিত্য ফাটাফাটি, লাঠালাঠি। এই হল না, ওই হল না। মিস বলেছেন, "আপনার ছেলে ক্লাসে কিছু করে না, মুখ গোঁজ করে বসে থাকে। ভীষণ মুডি, লিখতে দিলে পেনসিল চিবোয়।"

অনন্তবাবু বললেন, "লিখবে কী ! আমাদের সময়ে ছিল একটা স্লেট, একটা পেনসিল। বাবা দেগে দিলেন, এ বি সি। বুলোও। একদিনেই জেড পর্যন্ত চলে গেলুম। বললেন, 'গুড'। মা হাতে ধরিয়ে দিলেন দুটো নারকোল নাড়ু। লাফাতে, লাফাতে মাঠে। চু, কিতকিত। আর এখন ? স্পেশ্যাল খাতা। ফুটকি, ফুটকি। কলে কাটা পেনসিল দিয়ে ফুটকি যোগ করো। বিন্দু-বিন্দু এ বি। আমাদের ছিল দু'টাকা মাইনের বাংলা স্কুল, এখন হয়েছে দু'শো টাকা মাইনের ইংরেজি স্কুল। ছেলেগুলোকে ধরে নিয়ে গিয়ে চড়চড়ে রোদে

PathagarNet

মাঠে বসিয়ে দিলে। কী হচ্ছে ম্যাডাম। নেচার স্টাডি। আকাশ দ্যাখো শহরের মরামরা, বিবর্ণ গাছ দ্যাখো। চড়াই পাখি দ্যাখো। এদিকে ছেলে বি লিখতে শিখল ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। সব অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। নাও ঠেলা। ছেলের মাকে বলতে গেলুম, 'ও তো সব উলটো শিখছে বউমা!' উত্তর হল, 'অক্ষর নিয়ে কথা, সে ডান থেকে বাঁয়ে আসুক, কি বাঁ থেকে ডানে। কিস্যু এসে যায় না।' মনে-মনে বললুম, 'খুব ভাল কথা, তোমার পাঁঠা তুমি বোঝো, আমার কাঁচকলা। আমরা সব ওল্ড ফুল।' নিজের ছেলেকে বলতে গেলুম বলল, 'মাথা ঘামাবেন না, শান্তিতে থাকুন।"

হেডস্যার বললেন, "কাজের কথায় আসা যাক, অনেক বাজে কথা হয়ে গেল। আমরা একটা গ্রাম বেছেছি, নাম হল হাটখোলা।"

অনন্তবাবুর সঙ্গে-সঙ্গে প্রশ্ন, "এত গ্রাম থাকতে হাটখোলা কেন?"

"দুটো কারণ। প্রথম কারণ, গ্রামটা ব্যাকওয়ার্ড। দ্বিতীয় কারণ, ওখানকার স্কুলের প্রধানশিক্ষক আমার পরিচিত। ওই স্কুল কম্পাউন্ডে আমাদের ক্যাম্প হবে।"

কুমুদবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাটা কেমন আছে! স্বামীজি তো বলেই গেছেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না। মাছ, মাংস ডিম্বাদির ব্যবস্থা আছে কি! শুদ্ধ, বিশুদ্ধ, প্রোটিন।"

আমরা জানি হেডস্যারও খেতে ভালোবাসেন। আমাদের বাড়িতে কী একটা অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। তিনি আসায় আমাদের খুব আনন্দ হয়েছিল। প্রাণ খুলে খেয়েছিলেন। ফিশফ্রাই খেয়ে ফেলেছিলেন সাতটা। আটটাই খেতেন। চিংড়ির মালাইকারির জন্য একটু জায়গা রাখতে হল।

হেডস্যার খুব উৎসাহিত হয়ে বললেন, "অবশ্যই অবশ্যই! স্বামীজি একেবারে সেন্ট-পারসেন্ট কারেক্ট! পেটে আগুন জ্বললে আর কোনও কিছু করা যায় না। মনটা পেটের দিকেই পড়ে থাকে। ওখানে অঢেল খাওয়া। সকাল আমরা শুরু করব মুড়ি আর নারকেল দিয়ে। সঙ্গে গরম-গরম আলুর চপ, বেগুনি। টাটকা, সবুজ কাঁচালঙ্কা।"

"কাঁচালঙ্কা তো শুনেছি লাল হয় মশাই। অবশ্য ভাল করে দেখিনি কোনওদিন।"

"আমিও দেখিনি। রংটা আনইমপর্ট্যান্ট। ইমপর্ট্যান্ট হল ঝাল আর গন্ধ। সঙ্গে থাকবে ছাঁচি পেঁয়াজ। আদা কুচি। চা তো থাকবেই, তবে চায়ের দিকটা একটু উইক হবেই। দুপুরে থাকবে ভাত, ডাল, তরকারি আর রকম-রকম মাছ। ওখানে তো পুকুরের অভাব নেই। জাল ফেললেই এক জাল খলবলে মাছ। ঘরে পাতা খাঁটি দুধের দই। মিষ্টান্ন। খেয়ে উঠতে না উঠতেই ডাবের মিষ্টি জল। এর পর বিশ্রাম। পাঁচটার সময় চা, সঙ্গে কিছু স্ন্যাক্স। রাতে

pathagar.net

গরম লুচি, ছোলার ডাল, মাছের কালিয়া। শয়নের প্রাক-মুহূর্তে এক গেলাস করে খাঁটি দুধ।"

কুমুদবাবু বললেন, "এইরকমটা যদি ঠিক-ঠিক হয়, আমার আর কিছু বলার নেই।"

অনন্তবাবু বললেন, "সমাজসেবাটা তা হলে কখন হবে?"

"ওই ওরই ফাঁকে-ফাঁকে হবে। আমাদের এইসব সোনারচাঁদ ছেলেরা আছে। হও ধর্মেতে ধীর, হও কর্মেতে বীর, হও উন্নত শির, সাথে আছে ভগবান, নাহি ভয়।"

"কিন্তু মশাই, সমাজসেবার খরচটা আসবে কোথা থেকে! আমাদের স্কুলফান্ডের অবস্থা তো তেমন সুবিধের নয়!"

"আরে মশাই, সে-কথাটা কি আমি ভাবিনি! এখন তো স্পনসরের যুগ। ক্রিকেট, স্পনসরার। টিভিতে আপনারা কি প্রায়ই দেখেন না, যে কোনও অনুষ্ঠান হতে-হতে, হেঁচকি তুলে থমকে গেল, দিস পার্ট অব দি প্রোগ্রাম ইজ স্পনসরড বাই, বেড়বেড় করে পাঁচটা কোম্পানির নাম বলে গেল। কলেজে ফেস্ট হবে, দশটা কোম্পানি তেড়ে এল। গানের স্পনসর একজন, ডিবেট আর একজন। আমাদের এই প্রোগামটা স্পনসর করছে একটা আচার কোম্পানি। তারাই একটা বড় বাস দেবে। আমরা আমাদের এই বাহিনী নিয়ে উঠব। সঙ্গে ঝুড়ি, কোদাল। গামবুট, মশা মারা তেল। ওষুধ-বিষুধ। আমাদেরই প্রাক্তন ছাত্র, ডাক্তার অমিতাভ। আর-এক প্রাক্তন ছাত্র যোগীরাজ তপন। বাসটার গায়ে লেখা থাকবে স্পনসরারের নাম। একটা মিউজিক সিস্টেম থাকবে। থেকে-থেকে গান বাজবে আর ঘোষণা আচার খাও আচার। জ্যাম খ্যাও, জেলি খাও, নিজে খাও, অন্যকে খাওয়াও। মিষ্টি আচার, টক ঝাল, মোরব্বা।"

21 SEP 2003

"যোগীরাজ কী করবে!"

"যোগ শেখাবে। যোগ এখন খুব চলছে! শরীরম আদ্যম খলু ধর্মসাধনম। স্বামীজি বলেছেন, হেল্‌দি মাইন্ড ইন এ হেল্‌দি বডি। শরীর তাগড়া না হলে, এম এ, বি এ টাকা-পয়সা, গাড়ি-বাড়ি কিছুই কিছু নয়। যোগের জন্যে ভোগ, ভোগের জন্যে যোগ। একে বলে সাঁড়াশি আক্রমণ। গ্রামের মানুষকে আমরা এমনভাবে ধরব, পালাবার পথ পাবে না। আমাদের সঙ্গে একটা হারমোনিয়াম থাকবে আর আমাদের সুমন আছে। আমরা গানও শেখাব, সা রে গা মা।"

"সারেগামাটা তো গান নয়, গলা সাধা!"

"না সাধলে গান হয়! আমরা সুরের ছ্যাঁকাটা দিয়ে আসব। দিনান্তে আমরা যখন ফিরে আসব পেছনে ফেলে আসব শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতিতে জাগ্রত একটি গ্রাম। সা রে গা, অ আ ই, বলো বীর, বলো উন্নত মম

pathagar.net

শির। টলটলে দিঘি, ঝকঝকে পথ, চকচকে শরীর মন। এমনই করে গ্রাম, গ্রাম থেকে জেলা, জেলা থেকে শহর,আমাদের কর্মযজ্ঞ ছড়িয়ে পড়বে। এই হবে আমাদের তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। একের পর এক গ্রাম, একের পর এক শহরের পতন। উড়বে আমাদের বিজয়কেতন।"

"বেশ, তবে তাই হোক।" একবাক্যে সবাই বললেন।

হেডস্যার আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমরা প্রতিভা অনুসারে গ্রুপে ভাগ হয়ে যাও। একভাগ তৈরি করো অ আ -নৃত্য। অ-এ অজগর আসছে তেড়ে। একটা কাগজের অজগর তৈরি করো। আ-এ আমটি খাব পেড়ে। একটা আমগাছ পিসবোর্ড কেটে, ডালে-ডালে আম তৈরি করে ফ্যালো। ইঁদুরছানা চাই। ঈগল পাখি চাই। উ-এর উট চাই। যার গান জানো, তারা একটু সুর চড়াও, অ-এ অজগর আসছে তেড়ে, আ-এ আমটি আমি খাব পেড়ে। এই গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশের মতো বর্ণমালার নৃত্য চলবে সারা স্টেজে।"

বিমাল বলল, "স্যার! একটু ফাইট সিন কি থাকবে?"

"ফাইট?"

"মানে মারামারি স্যার।"

"কে কার সঙ্গে মারামারি করবে?"

"কেন স্যার, অ-কে ধরে পেটালেই আ-বলে শুয়ে পড়বে। তখন ই তো মহিলা, পাশে এসে বসে ঈ দিয়ে ঈশ, ঈশ করবে। উ উট হয়ে ঊকে পিঠে চাপিয়ে ঋ-এর ঋষিমশাইকে ডাকতে ছুটবে। গিয়ে দেখবে তিনি ৯-কার হয়ে সাধনা করছেন। এই ৯-কার হবেন যোগীরাজ তপনদা। বিপরীত সলভাসন করলেই ৯-কার। তিনি সব শুনে ও বলে উঠে দাঁড়াবেন, তারপর ঔ-এর ঔষধ নিয়ে ছুটে আসবেন। আ সুস্থ হবে, সঙ্গে-সঙ্গে এ আর ঐ শুরু করবে ব্রেক ডান্স। সবশেষে স্টেজ জুড়ে বর্ণমালার নৃত্য। হইহই ব্যাপার, সঙ্গে মুকুলের গান—লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে।"

হেডস্যার অভিভূত হয়ে বললেন, "ছেলেটার মাথা আছে। চেয়ারে বসে-বসে কেমন একটা আধুনিক নাটক লিখে ফেলল। সংঘাত-সংঘর্ষ, অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্যাথস। একেই বলে প্রতিভা!"

অঙ্কের স্যার কুমুদবাবু বললেন, "প্রতিভাটা লিক করে যাচ্ছে স্যার! এবার অঙ্কে পাঁচ নম্বর গ্রেস গুঁজে পাস করাতে হয়েছে। ডিস্‌গ্রেসফুল গ্রেস। বাজারে দেখা হল, ওর বাবা বললেন, "মাস্টারমশাই, ছেলেটা আমার বখে গেল, তিন খাতা কবিতা লিখেছে। এদিকে দুই আর দুয়ে চার জানে না।"

"আরে মশাই! সবাই কি আর অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়, দু-একটা শেক্সপিয়রও হয়ে যায়। এসব ঈশ্বরের খেলা। অনন্তরূপিণী শ্যামা, অন্ত তবু কেবা পায়। বলে দিলুম, এই ছেলে আমাদের মুখে উজ্জ্বল করবে। ইতিহাসে ওর নাম

pathagar.net

লেখা থাকবে। বিশ্বকোষে ও অমর হয়ে থাকবে। দিস ইজ মাই ফোরকাস্ট।"

সভা শেষ। ভেবেছিলুম, ভাল-মন্দ কিছু খাওয়া জুটবে। ঘোড়ার ডিম, কিছুই জুটল না। বেশ ভারিক্কি চালে আমরা বেরিয়ে এলুম হল থেকে। হঠাৎ যেন বয়েস বেড়ে গেছে। কত বড় একটা দায়িত্ব ঘাড়ে! অজগর তৈরি করতে হবে। চিনে নববর্ষের দিনে যে কায়দায় ড্রাগন তৈরি করেন ওঁরা, সেই কায়দায় অজগর হবে। ভেতরে তিনটে ছেলে ঢুকবে। তারাই জিনিসটাকে চালাবে হিজিরবিজির করে। মস্ত একটা ঈগল তৈরি হবে। দুটো ডানায় কায়দা করে কব্জা লাগানো হবে। দড়ি ধরে টানলেই ডানা ঝটপট করবে। এইসব হাতের কাজে তারাপদর খুব প্রতিভা। যখন ট্যাংরায় ছিল, তখন এক চিনা পরিবারের সঙ্গে তার খুব আলাপ হয়েছিল। সেইখান থেকে চিনে রান্না, চিনে হাতের কাজ খুব শিখেছে। চিনে পটকা তৈরি করতে পারে। কাগজের শিকলি, লণ্ঠন। আমরা সবাই বলি, তারাপদ দ্য গ্রেট।

আমরা অবিনাশের দোকানে জিলিপি খেতে ঢুকলুম। বিখ্যাত জিলিপি। দেশ-বিদেশের মানুষ খেতে আসেন গাড়ি চেপে। অনেকদিনের দোকান। শুধু জিলিপিই তৈরি হয়। বিশাল কড়ায় রস পাক হচ্ছে। হাত ঘোরানোর কায়দায় জিলিপির বৃত্ত তৈরি হচ্ছে।

জিলিপি খেতে-খেতে তারাপদ বলল, 'অ্যায়সা অজগর বানাব লোকে ভয়ে পালাবে। আমাদের কাজ মিটে যাওয়ার পর মিউজিয়ামে রাখা হবে। ইঁদুরের পেটে স্প্রিং ভরে দেব, চিঁক চিঁক করে লাফাবে। ঈগল পাখি শুধু ডানা নয়, ঠোঁটও নাড়বে। ঠকাস-ঠকাস শব্দ হবে।"

মুকুল বলল, "আবহ সঙ্গীত এমন করব, দর্শকের আসনে বসে লোক ধিতিং-ধিতিং নাচবে। হও কর্মেতে বীর, হত ধর্মেতে ধীর, সঙ্গে ঢোল বাজবে, কাড়ানাকাড়া বাজবে। লোকের মুখে-মুখে ঘুরবে হিট হিন্দি গানের মতো।"

আলোচনা করতে-করতে আমরা একেবারে জিলিপির মতো হয়ে গেলুম। ঠাসা রসের বাঁধুনিতে ঘুরপাক। আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ভেবে থম মেরে বসে রইলুম। আমরা সবাই কর্মবীর হতে চলেছি। স্বামীজির কত কথা মনে আসছে। দার্জিলিঙের মেঘের মতো ভেসে-ভেসে মনের ঘরে আসছে, আর সব ভাসিয়ে ভিজিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। চারটে লাইন তেড়ে বেরিয়ে এল:

ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মনপ্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

pathagar.net

বিমান বীরের ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হে ভারত, ভুলিও না—

তোমার সমাজ যে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র ; ভুলিও না— নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।"

আমাদের অমন করতে দেখে অবিনাশদা একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, "তোমাদের কী হল ভাই ! আজ তোমরা এত উত্তেজিত কেন ? কোনও নাটক-টাটক হবে বুঝি !"

"না গো, আমরা কোমর বেঁধে দেশের কাজে নেমে পড়ছি।"

"তার মানে পার্টি করছ ! বোমা, পেটো, পটকা, পাইপ, রামপুরিয়া, ভোজালি, ডাণ্ডা, চেন। যাক, লেখাপড়ার বারোটা। ভালই পথ ধরেছ। এবার আর দেখে কে ? সপ্তাহে একটা করে লাশ ফেল। কলকারখানা বন্ধ করে দেশে বেকার বাড়াও। বর্গি এল দেশে, বুলবুলিতে...।"

আজ আমাদের হাটখোলা যাত্রা। স্পনসরারের দেওয়া বাস এসে গেছে। মাথার ওপর বিশাল একটা জ্যামের 'জার' বসানো। পাশে তেরছা হয়ে আছে বিশাল একটা চামচের হাতল। মনে হয় অ্যালুমিনিয়ম দিয়ে তৈরি। রঙের কী বাহার ! ওটা আবার স্পিকার। আচারের গান ছাড়ে থেকে-থেকে। বাসের গায়ে হরেক ছবি আঁকা। ছোটদের লাল টকটকে আচার খাওয়া মুখ, হুস্, হাস্, ঈশ, কী মজা ! টক টক, ঝাল ঝাল, মিষ্টি মিষ্টি।

একপাশে লেখা, সকালের ব্রেকফাস্টে আমাদের জ্যাম, জেলি না থাকলে সকলেই তাঁদের রুটি ছুড়ে ফেলে দেন। সকালের সুর কেটে যায়। এক জায়গায় লেখা আছে, আমাদের চাটনির স্বাদ পরের জন্মেও মনে থাকে।

বাসের সামনে এঞ্জিনের কাছে আমাদের স্কুলের নাম লেখা ব্যানার ঝুলছে। এটা আবার স্পনসর করেছে আমাদের পাড়ার চানাচুর কোম্পানি। মুখরোচক, সুস্বাদু, মুঠো-মুঠো খাও, আনন্দে যাও। ব্যানারে আমাদের স্কুলের নামের তলায় লেখা আছে ; সেবা প্রকল্প। জীবে দয়া করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। তার তলায় লেখা, অপারেশন ইল্যুমিনেশন।

একে-একে আমাদের জিনিসপত্র সব উঠছে। ঝুড়ি, কোদাল, নারকোল দড়ি, কাটারি। তারাপদর চিনে কায়দায় তৈরি বিরাট অজগর। ফোল্ড করা যায়, এই একটা সুবিধে। বিকট ঈগলটাকে বাসের ছাতে ফিট করা হয়েছে। আমগাছকে নিয়ে সামান্য সমস্যা হয়েছিল। হেডস্যার বললেন, "তারাপদর উচিত ছিল বনসাই করে দেওয়া। যাই হোক, পার্ট বাই পার্ট খুলে গাছটাকে বাসের ছাতেই তোলা হল। একটা কাঠের বাক্সে ছোটখাটো সব জিনিস। সমস্যা হল উটটাকে নিয়ে। অত বড় একটা জন্তু ঢোকে কী করে থার্মোকল

pathagar.net

দিয়ে তৈরি। খুবই হালকা ; কিন্তু আকৃতিতে মস্ত বড়। হেডস্যার বললেন, "দেখা যাচ্ছে, একটা জ্যান্ত উট ভাড়া করলে সমস্যা মিটে যেত। উটটা হেঁটে-হেঁটেই হাটখোলা চলে যেত। পিঠে কিছু জিনিসও নিতে পারত।"

শেষে উট বাতিল হয়ে গেল। নিউ হলের দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাজস্থানের কথা ভাবতে লাগল। ড্রয়িং-এর স্যার বিমলবাবু বললেন, "তারাপদর একটাই দোষ, কারও সঙ্গে কোনও কিছু কনসাল্ট করার প্রয়োজন বোধ করে না। সব নিজে করব, সব নিজে করব। পুরো ক্রেডিটটা নিজে নেবে। ওই করে মারাদোনা মরল।"

হেডস্যার বললেন, "কথাটা কোন অর্থে বললেন। আপনাকে কনসাল্ট করলে কী হত! উট তো আর ইঁদুর হত না! উট উটই হবে।"

"অমন উষ্ণ কণ্ঠে কথা বলছেন কেন স্যার! আগে শুনুন আমি কী বলছি! আমি হলে বিশাল একটা ক্যানভাসে উট আঁকতুম। তারপর সেটাকে রোল করে নিয়ে যেতুম যথাস্থানে। সেখানে গিয়ে দেওয়ালে স্ট্রেচ করে দিতুম। উট চলছে মুখটি তুলে।"

হেডস্যার অভিভূত হয়ে বললেন, "হোয়াট এ মাথা! এই কারণেই আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি মশাই! মানুষের মাথাটাই সব। এ ম্যান উইদাউট হিজ হেড ইজ নো ম্যান। তারাপদ নিজের গোঁয়াতুমিতে আমাদের উটটা শেষ করে দিল।"

বিমলবাবু বললেন, "কিচ্ছু ভাববেন না স্যার। আমি আছি।"

"আপনি থাকলে কী হবে! আপনি তো উট নন।"

"আমার হাত আছে, চক আছে, ব্ল্যাকবোর্ড আছে। ঝড়াকসে একটানে উট।"

"স্প্লেনডিড্, স্প্লেনডিড। একজন প্রকৃত যোদ্ধা আপনি। আপনার তুলনা আমি নই, তিনি নন, আপনার তুলনা আপনিই।"

অনেকক্ষণ ধরে আমাদের গেম-টিচার বিকাশবাবু কিছু একটা বলতে চাইছিলেন, এইবার সুযোগ পেলেন, "মশাই! আপনার ওই কথাটা তো বুঝলুম না। ঝপ করে বলে দিলেন! আপনার সাবজেক্টও নয়।"

"কোনটা, কোনটা!"

"ওই যে মারাদোনা মরল।"

"ভুল কী বলেছি? অ্যাঁ, ভুল কী বলেছি? নিজেই ড্রিব্‌ল করব, নিজেই গোল করব, নিজেই সব ক্রেডিট নেব, কাউকে পাস দেব না।"

"আপনি মশাই মারাদোনার মা-ও জানেন না। কোনওদিন সেই বিশ্ববরেণ্য খেলোয়াড়ের খেলা দেখেননি।"

"তার মানে?"

pathagar.net

"মানে-টানে জানি না। আপনি অজ্ঞ।"

"আর আপনি খুব বিজ্ঞ।"

ধুমধাড়াক্কা লেগে যায় আর কী! হেডস্যার কোনওরকমে মিটমাট করে দিয়ে বললেন, "একটা কথা সবসময় আপনারা মনে রাখবেন, ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল। কোথায় মারাদোনা, কোথায় আমরা! চলুন, দুর্গা, বলে বেরিয়ে পড়া যাক। ঘড়ি দ্যাখ, ঘড়ি দ্যাখ। সাড়ে সাত। বাস ছেড়ে দিল। আমরা কোরাসে গেয়ে উঠলুম, আমাদের যাত্রা হল শুরু, এখন ওগো কর্ণধার। তোমারে করি নমস্কার। এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না কো আর—। তোমারে করি নমস্কার।"

বাসটা অকারণে ভাঁ-ভাঁ করে কয়েকবার হর্ন দিল। বেজে উঠল জ্যামজেলির গান। জ্যাম খাও, জেলি খাও, জেলি দিয়ে রুটি খাও, রুটি দিয়ে জ্যাম খাও। রাস্তায় গাড়ির জ্যাম, ঘরে-ঘরে আমাদের জ্যাম। জ্যাম লাগাও, জ্যাম লাগাও।

হেডস্যার, ভুরু কুঁচকে বললেন, "এটা কী ধরনের অসভ্যতা! হোয়াট ইজ দিস! সারাটা রাস্তা যদি এই হয়, সবাই ভাববে আচার কোম্পানি চলেছে।"

ইতিহাসের স্যার অনন্তবাবু বললেন, "এর জন্যে দায়ী তো আপনিই। আমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই সব করে ফেললেন!"

"আরে মশাই, পয়সাটা আসবে কোথা থেকে! ইস্কুল ফান্ড তো ভাঁড়ে মা ভবানী। স্পনসরার ছাড়া হত এত বড় একটা কাজ!"

"লাউড স্পনসরার না ধরে আপনি সাইলেন্ট স্পনসরার ধরতে পারতেন!"

"কথার কোনও মাথামুণ্ডু নেই, সাইলেন্ট হাঁস, সাইলেন্ট মুরগি, সাইলেন্ট কোলা ব্যাঙ হয়। সাইলেন্ট কামান হয়!"

"তা হলে মরুন। স্বখাত সলিলে ডুবে মরুন। সারাটা পথ জানলা দিয়ে জ্যাম, জেলি, আচার, চাটনি বিক্রি করতে-করতে চলুন। জ্যাম লাগাও, জ্যাম লাগাও। পারলে ছাতে উঠে নৃত্য করুন।"

কুমুদবাবু বললেন, "অকারণে অর্থ খরচের মতো, অকারণে কথা খরচও গর্হিত কাজ। যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। দাঁড়ান ইংরেজিতে বলি, থিংস ডান ক্যান নট বি আনডান।"

বাংলার স্যার নির্মলবাবু বললেন, "ছেলেদের ডেকে এইবার বলুন, এটার ভাব সম্প্রসারণ করতে। পঁচিশ নম্বর।"

বাসের ভেতর থেকে হঠাৎ একজন বেরিয়ে এলেন। কোথায় ঘাপটি মেরে এতক্ষণ বসে ছিলেন কে জানে! বিচিত্র তাঁর পোশাক। চিত্র-বিচিত্র ঝলমলে। জ্যাম, জেলি, চাটনির বোতল আঁকা নানা রঙে। ফাঁকে-ফাঁকে মানুষের মুখ।

pathagar.net

হাসি-হাসি মুখ, হাঁ-করা মুখ। পিঠের দিকে দু'হাতে দুটো চামচে ধরে একজন মানুষের ঊর্ধ্ববাহু নৃত্য।"

লোকটিকে বিরক্তির চোখে দেখতে-দেখতে হেডস্যার প্রশ্ন করলেন, "এই অবতারটি কে ? এ তো আমাদের কেউ নয়। কোথা থেকে এর আবির্ভাব ?"

"স্যার, আমি কোম্পানির লোক। আপনাদের প্রত্যেকের ডান হাতের ওপর দিকে একটা করে আর্মব্যান্ড বেঁধে দেব। কিছুই না, হলুদের ওপর লালে লেখা, মুখরোচক আচার, খেয়ে ও খাইয়ে আরাম, প্রস্তুতকারক...।"

"আমরা আচার ?"

"আহা, তা কেন ? আপনারা হলেন, আমাদের প্রচার মাধ্যম। আচারের বার্তা বহনকারী।"

"একদল...।"

"ছি, ছি, সে কী কথা ! আপনারা শিক্ষক। মানুষকে আচার খেতে শেখানোটাও আপনাদের কর্তব্য। স্যার বলেছেন, ওই যে আ-এ আমটি খাব পেড়ে আছে না, বর্ণপরিচয়ে ! ওটা বদলাতে হবে। বলতে হবে, আ-এ আচার, খাব মজা করে।"

"অসম্ভব, অসম্ভব ! বিদ্যাসাগরকে আমরা বিকৃত করতে পারব না।"

সমস্ত শিক্ষকমশাই একযোগে হইহই করে উঠলেন, "অসম্ভব, অসম্ভব !"

সেই ঝলমলে পোশাকধারী ভদ্রলোক বললেন, "অত হইহই করছেন কেন ? যেন মনে হচ্ছে, কোথাও আগুন লেগেছে।"

সঙ্গে-সঙ্গে বাংলার স্যার নির্মলবাবু অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, "হোয়াট ডু ইউ মিন ?"

ভদ্রলোক অমায়িক হেসে বললেন, "স্যার, এ-যুগে আমরা সবাই...। তা না হলে কেউ এসব করে ! এই আচার বিক্রি এই সমাজসেবা ! রাগ করবেন না, আমি একটা প্রস্তাব দিচ্ছি, তাতে বিদ্যাসাগর বাঁচবেন, আমাদের কোম্পানির মালিক যা চাইছেন, তা-ও হবে। প্রস্তাবটা হল, আ-এ আমের আচার কুলুঙ্গি থেকে খাব পেড়ে। জিনিসটা ভেবে দেখুন, বিরাট একটা গাছে চড়ে আম পেড়ে খাওয়ার চেয়ে অনেক, অনেক সহজ। ছেলেটা ঘরেই রইল। দুপুরবেলা সবাই ঘুমোচ্ছে, একটা টুল টেনে এনে তাইতে চড়ে, তাক থেকে শিশি নামিয়ে আচার খাচ্ছে।"

হেডস্যার বললেন, "অরিজিনাল যা আছে, তা আমরা বদলাব না। কিছুতেই না। আর হাতে আমরা ব্যাজ পরব না। আপনার মতো একটা ভাঁড় আমরা সাজতে পারব না। একেবারে ক্লিয়ার কাট কথা।"

"তা হলে আমারও ক্লিয়ার কাট কথা, বাস ফিরে যাচ্ছে।"

সবাই একটু থমকে গেলেন। স্যারেরা দল পাকিয়ে একপাশে সরে গেলেন। অনেক পরামর্শ হল।

pathagar.net

হেডস্যার এগিয়ে এসে ভদ্রলোককে বললেন, "ঠিক আছে, আ-টাকে আমরা দু'বার প্রেজেন্ট করব। একবার আম পাড়বে, আর-একবার আমের আচার পাড়বে। তা হলে হবে তো!"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "হবে।"

বাস ছাড়ল। পাড়ার রাস্তা, বাজারের ভিড় ঠেলে অবশেষে বড় রাস্তায়।

বাস চলছে, ড্রাইভারের কেবিন থেকে ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে হাসি-হাসি মুখে বললেন, "আমি কিন্তু মাঝে-মাঝে গাড়িটাকে থামাব স্যার?"

"আপনার এই আবদার কেন স্যার!" বললেন কুমুদবাবু।

"ফর বিজনেস স্যার। দুটো পয়সা রোজগার করতে হবে তো! ড্রাইভারের মাইনে আছে। তেলের দাম আছে। আপনারা তো একটা পয়সাও দেবেন না।"

হেডস্যার বললেন, "আপনার কাছে ক্ষুর আছে?"

"কেন স্যার?"

"আমাদের সবক'টাকে ধরে মাথা কামিয়ে দিন।"

"হ্যা, হ্যা, কী যে বলেন স্যার! আপনারা হলেন জাতির মেরুদণ্ড!"

সঙ্গে-সঙ্গে গান বেজে উঠল, "শয়নে, স্বপনে, নিদ্রায়, জাগরণে খাও, খাও, চেটে খাও, চেখে খাও, চুষে খাও, আচার, আচার, বিচার হবে পরে।"

পাঁচঘরার মোড়ে বাস থেমে গেল। আমরা এরই মধ্যে ভদ্রলোকের নাম রেখে ফেলেছি 'আচার কুইন'। আচার কুইন নেমে পড়লেন। বাসের পেছন দিকের ডালাটা নামাতেই হয়ে গেল সেল্‌স কাউন্টার। ঘোষণা হতে লাগল, "এক শিশি জ্যামের সঙ্গে একটা ডট-পেন ফ্রি। এক শিশি জেলির সঙ্গে একটা চামচে।"

এইবার একটা কাণ্ড হল, বেজে উঠল হিন্দি গান।

হেডস্যারের মুখটা কেমন হয়ে গেল। সকলের মুখের দিকে করুণ চোখে তাকাচ্ছেন। কুমুদবাবু বললেন, "মান-সম্মানের যতটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাও গেল। আর কেন, এইবার চলুন, আমরাও নমে পড়ে ধিতিং ধিতিং নাচি। ছি ছি, লজ্জায় মাথা হেঁট।"

বিমান আমার কানে-কানে বলল, "চল শানু, লোকটাকে ধরে পেটাই, তারপর যা হয় হবে। আমরা ছাত্র। আমরা কত বড়-বড় আন্দোলন করেছি, আর এখন চুপ করে যাব! চল, ওঠ।" কথাটা হেডস্যারের কানে গেলে, তিনি মুনি-ঋষির ভঙ্গিতে হাত তুলে বললেন, "আমাদের আদর্শ-বিরোধী কোনও কাজ করবে না। আমি ওই জাম্বুবানকে ডেকে বলছি।"

"এই যে ছোকরা, শোনো।"

তিন লাফে চলে এল সেই জোকার, "বলুন স্যার?"

"আমরা কে?"

pathagar.net

"মানুষ, স্যার।"

"কী ধরনের মানুষ? বনমানুষ?"

"এ কী বলছেন স্যার?"

"আমরা শিক্ষক, এটা মানো তো?"

"অবশ্যই।"

"তা হলে তোমার ওই ওলকচু, মানকচু হিন্দি গান বন্ধ করো।"

"আমাকে তো লোক জড়ো করতে হবে! দু'পয়সা কামাই না হলে আমি তো কমিশন পাব না।"

"তোমার আবার কমিশন আছে?"

"থাকবে না! যেখানেই সেল সেইখানেই কমিশন।"

"তোমার টাকা আমি দেব। গান বন্ধ করে গাড়ি ছাড়ো। তোমার কমিশন কত?"

"যা বিক্রি হবে, তার ওপর টেন পারসেন্ট। একশো টাকায় দশ টাকা।"

"তোমার কত বিক্রি হতে পারে?"

"ধরুন দশ হাজার টাকা।"

"শয়তানি কোরো না।"

"তা হলে এক হাজার টাকা।"

"এটাও বেশি হল। তা হোক, আমি তোমাকে একশো টাকাই দেব।"

লোকটি ড্রাইভারের কেবিনে ফিরে গেল। গান বন্ধ হল। গাড়ি স্টার্ট নিল। সে সময়ে পৌঁছবার কথা, তার একঘণ্টা কি দেড়ঘণ্টা পরে আমরা হাটখোলা পৌঁছলুম। নিস্তারিণী মেমোরিয়াল স্কুল। সব ভোঁ-ভোঁ। মাঠ আছে, বিল্ডিং আছে। মাঠে একটা মনোযোগী গোরু আছে। কোনও মানুষ নেই।

কুমুদবাবু বললেন, "ব্যাপারটা খুব ফিশি মনে হচ্ছে। আমরা আসব জেনেও সব পালাল! ডিচিং।"

হেডস্যার বললেন, "কমিউনিকেশন গ্যাপ। ডাকবিভাগের কল্যাণে চিঠি পৌঁছয়নি।"

"আপনি চিঠি দিয়েছিলেন?"

"মনে হয় দিয়েছিলুম।"

"মনে হয়? শিওর নন?"

"মনে করতে পারছি না। লিখে যে ছিলুম, কোনও সন্দেহ নেই। এখন কথা হল, পোস্ট করেছিলুম কি না!"

নির্মলবাবু বললেন, "ব্যাপারটা জমে গেছে। আমরা তা হলে ফিরে যাই। সমাজকল্যাণ আর করা গেল না! করব বললেই কি আর করা যায়! ভাগ্য সহায় হওয়া চাই।"

pathagar.net

বিমান বলল, "স্যার !"

বিমান একটু টেনে-টেনে, নাকিসুরে কথা বলে। "স্যার !"

"বলে ফ্যালো, বলে ফ্যালো। অকারণে বেশি টানাটানি কোরো না।"

"স্যার, আসার সময় বাঁ দিকে একটা পুকুর দেখে এসেছি।"

"বেশ করেছ। চান করতে ইচ্ছে করছে বুঝি ?"

"না স্যার ! পুকুরটার খুব খারাপ অবস্থা। অসহায় মানুষের মতো। যত আবর্জনা সব ওই পুকুরে। আধখানা প্রায় বুজেই গেছে।"

হেডস্যার লাফিয়ে উঠলেন, "আরে, আমরা তো এইরকমই একটা পুকুর চাই। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। সমাজসেবার প্রধান অঙ্গই হল পুষ্করিণী উদ্ধার। বয়েজ, ফরওয়ার্ড মার্চ।"

একটা কিছু করার জন্য আমাদের প্রাণ আকুলিবিকুলি করছিল। মার্চ বলামাত্রই একেবারে মিলিটারি কায়দায় দৌড়। কদম-কদম বাড়ায়ে যা। ঝুড়ি, কোদাল, গাঁইতি, বেলচা, গামবুট আছে সঙ্গে। হেডস্যার বললেন, "এ যা পুকুর, গামবুট পরা যাবে না। বিলিতি পুকুর হলে হত। তোমরা আদুলগায়ে শর্টস পরে নেমে যাও। কোমরে গামছা বেঁধে নাও। পুকুরটা তকতকে, ঝকঝকে হয়ে যাওয়ার পর একটা বোর্ড লাগিয়ে দিয়ে যাব। এই পুকুর সংস্কার করা হল। তলায় আমাদের সমিতির নাম।"

"আপনি এত নামের কাঙাল কেন ? হোয়াট ইজ ইন এ নেম !" নির্মলবাবু বললেন, সঙ্গে জুড়ে দিলেন, স্বামীজির উক্তি-- "শুনুন, স্বামীজি সিস্টারকে একটা চিঠিতে লিখছেন।

'ভালই হোক আর মন্দই হোক, আমরা সকলেই এ সংসারে নিজ নিজ অংশ অভিনয় করে যাচ্ছি। যখন স্বপ্ন ভেঙে যাবে এবং আমরা রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে যাব, তখন এ-সব বিষয়ে আমরা শুধু প্রাণ খুলে হাসব।"

"অন্তত এই ব্যাপারে আপনি যদি কিছু না বলেন, আমি একটু খুশি হব। কোথায় স্বামীজি আর কোথায় আপনি ! আকাশ আর পাতাল, চাঁদ আর চাঁদমালা। আপনার বাড়ির বাইরে আপনার নামের ফলক। ইয়া গোটা-গোটা অক্ষর। আপনার নামের প্যাড। কত কথাই তাতে লেখা। এমনকি এ-কথাও লেখা, প্রাক্তন সভাপতি, বাঁশতলা মিলনী সঙ্ঘ। নামটা যেন সংবাদপত্রের ভাষায় স্কিমিং হেডলাইন। এপাশ থেকে ওপাশ। কবে একটা বই লিখেছিলেন, সে-কথা আজও যাকে পান তাকেই শোনান। ক'কপি বিক্রি হয়েছিল মশাই !"

অঙ্কের স্যার কুমুদবাবু খুব উত্তেজনার মুহূর্তে সাঁ করে নস্যি টানেন, আর এই শব্দটাই হেডস্যার ভীষণ অপছন্দ করেন। শব্দ শুনে হেডস্যার ভুরু কুঁচকে তাকালেন। কুমুদস্যার পাত্তাই দিলেন না। হাতের টিপে তখনও সামান্য

pathagar.net

নস্যি। সামনে একটু কুঁজো হয়ে, নাচের মুদ্রায় ধরা সেই আঙুল দুটোকে বুকের কাছে তুলে এগিয়ে আনতে আনতে নাকিসুরে বলছেন, "এই ঝগড়া, কাজিয়া, পরস্পরের প্রতি তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ, দেশের, সমাজের, জাতির এবং ব্যক্তির পক্ষে অতিশয় ক্ষতিকারক। এতে জাতীয় ঐক্য নষ্ট হয়। শাস্ত্র বলছেন, ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল। ধপাস করিয়া পতন।"

নস্যির কারণে হেডস্যার একটু বিরক্তই ছিলেন। আরও বিরক্ত হয়ে বললেন, "শুনুন মশাই, উদ্ধৃতি যখন দেবেন, তখন সঠিক উদ্ধৃতিই দেবেন। ডোন্ট ফরগেট, ইউ আর এ শিক্ষক। জন ডিকিনসনের,দ্য লিবার্টি সং-এ দুটো লাইন আছে, Then join hand in hand, brave Americans all/By uniting we stand, by dividing we fall."

"এ আবার আপনি কবে পড়লেন ! জন ডিকিনসন ? তিনি আবার কে !"

"১৭৩২ সালের আমেরিকান কবি। আপনাদের পদে-পদে ভুল ধরার জন্যে আমাকে এইসব পড়তে হয়।"

নির্মলস্যার ঝগড়া ভুলে, হেডস্যারকে সমর্থন করে বললেন, "ঠিক বলেছেন স্যার। আমাদের কুমুদবাবু অঙ্কশাস্ত্রটা খুব ভাল জানলেও লিটারেচারে ভীষণ, ভীষণ উইক। মাঝে-মাঝেই বলতে শুনি, তোদের ব্যাংলার টিচার ! বর্ষাকালে ব্যাঙ ডাকে আর ব্যাংলার টিচাররা কবিতা আবৃত্তি করেন। অঙ্কের অহঙ্কারে লঘু-গুরু জ্ঞান হারিয়েছেন। উনি ভুল ইংরেজিতে যে-কথা বলেছেন, আমি সংস্কৃতে প্রায় সেই কথাটাই বলব, তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যান্তে মত্তদন্তিনঃ।"

নির্মলস্যার বীরের মতো হাসছেন। এমন একটা কিছু বলেছেন, যেন একেবারে তুরুপের তাস খেলা।

হেডস্যার ভুরু কুঁচকে বললেন, "কী বিচ্ছিরি কথা ! আড়াই হাত লম্বা। রেফের ছড়াছড়ি। সংস্কৃতের এই খোঁচাটা মশাই আমার অসহ্য লাগে। একটার ঘাড়ে আর-একটা শব্দ চাপিয়ে যেন একটা...। একেবারে ঠাসা, গাদাগাদি, পলিউশান সাফোকেশন, একটার কার্বন ডাই-অক্সাইড আর-একটার নাকে।"

"আপনার সেইরকম মনে হলে আমার কিছু করার নেই। দেবভাষা।"

"জট ছাড়ালে, মানেটা কী দাঁড়াচ্ছে ?"

"অতি সুন্দর। অনেক তৃণগুচ্ছ একত্র করিয়া রজ্জু প্রস্তুত হইলে তাহাতে মত্ত হস্তীকেও বাঁধা যায়।"

"বাঃ বাঃ, অতিশয় সুন্দর। ওইটুকুর মধ্যে এতটা ঢুকে আছে !"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সাঙ্ঘাতিক প্যাকিং।"

এইসব ঘ্যাঁচোর-ম্যাঁচোর যখন হচ্ছে, ততক্ষণে আমরা সেই ডোবায় নেমে পড়েছি। হাতে আর পায়ে কেরোসিন তেল মেখে নিয়েছি। ভুরভুর করে

pathagar.net

গন্ধ বেরোচ্ছে বিকট। ব্যাঙাচি আর নানা রকমের পোকা লাফিয়ে-লাফিয়ে গায়ে উঠছে। জলমাকড়সা লম্বা-লম্বা ঠ্যাং নিয়ে পিঠ বেয়ে ঘাড়ের কাছে উঠে গিয়ে কাঁধে ডান্স করছে। তবু আমরা নির্ভীক। ডু ইয়োর ডিউটি কাম হোয়াট মে।"

সাইকেলে চেপে ভীম ভবানী মার্কা একজন ভদ্রলোক এলেন কোথা থেকে। স্ক্রু কাট চুল। ইয়া গর্দান। আধুনিক মাস্তানি গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপারটা কী! কী হচ্ছে এখানে?"

উত্তর দিলেন হেডস্যার, "আমরা একটা সামাজিক কর্তব্য পালন করছি।"

সঙ্গে-সঙ্গে নির্মলস্যার যোগ করলেন, "স্বামীজি বলছেন, বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ, অর্থাৎ, বসন্তের ন্যায় লোকের কল্যাণ আচরণ করো। জগতের কল্যাণ করা, আচণ্ডালের কল্যাণ করা—এই আমাদের ব্রত, তাতে মুক্তি আসে না নরক আসে।"

ভীম ভবানী বললেন, "লেকচার রাখুন। আসল ব্যাপারটা কী! কোথাকার লোক আপনারা!"

"আমরা কলকাতার দিক থেকেই আসছি। স্বামীজির অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। দেশের, দশের কল্যাণে ব্রতী। ত্রিভুবনমুপকারশ্রেণীভিঃ প্রীয়মাণঃ অর্থাৎ ত্রিভুবনের হিত করিতে আমরা ভালবাসি।"

"হয়েছে, হয়েছে। আসল কাজটা কী হচ্ছে!"

"পুষ্করিণী উদ্ধার।"

"ঝেড়ে কাসুন তো, আপনারা হালদারের লোক। তাই তো!"

"কে হালদার!"

"দেখাচ্ছি, কে হালদার! দাওয়াই পড়লেই সব বেরিয়ে আসবে।"

লোকটি আধচক্কর মেরে যেদিক থেকে এসেছিলেন সেই দিকেই চলে গেলেন। আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি নন-স্টপ। যদি তোর ডাক শুনে কেউ...

মাস্টারমশাইরা ছায়ায় বসে আছেন। কুমুদস্যার মাঝে-মাঝেই বলছেন, "এক চুমুক চা যদি এই সময় পাওয়া যেত!"

গোটা দুয়েক মোটর সাইকেল আসছে। ঘোর শব্দ। খুব স্পিডে আসছে। বাইক-দুটো আমাদেরই দঙ্গলে এসে থামল।

কুমুদস্যার বললেন, "চা এনেছেন বুঝি!"

ভীষণ চেহারার চারজন মানুষ। কর্কশ গলা, "এই উঠে আয় বদমাসের দল। এই কাজ তোদের কে করতে বলেছে? হালদার!"

হেডস্যার এগিয়ে গেলেন, "তখন থেকে আপনারা হালদার, হালদার করছেন। হালদারমশাই কে?"

pathagar.net

"কিছুই জানেন না বুঝি। যত্ত সব! হালদার হলেন গিয়ে হেডমাস্টার!"

"অ, পবিত্রবাবু! পবিত্র হালদার! তিনি কোথায়! তাঁর সঙ্গেই তো কথা হয়েছিল।"

"তাঁকে তো আমরা কিছুদিনের জন্যে হাসপাতালে পাঠিয়েছি। বেশি না, মাথায় দশটা স্টিচ, আর বুকের একটা কাঁপ মচকে দিয়েছে আমাদের ছেলেরা। বাঁ চোখটা ঢেকে দিয়েছি। এদিকটা মেরামত হতে-হতে ওদিকটা খুলে যাবে। সেই হালদার বলেছে তো এটাকে সাফ করতে!"

"আজ্ঞে না, শুধু-শুধু একজন অসুস্থ মানুষের নামে কেন মিথ্যে বলব। আমরা সবাই একটা স্কুলের শিক্ষক। আমাদের বাসনা হয়েছিল, সমাজসেবা করব। পবিত্র আমার কলেজ জীবনের বন্ধু। পবিত্র বলেছিল, 'আমার এখানে আয়, করার মতো অনেক কাজ আছে। তাই আমরা নানাভাবে তৈরি হয়ে, একজন স্পনসরার জোগাড় করে এখানে এলুম। এসে দেখছি,সব ভোঁ-ভোঁ, কেউ কোথাও নেই। তখন আমরা নিজেরাই ঠিক করলুম, সমাজসেবার একটা প্রাচীন দিক হল পুষ্করিণী সংস্কার। তা সেই কাজেই ছেলেদের লাগিয়ে দিলুম। এত আয়োজন করে এসে শুধু-শুধু ফিরে যাব! পুকুরটার অবস্থা দেখেছেন? একেবারে দূষিত হয়ে আছে। এর থেকেই ম্যালেরিয়া, এর থেকেই কলেরা, যাবতীয় মহামারীর প্রকোপ। কত বড় একটা ভাল কাজে আমরা হাত দিয়েছি। অ্যাপ্রিসিয়েট করুন। ঈশ্বরের অসীম কৃপা! এই রকম হাতের কাছেই একটা পুকুর সাজিয়ে রেখেছেন!"

"খুব ভাল কাজ করেছেন! আরে মশাই, এই পুকুরটা আমরা একটু-একটু করে বোজাচ্ছি। এটা আমাদের জবরদখল। হালদারদের সম্পত্তি। আমরা এটাকে বুজিয়ে পল্লীমঙ্গল ক্লাব করব।"

হেডস্যার লাফিয়ে উঠলেন, "মঙ্গল! মঙ্গল শব্দটা আছে! সে তো ভাল কথা! তা কী কী মঙ্গল করবেন!"

"একটা ক্লাবঘর হবে। সেখানে ক্যারমবোর্ড, তাস, দাবা টিভি থাকবে। ছেলেরা আসবে, খেলবে। সারারাত ভিডিও প্রোগ্রাম দেখবে। ইলেকশানের সময় আমাদের হয়ে কাজ করবে। মিছিলের দিন গ্রামের লোককে ঝেঁটিয়ে কলকাতায় নিয়ে যাবে। এখানকার লোকের বেচাল দেখলেই চেন আর ডাণ্ডা বের করে ঠাণ্ডা করে দেবে। অন্য মতের, মানে বেপাড়ার লোক দেখলেই দলবেঁধে তেড়ে যাবে।"

"আর কিছু করবে না! মহাপুরুষদের জন্মদিন পালন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, নেতাজি!"

"ওঁরা আবার কবে মহাপুরুষ হলেন? আমাদের কোনও মহাপুরুষই স্বদেশি নন, বিদেশি। ওই একটা ব্যাপারে আমরা খুবই উদার।"

pathagar.net

"আমরা এখন তা হলে কী করব ?"

"কী করবেন ? আধুনিক কায়দায় সমাজসেবা ! একালে লোকে পুকুর কাটে না। পুকুর বোজায়। আপনাদের কলকাতায় কী হচ্ছে, পুকুর ভরাট করে বড়-বড় ফ্ল্যাট। এতক্ষণ আপনারা পুরাণ মতে সমাজসেবা করলেন। এইবার উলটপুরাণ মতে করুন। ছেলেদের বলুন, যা তুলেছে আবার সব ওই পুকুরে ফেলতে। তারপর, দয়া করে এসেছেন যখন, তখন গোটাটাই ভরাট করে দিয়ে যান। প্রথমটা তো পাকা ঘুঁটি কাঁচা করা হয়। ওটা হল পুরনো পড়া, নতুন পড়া হল, ওই যে দেখছেন ডাঙাটা, ওখান থেকে মাটি কেটে এনে এই পুকুরে ফেলতে বলুন। যদি না করেন তা হলে কী হবে ?"

হেডস্যার বললেন, "কী হবে ?"

"আপনাদের অল্পবিস্তর শরীর খারাপ হবে। আমাদের নানা রকম ব্যবস্থা আছে, একমাসের জন্যে, তিন মাসের জন্যে, এক বছরের জন্যে, যাবজ্জীবনও আছে। শুয়েই রইলেন, আর উঠতে হল না। আর কাজটা যদি করেন, তা হলে, আমরা এখনই চায়ের ব্যবস্থা করব। দুপুরে ভাত, ডাল, তরকারি, পুকুরের মাছ খাওয়াব। দই খাওয়াব। বিকেলে আবার চা। অতিথি আপ্যায়নে কোনও ত্রুটি হবে না। আপনারা কিন্তু সমাজসেবাই করছেন। গঠনমূলক সমাজসেবা। এতকাল সবাই কেটে এসেছে। মাটি হল মা। মাকে কেটেছে, গর্ত করেছে, চোট দিয়েছে। পাপ করেছে। আপনারা সেই গর্ত বুজিয়ে পুরনো পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন। আমরা এখন কী বলছি বলুন তো—কাট্‌তে হলে মানুষ কাটো, গাছ কেটো না।"

হেডস্যার বললেন, একটু আমতা-আমতা করে, "গোটা পুকুরটা কী ভরাট করা যাবে বাবা ?"

"যতটা হয়, যতটা হয়। আমরা অন্যায্য কথা বলব কেন !"

আমরা তো শুধু পুকুরের জন্যে আসিনি বাবা, আমরা যে আবার সাক্ষরতার কর্মসূচি নিয়ে এসেছি। একঘণ্টায় অ আ, ক খ। সরকার যেমন চাইছেন আর কী !"

"বাঃ, বাঃ, সে তো বহত আচ্ছা !"

নির্মলস্যার নীরবতা ভেঙে বললেন, "ওই যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ। স্বামীজি বলছেন, এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে। বোম্বায়ের বেনেগুলো ছারপোকার হাসপাতাল বানাচ্ছে। শিক্ষা, শিক্ষা, ফার্স্ট ওয়ার্ড অ্যান্ড লাস্ট ওয়ার্ড।"

কুমুদস্যার এই উত্তেজনার শেষ মুহূর্তে হাত ধরা নস্যির শেষ টিপ নাকের কাছে ধরে মোক্ষম একটা টান মারলেন। যেন সাইরেন বাজল, ব্রহ্মরন্ধ্র বার্স্ট করে আর কী।

pathagar.net

পাড়ার দাদা নির্মলস্যারের বক্তৃতায় যেন বেশ খুশি হলেন। হুমদো মুখে হাসি ফুটল। কুমুদস্যারের নস্যির টানও মনে হয় মনে ধরেছে। আমরা যে প্রকৃত সমাজসেবী, আমাদের আর কোনও ধান্দাও নেই এটা বুঝেছেন। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ছেলেরা উঠে এসো, আর নোংরা ঘাঁটতে হবে না। ওপাশে একটা বড় দিঘি আছে, সাবান মেখে চান করে এসো!"

হেডস্যার বললেন, "সে কী, এটা ভরাট করতে হবে না?"

"সে আমার ছেলেরা করবে! এ-কাজ ওদের নয়। আমি বুঝতে পেরেছি, আপনারা হালদারের লোক নন। আপনারা জেনুইন সমাজসেবী। ভাল মানুষ, এক নম্বর মানুষ। আপনারা সেবা করবেন অন্যভাবে। শীতলাতলায় সাক্ষরতার ক্যাম্প হয়েছে। সেইখানে চলুন। দেখি আপনারা কী এনেছেন! ও হ্যাঁ, আপনাদের রক্ত দিতে হবে।"

হেডস্যার বললেন, "এই যে বললেন, আমরা ভাল লোক রক্ত-টক্ত দিতে হবে না!"

"এ রক্ত সে রক্ত নয় স্যার। আমাদের ব্লাড-ডোনেশান ক্যাম্প হয়েছে। রক্ত চাই, রক্ত। বোতল-বোতল রক্ত। আমাদের টার্গেট দু'শো বোতল।"

শীতলাতলা জায়গাটা বেশ ভাল। বিরাট মাঠ। চারপাশে বড়-বড় গাছ, ছায়া করে রেখেছে। মন্দিরটা বেশ বড়। বিশাল মায়ের মূর্তি। একটা মঞ্চ করা হয়েছে। শীতলাবাড়ির একটা ঘরে সার-সার বেড। এক-একবারে ছ'জন রক্ত দিতে পারবে। হিন্দি গান বাজছে। হঠাৎ গান থামিয়ে আহ্বান, "বন্ধুগণ, রক্ত দিন। আপনার রক্তে মুমূর্ষু প্রাণ ফিরে পাবে। নেতাজি একদিন নেশনকে বলেছিলেন, 'গিভ মি ব্লাড আই উইল গিভ ইউ ফ্রিডম', আহা আহা, রামজি ভাবিকো বাধাই—রক্ত সম্পর্কে বলা হয়েছে, যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে। শাস্ত্রে আছে রক্তবীজের ঝাড়। আহা, আহা, রামজি।"

গান আর বক্তৃতা, বক্তৃতা আর গান। মাঝে-মাঝে আবার হ্যালো, হ্যালো টেস্টিং টেস্টিং, নাইন এইট, সেভেন, সিক্স। একটি ঘোষণা, একটি ঘোষণা। এইমাত্র কলকাতা থেকে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে এসেছেন বনমালী বয়েজ স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ। স্বামীজির অনুপ্রেরণায় প্রাণিত। সেই স্বামীজি, যাঁর শিকাগো হল এই সেদিন। যিনি বলেছিলেন, যিনি বলেছিলেন, যিনি বলেছিলেন... নির্মলস্যার লাফিয়ে উঠলেন, "আটকে গেছে, সাপ্লাই লাইনে আমার থাকা দরকার।" মঞ্চের দিকে এগোচ্ছেন। গান শুরু হয়ে গেছে, "বাহা, বাহা, রামজি।"

হেডস্যার নির্মলস্যারকে আটকাতে চেষ্টা করলেন। তিনি ঝটকা মেরে সোজা মঞ্চে, মাইক্রোফোনের সামনে। গানটা চাপা পড়ে গেল। তিনি বলছেন, "স্বামীজি বলেছিলেন, 'তোমরা সিংহতুল্য হবে। ভারতকে— সমগ্র জগৎকে

pathagar.net

জাগাতে হবে। এ না করলে চলবে না, কাপুরুষতা চলবে না বুঝলে। কার্যসিদ্ধির জন্যে আমার ছেলেদের আগুনে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। এখন কেবল কাজ, কাজ, কাজ। ধৈর্য, অধ্যবসায় ও পবিত্রতা চাই।"

কুমুদস্যার কেবলই বলছেন, "পরিবেশটা ঠিক আমাদের উপযোগী নয়। হিন্দি সিনেমার গানের সঙ্গে স্বামীজিকে পাণ্ড করছে। আমাদের মশাই বয়েস হয়েছে। আমাদের কালচারের সঙ্গে মিলছে না।"

পুকুর-ধারে যে তম্বি করছিল, তার নাম জেনেছি শীতল। আমরা দাদা বলতে শুরু করেছি। সেই শীতলদা কুমুদস্যারের কথা শুনে ফোঁস করে উঠল, "স্বামীজি কি কেবল আপনাদের সম্পত্তি! আপনাদের স্কুলের ওই আদুরে খোকাদের চেয়ে আমরা অনেক ভাল। ওরা তো স্বার্থপর হবে। নাকতোলা হবে। বড়-বড় ফ্ল্যাটে থাকবে, বড়-বড় কথা বলবে। একালে এইভাবেই ওদের তৈরি করা হচ্ছে। ঘরে-ঘরে ইংলিশ মিডিয়াম। জ্যাক অ্যান্ড জিল লাফাচ্ছে। স্বামীজিকে আমিও গিলে খেয়েছি। মনে আছে, তিনি কী বলেছিলেন, 'তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত। ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র ; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর ; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী ; বল, ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। আর বল দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

চা এসে গেছে। শীতলদা নিজেকে সংযত করে বলল, "নিন মাস্টারমশাই, চা খান। সঙ্গে গরম নিমকি আছে।" হেডস্যার খাবেন কী! তিনি তো অভিভূত। চোখে জল। তাঁর এইরকম হয়। খারাপ হলে কাঁদেন না। গুম মেরে যান। ভাল হলেই চোখে জল।

শীতলদাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "জেম অব এ বয়। জেম অব এ বয়।"

আচারদাদা হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, গাঁক-গাঁক করে আচারের গান বাজাতে শুরু করেছেন। দু'চারটে লোক দেখলেই তাঁর বিক্রির ধান্দা। গান হচ্ছে, খাও আচার, খাওয়াও আচার। জিভে জল, মনে হল, খাও আচার, কেন বিচার, যাবজ্জীবন এই আচার।"

শীতলদার ভুরু কোঁচকাল, "এটা কী!"

pathagar.net

কুমুদস্যার বললেন, "ওই যে, আমাদের স্পনসরার। আচার কোম্পানি। জ্যাম, জেলি, চাটনি। সারাটা পথ এই করতে-করতে এসেছে। একবার করে থামে, গান বাজায়, বিক্রি করে, আবার চলে।"

"গাড়িতে জিনিস আছে?"

"প্রচুর।"

"দেখছি।"

আমাদের চা দিয়ে শীতলদা মঞ্চে চলে গেল। নির্মলস্যার নেমে চলে এসেছেন আমাদের কাছে। শীতলদা মাইকের সামনে, "হ্যালো, হ্যালো, বন্ধুগণ অত্যন্ত সুখবর, যারা রক্ত দিচ্ছে তাদের প্রত্যেককে বিনামূল্যে, পুরস্কার হিসেবে, এক শিশি জ্যাম, জেলি অথবা চাটনি দেওয়া হবে। কলকাতার বিখ্যাত আচার কোম্পানি টেস্ট অ্যান্ড ডান্স আমাদের এই উপহার পাঠিয়েছেন। আমরা কৃতজ্ঞ।"

আচারদাদা গাড়ির ভেতরে। সেইখান থেকে মাইকে বলছেন, "এই না, এ কী হচ্ছে! মরে যাব। ফ্রি নয়, ফ্রি নয়। পয়সা দিয়ে কিনতে হবে। বাজারের চেয়ে কম দাম। ফ্রি হল চামচে। ওয়ান স্পুন ফ্রি।"

শীতলদার আবার ঘোষণা, "যাঁদের রক্ত দেওয়া হয়ে গেছে, তাঁরা গাড়ির কাছে চলে যান। পুরস্কার বুঝে নিন। গোলমাল করলে জানান। আমাদের দাওয়াই প্রস্তুত আছে।"

এইবার শীতলদাদের গান বাজছে, আর হিন্দি নয়, রবীন্দ্রসঙ্গীত— আকাশভরা সূর্যতারা। মাঠের মাঝখানে দু'হাত তুলে আচারদাদা নাচছেন। শীতলদার ছেলেরা পেটি-পেটি জিনিস নামাচ্ছে আর দু'হাতে বিলি করছে। ওদিকে মাঠ-ময়দান ভেঙে মানুষ আসছে আচারের লোভে। একটি ছেলে মাইকে গাইছে, "রক্ত দে দো, জ্যাম লে লো।" আবার আকাশ ভরা।

কেস খুব জমে গেছে।

ঠিক দুটোর সময় রক্তদান শেষ হল। মন্দিরের পেছনে রান্না হচ্ছিল। শীতলদা খুব আপ্যায়ন করে খাওয়াল। লেখাপড়া জানা ছেলে। এম এ পাস। প্রকৃত সমাজসেবী। আমরা খেতে-খেতেই শুনছি ঘোষণা হচ্ছে— "তিনটের সময় আমাদের ময়দানে শুরু হবে বর্ণপরিচয় নাটক। কলকাতার বিখ্যাত স্কুল বনমালী বয়েজের ছাত্র ও শিক্ষকরা এসে গেছেন তাঁদের বর্ণাঢ্য পালা নিয়ে। দু'ঘণ্টায় অ আ ক খ শেখা হয়ে যাবে। মায়েদের অনুরোধ ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দিন। নিজেরাও আসতে পারেন। অভিনব এই পালায় গান আছে, ছড়া আছে, বর্ণমালার নৃত্য আছে, লড়াই আছে। আসুন, আসুন, চলে আসুন। সাক্ষরতার এই কর্মসূচিকে সফল করুন। নাটকের শেষে আছে যোগ। যোগীরাজ তপন তাঁর যোগপ্রদর্শন করবেন। তিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে

pathagar.net

এসেছেন। তিনি কাচের বোতল, আলপিন, পেরেক, লোহার টুকরো সবই খেতে পারেন, জ্যান্ত মুরগি গিলে ফেলেন।"

তপনদা আমাদের পাশে বসেই মাছের মুড়ো খাচ্ছিলেন, সেই অবস্থাতেই মঞ্চের কাছে ছুটে গিয়ে চিৎকার করতে লাগলেন, "কী সর্বনাশ, কী সর্বনাশ, ওসব নয়, ওসব নয়। আমার যোগ অন্য, যোগাসন, সোগাসন।"

ঘোষক তখন অন্য লাইনে চলে গেছেন, তিনি টোপ ফেলছেন, "অনুষ্ঠানের শেষে বিনামূল্যে চামচে বিতরণ করা হবে। এই চামচে দিচ্ছেন কলকাতার বিখ্যাত আচার কোম্পানি—টেস্ট অ্যান্ড ডান্স।"

একটা মানুষ যে দু'ঘণ্টার মধ্যে এমন রোগা হয়ে যেতে পারে, আমাদের আচারদাদাকে না দেখলে বিশ্বাস হত না। শুনেছি ফাঁসির আসামির রাতারাতি সব চুল পেকে যায়। আচারদাদার মুখটা এতটুকু হয়ে গেছে। শুকিয়ে আমসি। কোমর থেকে প্যান্টুল ঝুলে-ঝুলে পড়ছে। চোখ দুটো মরা মাছের মতো। শীতলদাকে বলতে গিয়েছিল, "ধনেপ্রাণে মারবেন না স্যার!"

শীতলদা বলল, "ধনে মারলে আর প্রাণে মারব কেন?"

সাড়ে তিনটের সময় আমরা সব সেজেগুজে মঞ্চে উঠলুম। কুমুদস্যার এত খেয়েছেন যে, থেকে-থেকেই শুয়ে পড়তে চাইছেন। মাঝে-মাঝেই হাই তুলছেন সুন্দরবনের বাঘের মতো। অন্তত বার চারেক বলেছেন, "আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে। এই তো শীতল, এই তো সেই ছেলে।"

স্টেজ সাজানো হয়ে গেছে। তারাপদ একপাশে আমগাছের কাট আউট খাড়া করে বসে আছে। গাছের তলায় ছোটমতো প্লাস্টিকের একটা ঝুড়ি। আমগাছের ডালে-ডালে হিসেব করে দশটা কাঁচা আম বেঁধেবুঁধে কোনওক্রমে ঝোলানো হয়েছে। শুধু আ শিখলে হবে না। কুমুদস্যার সঙ্গে-সঙ্গে কাউন্টিংও শেখাবেন। কম্বাইন্ড কোর্স। ছেলেরা বলে-বলে আম পাড়বে, এক, দুই, তিন। গোনাটাও শিখে যাবে। ঝুড়ি থেকে আম তুলে-তুলে একজন আর-একজনকে দেবে, আর কুমুদস্যার প্রশ্ন করবেন, "ক'টা পেলে? ক'টা হল?"

আমি এদিকে অজগরে ফিট হয়ে গেছি। গেম্‌টিচার বিকাশস্যার নিজেই ঈগলের দায়িত্ব নিয়েছেন। বন্ধু সরোজ ইঁদুর হয়েছে। সব ক্যারেকটারই রেডি। হেডস্যার হয়েছেন ঋষিমশাই। টেরিফিক দেখাচ্ছে। যোগীরাজ তপনদা কয়েকবার ৯ সেধে নিয়েছেন। স্টেজে নেমেই ঝট করে একটা আসন মেরে দেবেন। মুকুলের গান রেডি। সঙ্গে বাজবে ঢোল।

নির্মলস্যার মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে সভা দেখছেন। প্রচুর জমায়েত। বাচ্চাগুলো ডুমো মাছির মতো ওড়াউড়ি করছে। কালো, পাঁশুটে গোটাকতক কুকুরও এসে গেছে। দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার। এরই মধ্যে কে কোথায়

pathagar.net

ধাঁই-ধাঁই করে গোটাকতক চকোলেট বোমা ফাটিয়ে দিল। ঝাঁক-ঝাঁক কাক কা কা করে উড়ছে। কুকুরগুলো গলা ফাটাচ্ছে।

শীতলদা বলল, "এই হল ফোক্ কালচার।"

নির্মলস্যার ছোটমতো একটা বক্তৃতা দেবেন। প্রস্তুত হচ্ছেন। শীতলদা বলছে, "বেশি বড় করবেন না। লোকে বিরক্ত হয়ে পালাবে। সহজ করে দু'চার কথা।"

নির্মলস্যার বলছেন, "শীতলের মতো ছেলে হয় না। শীতলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আপনাদের সামনে আসার সুযোগ করে দিয়েছে। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। স্বামীজি বলে গিয়েছিলেন, যেরকম শিক্ষা চলছে সেরকম নয়। সত্যিকার কিছু শিক্ষা চাই। খালি বইপড়া শিক্ষা হলে চলবে না। যাতে চরিত্রগঠন হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে দাঁড়ানো যায়, এইরকম শিক্ষা চাই। ছোট ছেলেদের গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা গোছের শিক্ষা দেওয়াটা তুলে দিতে হবে একেবারে। কেউ কাউকে শিক্ষা দিতে পারে না। শিক্ষকমশাইরা শেখাচ্ছেন মনে করলেই সব নষ্ট হয়ে যায়। একটি ছেলের ভেতরেই সব আছে। সেগুলোকে কেবল জাগিয়ে দিতে হবে। শিক্ষকের কাজ সেইটাই। যে-বর্ণমালা ভেতরে আছে সেইটাকেই আজ আমরা জাগাব।"

সভার দিকে পেছন ফিরে নির্মলস্যার দু'হাত তুলে চিৎকার করে বললেন, "জাগো, বর্ণমালা জাগো।"

সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়ে গেল মুকুলের গান, আং নমঃ, ঈং স্বাহা, ঊং বষট, ঐং হুং, ঔং বৌষট, অঃ বস্ত্রায় ফট্। সঙ্গে বিশুর লাগ্‌গুমাগুম ঢোল।

মুকুলের বাবা পুরোহিত। দুর্গাপুজোয় মুকুল বাবার সঙ্গে তন্ত্রধারক হয়। করণ্যাসে অ, ঈ, আ আছে দেখে সেইটাই এখানে ছেড়ে দিল কায়দা করে। জিনিসটা জমেও গেল। ছেলেরা খুব মজা পেয়েছে। ফার্স্ট আইটেম শেষ হওয়া মাত্রই, শীতলদার সঙ্গে যেমন কথা হয়েছিল, একটা বছর তিনেকের বাচ্চা মেয়েকে স্টেজে তোলা হয়। এইবার অ আর অজগর একসঙ্গে তেড়ে আসবে।

মুকুল কালোয়াতি সুরে গাইছে,অ-এ অজগর আসছে তেড়ে। বুকে অ ফিট করে বিশু যেই একপা এগিয়েছে, আমি অমনই অজগর নিয়ে খচরমচর করে ওভারটেক করে যেই না তেড়ে গেছি, মেয়েটা চিল-চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে স্টেজ থেকে মেরেছে লাফ। ভয়ে ছুটছে খোলা মাঠের দিকে। অ-এর ভয়ে যে পালায় তাকে আর কী শেখানো যাবে! অতএব দ্বিতীয় পাঠ, আ-এ আমটি খাব পেড়ে। তারাপদ ভালসা কাঠের আমগাছ নিয়ে স্টেজের মাঝখানে। দুটো ছেলে আমতলায়।

নির্মলস্যার বলছেন, "পাড়ো বাবা পাড়ো, আ-এ আমটি পেড়ে খাও।" কুমুদস্যার বলছেন, "একটা-একটা করে পাড়, এক, দুই, তিন।"

pathagar.net

ছেলে দুটো ঘাড় কাত করে একগুঁয়ের মতো বলল, "পেড়ে খাবুনি গো। বাবা কেন্নে দিলে খাব। চুরি করে খাবুনি। আমরা অমন নয় গো কত্তা। আমাদের ইমান আছে।"

ছেলে দুটো ডাঁটসে স্টেজ থেকে নেমে চলে গেল। আমরা দু'বার ধাক্কা খেলুম। আমার অজগর দু'পার বেশি এগোতেই পারল না। তারাপদ তার সাধের আমগাছ নিয়ে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মতো মাঝমঞ্চে ভ্যাবাচ্যাকা দাঁড়িয়ে আছে। সব প্ল্যান আপসেট। সভা থেকে এক ভদ্রলোক মঞ্চের কাছে এগিয়ে এলেন। বেশ ভাল দেখতে। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। সুন্দর সাজপোশাক।

তিনি এসেই চ্যালেঞ্জ করলেন, "এসব কী হচ্ছে! হচ্ছেটা কী!"

একটা বড় পিঁড়ের তলায় চারটে চাকা লাগানো ছিল। শীতলদাদের বাড়ির জিনিস। ভাইপোরা গাড়ি-গাড়ি খেলে। শীতলদা সেইটা বাড়ি থেকে আনিয়েছিল। প্ল্যানটা ছিল, হেডস্যার ঋষি সেজে ওটার ওপর বসে থাকবেন, আর আমরা গড়গড়িয়ে স্টেজে নিয়ে আসব।

ভদ্রলোকের তেরিয়া প্রশ্ন শুনে, তিন আমাদের বললেন, "পুশ।"

আমরা তাঁকে গড়গড়িয়ে স্টেজে নিয়ে এলুম। একেবারে সামনে, ভদ্রলোকের মুখোমুখি। ভদ্রলোক একটু হকচকিয়ে গেলেন।

হেডস্যার ঋষির মতোই হেসে, স্নিগ্ধ গলায় বললেন, "কী হচ্ছে, বুঝতে পারছেন না। আমরা বর্ণপরিচয় করাচ্ছি আধুনিক পদ্ধতিতে।"

ভদ্রলোক বললেন, "একে পরিচয় করানো বলে না, আপনারা বর্ণমালার ভয় দেখাচ্ছেন। একটা শিশু প্রথম অক্ষর থেকেই ভয়ে জর্জরিত হচ্ছে। অ বলামাত্রই তাকে তেড়ে আসছে অজগর। জ্যান্ত গিলবে। তারপরেই আ-তে নিয়ে গিয়ে অন্যায় শেখাচ্ছেন। পরের বাগানে গিয়ে, পাঁচিল টপকে, আম পেড়ে খাও। রোজগার করে কিনে খাওয়া নয়। জোর-জুলুম করে পেড়ে খাওয়া।"

আচারদাদা পাশ থেকে বললেন, "ওইজন্যেই বলেছিলুম, বদলান, এসব শেখাবেন না। দেশটা এসবেই ভরে গেছে। বলুন আ-এ আচার খাব পেড়ে।"

ভদ্রলোক ভ্রূকুটি করে বললেন, "কে আপনি? হু আর ইউ?"

"আমি স্যার আচার কোম্পানি, টেস্ট অ্যান্ড ডান্স। এই প্রোজেক্টের স্পন্সরার।"

"গাছ থেকে আচার পেড়ে খাবে?"

"গাছ থেকে কেন স্যার! রান্না বা ভাঁড়ার ঘরের কুলুঙ্গি থেকে। ঠিক দুপুরবেলা, ভূতে মারে ঢেলা। মা সবে একটু শুয়েছেন। চোখ দুটো লেগে গেছে। এমন সময় বিল্টু সোনা, জানলা বেয়ে উঠে আচারের জার খুলে... ওইজন্যে আমাদের জার তো কাচের নয়, ক্র্যাশপ্রুফ হেলমেটের মতো। পড়ে

pathagar.net

গেলেও ভাঙবে না। সেন্ট পারসেন্ট সেফ।"

ভদ্রলোক গর্জন করে উঠলেন, "না, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা না বলে আচার পেড়ে খাবে না। ওটাও অন্যায়।"

"তা হলে বর্ণপরিচয় হবে কী হবে! তা হলে মুখ্যু হয়েই থাক।"

ভদ্রলোক হেডস্যারকে বললেন, "তারপর ই আর ঈ-এর মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করেছেন সদ্ভাবের নয়, খাদ্য-খাদকের। সেকালের ওসব একালে আর চলে না। এইটুকু একটা ইঁদুর, লাভলি ইঁদুর, ভেলভেটি ইঁদুর ভয়ে কুঁকড়ে আছে, একটা ঈগল তেড়ে আসছে। আর সেই হিংসা, সেই ভয়ের দৃশ্যে আপনি সেজে বসে আছেন ঋষি। ঋষিরা এ-যুগে অচল। এ-যুগ হল প্রতিযোগিতার, সংগ্রামের। লড়াই, লড়াই, লড়াই। লড়াই করে বাঁচতে হবে, বাঁচতে গেলে লড়তে হবে।"

হেডস্যার থতমত, "বিদ্যাসাগর তো এইভাবেই শিখিয়ে গেছেন, আমরা কী করতে পারি!"

"আপনারা নতুন বর্ণপরিচয় লিখবেন নতুন কালের জন্যে।"

"সেটা কেমন হবে?" হেডসারের খুব উৎসাহ।

"যেমন ধরুন, অ-এ অমিতাভ আসছে ওই।"

"সে আবার কে?"

"আরে মশাই অমিতাভ বচ্চন, ন্যাশনাল হিরো, এক্স এম পি। ছেলেবুড়ো নাম শুনলে নেচে ওঠে। 'শোলে' দেখেছেন?"

"না ভাই।"

"বাড়ি গিয়ে দেখে নেবেন।"

SEP 2005

"আ-তে কী হবে?"

"কেন! আ-তে আমজাদ টিসুম-টিসুম।"

"আমজাদ আবার কে?"

"বিখ্যাত ভিলেন, শোলের গব্বর সিং। কে না তাঁর নাম জানে।"

"ই-তে কী হবে?"

"ইমরান নিচ্ছে রান।"

"ইমরান কে?"

"উঃ, আপনার অজ্ঞতা আকাশছোঁয়া। ইমরান হলেন পাকিস্তানি টেস্ট ক্রিকেট প্লেয়ার। যখন ওয়ান ডে খেলেন, সবই প্রায় ছয় আর চার।"

নির্মলস্যার বললেন, "স্বামীজিরও ওই এক কথা, শতাব্দীর প্রথম ভাগে বলে গেছেন, সমাজের বৈষম্য দূর করিয়া সাম্য আনিবার একমাত্র উপায় উচ্চবর্ণের শক্তির কারণস্বরূপ শিক্ষা ও কৃষ্টি আয়ত্ত করা।"

ভদ্রলোক সমর্থন করলেন, "দ্যাটস রাইট। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামীজিকে টপকে বেরোবার উপায় নেই।"

pathagar.net

হেডস্যারের গালে নকল দাড়ি, কুটকুট করছে। কুড়ুড়-কুড়ুড় করে চুলকোতে চুলকোতে জিজ্ঞেস করলেন, "খুলে ফেললেই তো হয়, আর রেখে কী হবে এই অস্বস্তি!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। একটানে খুলে ফেলুন, পাটের দাড়ি। ঋষিদের যুগ শেষ, এখন... ঋষি কাপুরের যুগ।"

"সে আবার কে?"

"বাবা, বিখ্যাত তারকা, ববিখ্যাত।"

"উ-টা কী হবে?"

"উপেনবাবু হলেন ঘেরাও। সাম্প্রতিক পরিস্থিতির সঙ্গে শিশুদের শৈশব থেকেই পরিচয় ঘটানো। গুড়ি গুড়ি, বোকা, বোকা বয়েজদের যুগ শেষ। যা হয় তা এখন থেকেই জানুক। বড় হয়ে যে ঘেরাও হবে তার সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়বে বর্ণ-পরিচয়ে পড়েছি তো!"

"উ কী করবেন?"

"ভেরি ইজি। ঊর্ধ্ববাহু লাগাও স্লোগান। এটা স্লোগানের যুগ। মিছিলে যেতেই হবে। টিচাররাও মিছিল করে স্লোগান দিতে-দিতে কানু-সিধু-ডহরে যাচ্ছেন। ঋ-তে ঋষি কাপুর ফিট হয়ে গেছে। এর পরে আপনারা ঠিক করবেন। এমন জিনিস ফিট করুন, যা একালের।"

হেডস্যার দাড়ি খুলে ফেলেছেন। নির্মলস্যার বললেন, "তা হলে আমাদের এই পালাটার কী হবে?"

"বাতিল হবে। নতুন যুগের জন্যে নতুন পালা নিয়ে আসবেন।"

হেডস্যার মাথা নেড়ে বললেন, "ইয়েস স্যার!"

যোগীরাজ তপনদা স্টেজের ওপর ম্যাট পেতে খানিক যোগাসন দেখালেন এর পর। সভায় বয়স্ক যাঁরা ছিলেন, তাঁরা চিৎকার করতে লাগলেন, "ছোকরা অম্বল কিসে কমে!"

যোগীরাজ কম্বলের ওপর অম্বলের আসন দেখালেন। আমরা ঝিম মেরে বাসের আসনে বসে আছি। আচারদাদা সর্বস্ব খুইয়ে চুপসে গেছেন। কুমুদস্যার থেকে-থেকেই বলছেন, "লাভের মধ্যে এই হল, আমার এতকালের রুপোর নস্যির ডিবেটা লস্ট। লস্ট ফর এভার।"

হেডস্যার বললেন, "এতদিনে ধরতে পারলুম আমার কিসে অ্যালার্জি! জুটে। যেই গোঁফ-দাড়ি পরেছি, অমনই শুরু হয়েছে হাঁপানির টান। বাড়ি ফিরেই সব চটের ব্যাগ দূর করব। প্লাস্টিক। এজ অব প্লাস্টিক।"

হেডস্যার হাঁপাচ্ছেন! বুকে সাঁইসাঁই শব্দ।

নির্মলস্যার বলছেন, "এতদিনে বুঝলুম, কেন সবাই ইংলিশ মিডিয়ামের জন্যে পাগল! অ, আ, ক, খ-এ বহুত ঝামেলা। এ বি সি অনেক সিম্পল।"

pathagar.net

অন্ধকার পথ ধরে বাস চলছে। পেছনে কাগজের অজগরের খচরমচর শব্দ। ঈগলের তালপাতার ডানা ঘাড়ের কাছে খোঁচা মারছে।

শেষ মারটা মারলেন আমাদের আচারদাদা।

স্কুল কম্পাউন্ডে আমরা বাস থেকে নেমেছি, তখনও সোজা হয়ে ভাল করে দাঁড়াইনি, আচারদাদা বললেন, "স্যার! বিলটা তা হলে স্কুলের সেক্রেটারির নামেই হবে!"

"কিসের বিল?"

"দশ পেটি জ্যাম, জেলি, আচার, আর এক হাজার চামচে।"

হেডসারের দম একেবারেই আটকে গেল। বিল তখন মাথায়। যোগীরাজ পিঠের দু'পাশে চাপড় মারছেন। নির্মলস্যার চিৎকার করছেন, "ইনহেলার, ইনহেলার।"

SEP 2005

pathagar.net

রাত বারোটা

রাত বারোটা। ঝনঝন করে টেলিফোন বাজল। টেলিফোন আছে নিচের বৈঠকখানায়। আর আমি শুয়ে আছি দোতলায়, আমার শোবার ঘরে। পাশের ঘরে আমার মা। বাড়িতে আর তৃতীয় কোনো প্রাণী নেই। কেন নেই? সে অনেক কথা। ও সব শুনে কাজ নেই।

ফোনটা ছন্দে ছন্দে বাজছে।

পেঁচানো সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। চোরের মতো অন্ধকার ঘাপটি মেরে বসেছিল। আলো জ্বালতেই ছিটকে পালাল। দোতলা থেকে একতলায় নামতে বেশ ভয় করছিল। আমি তেমন সাহসী নই। রাত এগারোটা পর্যন্ত আমার ভয় করে না। তারপরেই কেমন গা-ছমছম। হঠাৎ কোনো দিকে তাকালেই মনে হয়, কেউ ছিল, সরে গেল। যত রাত বাড়ে তত ভয় বাড়ে। একদিন শুতে যাওয়ার আগে দাড়ি কামানোর জন্য আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিলুম। পরের দিন খুব ভোরে বেরোতে হবে, তাই কাজটা এগিয়ে রাখতে চেয়েছিলুম। আয়নায় সাবানের ফেনা মাখা আমার মুখ, আর দেখি কী, আমার কাঁধের পাশ থেকে উঁকি মারছে আর একটা মুখ। ঝাপসা থেকে স্পষ্ট হচ্ছে, স্পষ্ট থেকে ঝাপসা। এইরকম হতেই লাগল, হতেই লাগল। শুধু একটা মুখ। আমি ভয়ে কাঠ হয়ে গেলুম। চিৎকার করে মাকে ডাকতে চাইলুম। গলা দিয়ে কোনো স্বর বেরলো না। সেদিন আমি মরেই যেতুম যদি না আমার মা নিজে থেকেই আসতেন। সঙ্গে সঙ্গে মুখটা অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি তখন কুলকুল করে ঘামছি। ভয়ে মুখটা সাদা। সাবান মেখে আছি বলে বোঝা গেল না। টিকটিকির মতো থ্যাস করে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান। চোখ মেলে যখন তাকালুম, দেখি কী ডক্টর বসাক আমার ইসিজি করছেন। রাত্তিরবেলা, সেই থেকে আমি আয়নার সামনে দাঁড়াই না। কী দরকার বাবা, ঝামেলা করে। মাকে যখন বললুম, ব্যাপারটা কি হয়েছিল, হার্টে কিছু হয়নি, আমার পেছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছিল, আয়নায় আমি তার মুখ দেখেছিলুম। মা খুব সাহসী। এককথায় উড়িয়ে দিলেন, বললেন জানবি পেটটাই সব—মুড়ি আর ভুঁড়ি। পেট থেকেই সব আসে। অত ঘুগনি, ফুচকা, আলুর চপ খেলে, ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানো, সবই দর্শন হবে। দিনকতক শুধু লাউ খাওয়াব, কাঁচা দুধ দিয়ে শুক্তো।

আলো-আঁধারি সিঁড়ি দিয়ে নামছি নিচে। দোতলার আলোর আভায়

pathagar.net

যতটুকু দেখা যায়। আগে নিচে একটা পনেরো পাওয়ারের আলো সারারাত জ্বলত। পরপর দু'মাস হাজার টাকার বিল আসায় আলো এখন অন্ধকার।

নিস্তব্ধ মাঝরাতে ফোনের শব্দ বিরক্তিকর। নিশ্চয় রং নাম্বার। তুলতেই হবে, তা না হলে বাজনা থামবে না। বৈঠকখানার আলোটা জ্বালতেই অন্ধকার সব হুটোপাটি করে ফারনিচারের তলায় তলায় ঢুকে গেল। টেলিফোন যন্ত্রটাকে খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। যখন বাজছে, মনে হচ্ছে কাঁপছে।

রিসিভার তুলে বললুম, 'হ্যালো।'

ওপাশে কিঁচ করে একটা শব্দ হল। বরফের মতো ঠাণ্ডা একটা বাতাস যেন ভেসে এল এপাশে। এমন অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার কেন ঘটবে বুঝতে পারছি না। টেলিফোনে শব্দতরঙ্গ আসবে, বাতাস কেন আসবে! টেলিফোন কী ব্লোয়ার!

যাই হোক, এইবার বেশ বিরক্তির গলায় বললুম, 'হ্যালো।'

ওপাশে কাঠের চোয়াল নড়ার মতো একটা শব্দ হল।

আবার বললুম, 'হ্যালো।'

ভেসে এল অস্বাভাবিক একটা গলা, উচ্চারণ পরিষ্কার, কিন্তু শব্দটা অস্বাভাবিক। 'কে অমল?'

—অমল বলছি। আপনি কে?

—আমি প্রকাশ।

—কে প্রকাশ?

—প্রকাশ গাঙ্গুলি।

আর একটু হলেই আমার হাত থেকে রিসিভার পড়ে যেত।

—প্রকাশ গাঙ্গুলি মানে? ইয়ারকি হচ্ছে মাঝরাতে! প্রকাশ গাঙ্গুলি ফিরোজাবাদ রেল অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে কদিন আগে।

ধীর শান্ত উত্তর—জানি। সবাই জানে। ডেড বডি আমিও দেখেছি। অনেকক্ষণ পাহারা দিয়েছি, একা বসে বসে। তারপর সবাই এল। শনাক্ত করল। পোস্ট মর্টেম হল। ডেথ সার্টিফিকেট নিল, নিমতলায় দাহ হল। সবাই জানে, এ আর নতুন কথা কী! আমার মৃত্যুসংবাদ আমি জানব না!

মরা মানুষ ফোনে কথা বলে এমন কথা আমি শুনিনি। এসব বদমাইশি। মানুষকে ভয় দেখানো। মারা গেলে মানুষের আর কিছু থাকে না। সে আবার টেলিফোন করবে কী করে!

ওপার থেকে একটা হাসির শব্দ ভেসে এল। একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস। হাসির পরেই কণ্ঠস্বর। মনে হচ্ছে, কেউ যেন ইস্পাতের নলের ভেতর দিয়ে কথা বলছে—তোর কোনো ধারণা নেই অমল। মৃত্যুর পরে মানুষের আর কোনো বাধা থাকে না। যা খুশি তাই করা যায়। এখুনি আমি তোর সামনে

pathagar.net

গিয়ে দাঁড়াতে পারি ; কিন্তু তুই ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবি। আমি তোর প্রাণের বন্ধু ছিলুম, তবু তুই ভয় পাবি। আমার নাম শুনেই তুই কাঁপছিস। সামনে গিয়ে দাঁড়ালে কী হবে তোর ভালই জানা আছে।

—তুই কার ফোন থেকে কথা বলছিস ?

—পৃথিবীর সব ফোন এখন আমার। সব রেডিয়ো, টিভি স্টেশন এখন আমার। তোর রেডিয়োতে কলকাতা ক ধর, আমার গলা শুনতে পাবি।

—তোর ওখানে এখন দিন না রাত ?

—তোরা আলো আর কালো ছাড়া কিছু জানিস না। এ ছাড়াও একটা কিছু আছে এখানে না এলে বোঝা যাবে না। থাক, কাজের কথাটা বলে নি। ডানকুনিতে আমার বড়দি থাকে।

—জানি, তুই আর আমি অনেকবার তাঁর বাড়িতে গেছি।

—বেশ, এইবার শোন, তোকে একটা কাজ করতে হবে। দিদি আমাকে একটা হার দিয়েছিল। বলেছিল, বউবাজারে বিক্রি করে যা পাওয়া যাবে, সেই টাকাটা তাকে দিয়ে আসতে। তারা একটু অর্থকষ্টে আছে। হারটা আমি বিক্রি করে পাঁচহাজার টাকা পেয়েছিলুম। টাকাটা আমি দিয়ে আসতে পারিনি, তোকে সেই কাজটা করতে হবে।

—অত টাকা আমি পাব কোথায় !

—বলছি, বলছি, সব বলছি। একটু ধৈর্য ধর। টাকাটা তোকে চুরি করতে হবে।

—কোথা থেকে চুরি করব ! আমি চোর না কি ?

—ব্যস্ত হস না। মন দিয়ে শোন। আমাদের বাড়িতে যাবি। দেখবি সবাই শোকে কেমন হয়ে আছে। তুই একটু সান্ত্বনা-টান্ত্বনা দিবি। দিতে দিতে বলবি, মাসিমা, প্রকাশের কাছে আমার একটা ক্যাসেট ছিল। শোনার জন্য নিয়েছিল। সেটা আমি আবার আর একজনের কাছ থেকে চেয়ে এনেছিলুম। সে চাইছে। ক্যাসেটের র‍্যাকটা একবার দেখব ! যে-র‍্যাকে ক্যাসেট থাকে সেখানে যাবি। ডান দিক থেকে ষোল নম্বর ক্যাসেটটা টেনে বের করবি। দেখবি, খাপ আছে, ক্যাসেটটা নেই। পকেটে ভরে ফেলবি, ওদের সামনে খুলবি না। সোজা চলে আসবি বাড়িতে। এইবার খুলবি। দেখবি, দশটা পাঁচশো টাকার নোট ভাঁজ করা। এইবার দ্বিতীয় কাজ, ডানকুনিতে গিয়ে দিদির হাতে দেওয়া। বন্ধু হিসেবে এই কাজটা তোকে করতেই হবে। এইটাই কথা, আমার বাড়ির কেউ যেন না জানতে পারে।

—যদি ক্যাসেটে কিছু না থাকে।

—থাকবেই। কেবল গুনতে ভুল কোরো না। ডান দিক থেকে ষোল। ক্যাসেটের ইন-লে কার্ডটা আছে। মেহেদি হাসান। ঝট করে একবার দেখে নিয়ে পকেটে ভরবি।

pathagar.net

—তোকে জানাব কী করে ?

—আমি জানতে পারব। তবে দু'দিন মাত্র সময়, কারণ আমি ক্রমশই পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। এখন, আমি যে-বৃত্তে আছি সেখানে তোদের হাবল্ টেলিস্কোপটা ঘুরছে। কট্ করে একটা শব্দ হল, টেলিফোন নীরব। আমার মাথা ঘুরছে। মুখে কোন সাড় নেই, এত ঠাণ্ডা। ক্রায়ো সার্জারির টেম্পারেচার। এক কাপ চা, এক কাপ গরম দুধ—যা হয় একটা কিছু পেলে বেশ হত। প্রকাশের কথা ভেবে চোখে জল আসছে, কিন্তু ঝরছে না, কারণ আমার চোখ মুখ মাইনাস সাতশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে নেমে গেছে। কোন রকমে টলতে টলতে নিজের ঘরে ফিরে এলুম। শরীর কাঁপছে। শীতে না ভয়ে বুঝতে পারছি না। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে, বাল্বটা মুখের কাছে ধরে রইলুম বেশ কিছুক্ষণ। অদ্ভুত একটা কাণ্ড হল, হঠাৎ দু ভলক জল বেরিয়ে এল দুটো চোখ থেকে। বাল্বটা চিড়িক করে কেটে গেল।

॥ দুই ॥

সকাল দশটা। প্রকাশদের তালতলার বাড়িতে ঢুকছি। কেন জানি না কেবলই মনে হচ্ছে—আমি একটা চোর। উলটো দিকের ফুটপাত থেকে একটা কিশোর কণ্ঠ ভেসে এল—অমলকাকু। চমকে তাকালুম। অচেনা একটি বালক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। হঠাৎ দেখি, সে নেই। কী হল ! সাত সকালেই এমন চোখের ভুল। নেশা-ভাঙ করেছি না কি !

দোতলায় সকলের গলা পাচ্ছি। প্রকাশের মায়ের সঙ্গেই প্রথমে দেখা হল। মাসিমা আর আগের মত নেই। থাকা সম্ভবও নয়। আমার হাত ধরে খানিক কাঁদলেন। আমার চোখেও জল এল। ঘরে গিয়ে বসলুম। একথা সেকথার পর আসল কথাটা বললুম, 'মাসিমা, প্রকাশকে একটা ক্যাসেট দিয়েছিলুম শুনতে, সেটা আমি আবার এনেছিলুম অন্য একজনের কাছ থেকে। ওর ক্যাসেটের র‍্যাকটা দেখব !'

'হ্যাঁ দেখ না। তুমি তো এ বাড়ির সবই জান।'

যে তাকে ক্যাসেট সাজানো থেকে সেখানে গেলুম। প্রকাশ গান শুনতে খুব ভালবাসত। পরপর সব সাজানো। ডান দিক থেকে ষোল নম্বর। একটু আড়াল করে দাঁড়িয়েছি। ভয় করছে, যদি কেউ পাশে এসে দাঁড়ায়। সময়টা আমি ভালই নির্বাচন করেছি। প্রকাশের দাদা অফিসে বেরিয়ে গেছেন। বোন স্কুলে। টিচার। ফিরতে ফিরতে এগারোটা।

গুনছি, এক, দুই...। হঠাৎ একটা ক্যাসেট আপনিই বেরিয়ে এল। গুনে দেখলুম, সেইটাই ষোল। শরীরটা সিরসির করে উঠল। তার মানে, প্রকাশ আমার পাশেই রয়েছে। মনে হল, মাসিমাকে একবার বলি, প্রকাশ এই ঘরেই

pathagar.net

রয়েছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন না। বেরিয়ে আসা খাপটা ধরতে ভয় করছে। অশরীরীর আঙুল যদি আঙুলে ঠেকে যায়।

খাপটা হালকা। ঝট করে দেখে নিলুম, মেহেদি হাসান। সোজা পকেটে।

মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'পেলে বাবা!'

'পেয়েছি।'

'গান খুব ভালবাসত, খুব ভালবাসত গান।' বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন।

আমারও গলার কাছটা দলা পাকাচ্ছে। কোনো রকমে বলতে পারলুম, 'আসছি মাসিমা।' সিঁড়ি দিয়ে নামছি, কোথায় বেশ জোর গলায় একটা টিকটিকি শব্দ করল টিক টিক। অর্থটা বুঝতে পারলুম, বলতে চাইছে, ঠিক ঠিক।

কোথাও কোন সময় নষ্ট না করে সোজা বাড়িতে। ভয়ঙ্কর একটা উদ্বেগ। ভেতরে টাকাটা আছে তো! সিঁড়িতে উঠতে উঠতে খাপটা খুললাম। রয়েছে, ভাঁজ করা পাঁচশো টাকার নোট। দশটাই আছে। দম বন্ধ করে দিলুম। শ্বাস নিতে পারলুম।

এইবার দ্বিতীয় নির্দেশ। ডানকুনি যেতে হবে। আমার খাটের ওপর আজকের কাগজটা পড়ে আছে। এখানে তো থাকার কথা নয়! কাগজটা সকালে পড়ে নিচের ঘরেই রেখেছিলুম। স্পষ্ট মনে আছে। পড়ার পর কাগজ আমি এলোমেলো করে রাখি না। দেখছি, পাঁচের পাতাটা ঘুরিয়ে ওপর দিকে এনে ভাঁজ করা? আর যে সংবাদটা সবার আগে চোখে পড়ছে সেটা হল, গণধোলাইতে পকেটমারের মৃত্যু।

বুঝে গেলুম, এর পেছনেও প্রকাশের হাত। পকেটমার সম্পর্কে সচেতন করতে চাইছে। আমি একটু অন্যমনস্ক ধরনের ছেলে। গাছ, পাতা, পাখি, হাট, বাজার, মেলা দেখে বিভোর হয়ে যাই। তাই ডানকুনি যাওয়ার আগে সাবধান করে দিল।

বড়দির বাড়িতে যখন পৌঁছলুম, বেলা তিনটে। আমাকে দেখে ভূত দেখার মতো অবাক।

'তুমি হঠাৎ!'

'এই টাকাটা, প্রকাশ আমার কাছে রেখেছিল, আপনাকে দেওয়ার জন্যে।'

'প্রকাশ! তোমার কাছে!' এর বেশি আর কিছু বলতে পারলেন না, কাঁদতে লাগলেন।

'টাকাটা আজই আমার খুব দরকার। তোমার জামাইবাবু হাসপাতালে। কাল অপারেশন।' গয়নাটা কবে দিয়েছিলেন, টাকাটা কবে পেলেন, আমার

pathagar.net

কাছে ক'দিন ছিল, এসব প্রশ্ন এলে খুব বিপদ হত। কোনো উত্তর আমার জানা ছিল না।

'দিদি আমার খুব কাজ আছে। আবার আসব।'

আমি প্রায় পালিয়েই এলুম। ট্রেনে উঠছি। অচেনা এক ভদ্রলোক পেছন থেকে আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'ধন্যবাদ!'

চমকে ফিরে তাকালুম। কেউ নেই।

আজ ঠিক রাত বারোটা।

জেগে বসে আছি, টেলিফোন বাজবে কি!

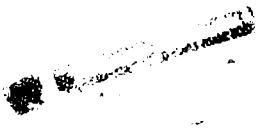

pathagar.net

অবতার

সাদা শর্টস, সাদা টি-শার্ট, সাদা মোজা, সাদা কেডস পরে বড়মামা দোতলা থেকে একতলায় নেমে এলেন। এই কিছুটা আগে ভোর হয়েছে। বাড়ির সব জায়গা থেকে অন্ধকার এখনো সরেনি। পরপর তিনটে খাঁচা ঝুলছে। কালো কাপড় ঢাকা। পাখিদের ঘুম এখনো ভাঙেনি। মেজমামা শিলে একটা নিমদাঁতন ফেলে নোড়া দিয়ে একটা মাথা থেঁতো করছেন। ভেতরে গেলেই দাঁত মাজা শুরু হবে। ব্রাশ ব্যবহার করেন না। দাঁতন দাঁতের স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিশয় উপকারী। খরচও কম। মেজমামা ক্রমশই কৃপণ হচ্ছেন। বুঝতে পারেন না। আমরা পারি। এখন সদাই বলেন, 'প্রত্যেক মানুষেরই কিছু সঞ্চয় প্রয়োজন। গ্রীষ্মের পরেই আসে বর্ষা।'

বড়মামা নাম রেখেছেন, 'স্মল সেভিংস।'

মেজমামা বড়মামার পায়ের শব্দে তাকালেন, 'বাবা! এ আবার কী! মর্নিং স্কুলে ভর্তি হলে বুঝি! কেজি ওয়ান!'

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'এই নতুন কাজের লোকটা কোথা থেকে এল রে! সকালেই বাটনা বাটতে বসে গেছে। শিল-নোড়া ভেঙে না ফেলে। যে ভাবে ঠুকছে! কত্তা আগে কোথাও কাজ করেছ? না এই বাড়িতেই প্রথম হাত পাকাচ্ছ?'

মেজমামার গায়ে লেগেছে। ফোঁস করে উঠলেন, 'দেখ বড়দা, তোমাকে আমি অপমান করিনি, তুমি কিন্তু আমাকে ইনসাল্ট করলে!'

'কাজের লোক বললে ইনসাল্ট করা হয়! কোন মানুষকে প্রশংসা করার সময় আমরা বলি না! লোকটা ভীষণ কাজের লোক!'

'তুমি সে ভাবে বলোনি! সে কাজের লোক আর এই কাজের লোক সম্পূর্ণ আলাদা। তুমি আমাকে চাকর বলেছ।'

'তুমি আমাকে শিশু বলেছ।'

'সরল শিশু, শিশুর মতো সরল এটা একটা ভয়ঙ্কর রকমের প্রশংসা। আমরা বলি লোকটা শিশুর মতো সরল। কত বড় গুণ!'

'তুমি সে শিশু মিন করোনি ভাই, তুমি বলতে চেয়েছ বুড়ো খোকা! তোমার এই সূক্ষ্ম খোঁচাটা না বোঝার মতো মোটা বুদ্ধি আমার নয়।'

'বেশ করেছি, যাও।'

pathagar.net

'আমিও বেশ করেছি যা।'

'বেশ করব বললেই করা যায় না।'

'তুমি বেশ করতে পারো আর আমি বেশ করতে পারি না?'

'আমি কী বেশ করেছি?'

'কেউই যদি কিছু করিনি তাহলে এত কথা আসছে কোথা থেকে?'

মাসিমা এসে গেছেন, 'বাপরে বাপরে বাপ, সাত সকালে এ কী আরম্ভ হল? দিন দিন বয়েস সব কমছে, না বাড়ছে? বলি, সব কচি খোকা হচ্ছ! কী নিয়ে হচ্ছে শুনি! দুটো হুলোর কী নিয়ে এই তর্জন গর্জন! আমার শিলে আবার তুমি নিম দাঁতন থেঁতো করছ! আবার বাসী কাপড়ে শিল ছুঁয়েচো?'

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে ফোড়ন কাটলেন, 'জাত-জন্ম, শুদ্ধাচার আর কিছুই রইল না।'

মাসিমা বললেন, 'থামো, তুমিই বা ওটা কী করছ?'

'কেন? আমি আবার কী করলুম! আমি তো জগিং করতে যাচ্ছি?'

'সে তুমি যাও, জুতো পরে তুলসীমঞ্চে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কোন্ আক্কেলে?'

মেজমামা সঙ্গে সঙ্গে জুড়লেন, 'এই অনাচারের জন্যেই এ-বাড়িতে তুলসী গাছ আর বাঁচতে চাইছে না। জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে।'

মাসিমা হুঙ্কার ছাড়লেন, 'তোমরা দুটোতেই আমার চোখের সামনে থেকে সরে পড়ো। তোমাদের দেখলেই আজকাল আমার হাড় পিত্তি জ্বালা করে। চামড়ার চটি পায়ে শিল ধরেছ তুমি? চটিতে নোড়াতে এক হয়ে আছে? কি সর্বনাশ।'

মেজমামা নোড়াটা পায়ের কাছে রেখেছিলেন, অতটা খেয়াল করেননি। অপরাধীর সাফাই গাওয়ার গলায় বললেন, 'কুসী এটা চামড়ার চটি নয়, স্যান্ডাক।'

বড়মামা তুলসীমঞ্চের কাছ থেকে সরে এসেছেন অনেকটা। বড়মামা বললেন, 'আফটার অল চটি ইজ এ চটি। সে চামড়ারই হোক আর ভেলভেট-এরই হোক, জাতিতে চটি।'

মাসিমা বললেন, 'তুমি ক্রমশ সরতে সরতে ওদিকে কোথায় যাচ্ছ? দেখেছ, পায়ের কাছে কী আছ?' বড়মামা তাকালেন, 'কী বলতো! কালো মতো কী যেন একটা রয়েছে!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, রয়েছে! ঠাকুরের বাসন মাজার তেঁতুল। একজন শিলের ওপর উঠে বসে আছেন, এইবার তুমি বাইশ-শো-বাইশ জুতো দিয়ে তেঁতুলটা পিণ্ডি চটকে দাও। তোমরা দয়া করে বিদেয় হও না।'

বড়মামা মনে হয় একটু বেশি স্মার্ট হওয়ার চেষ্টায় ছিলেন। উঠোন থেকে

pathagar.net

জগিং করতে করতে বাগান, বাগান থেকে রাস্তায়। প্ল্যানটা মনে হয় এই রকমই ছিল। জগিং শুরু করলেন, ধিনিক ধিনিক। মট করে শব্দ। একেবারে ছাতু। পায়ের চাপে ত্রিভঙ্গ মুরারী হয়ে গেল প্ল্যাস্টিকের চামচে।

মেজমামা বললেন, 'সব শেষ হয়ে গেল। মুকুজ্যে ফ্যামিলির স্থাবর অস্থাবর আর কিছু রইল না।'

বড়মামা আমাকে ইশারা করলেন, পালিয়ে আয়। ধীর লয়ে ছুটতে ছুটতে বাগানে। বাগানে গোলাপ ফুটেছে। গাছের সামনে দাঁড়িয়ে ফুল দেখতে দেখতে স্পট-জগিং। জগিং-এর একটা নেশা আছে, আমিও ধিতিং ধিতিং করছি। সেখান থেকে নাচতে নাচতে রাস্তায়।

পথ বাঁ দিকে মোড় নিয়ে সোজা চলে গেছে গঙ্গার দিকে। আমেরিকায় সবাই জগিং করে, মাইলের পর মাইল। আমেরিকার প্রেসিডেন্টও জগিং করেন। ওসব দেশের নিয়ম খুব কড়া। খাটো খাও। বেলা আটটা পর্যন্ত বিছানায় গড়াগড়ি। ঘুম যে আর ছাড়েই না। থ্যাসথ্যাসে শরীর। দেশের দরজা খুলে দূর করে দেবে-গেট আউট। লেজি লোকের নো প্লেস হিয়ার। বাঘের মতো শরীর চাই, সিংহের মতো সাহস, গণ্ডারের মতো গোঁ। হেলথ ইজ ওয়েলথ। বয়েস যত বাড়বে ব্যায়াম তত বাড়াতে হবে, তা না হলে খিলে জং ধরে যাবে। মাথা বোদা মেরে যাবে। শরীরে মোষের মতো চর্বি জমবে। সামান্য পরিশ্রমেই দরদর করে ঘামবে। একতলা থেকে দোতলায় উঠতে হাপরের মতো হাঁপাবে। রোজ রাতে বড়মামা আমাকে এক নাগাড়ে এইসব উপদেশ দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়েন। ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ নাসিকা গর্জন। বোধহয় স্বপ্ন দেখেন। কোন কোন দিন ঘুমোতে ঘুমোতেই বলে ওঠেন, তন্দুর, তন্দুর।

বড়মামা তন্দুরি রুটি আর মটন চাঁপ খেতে খুব ভালবাসেন। হাজির দোকান থেকে কিনে আনেন বড়মামার কম্পাউন্ডার অক্ষয়বাবু। হার্টের দিকে কিছু একটা ঝামেলা হওয়ায় এখন সেটা বন্ধ আছে। সেই কারণে খাওয়াটা মনে হয় স্বপ্নেই হয়। বড়মামার আর একটা প্রিয় খাদ্য চৌসা আম। একসঙ্গে দশ-বারোটা এক সিটিং-এ। পাতের পাশে আঁটির পাহাড়। বিহারের বালক নরেশ বড়মামার প্রিয় সেবক। সে-ই মাল সাপ্লাই দেয়। মাসিমার এইসব অসহ্য। রাক্ষুসে খাওয়া দেখলে মানুষের মনুষ্যত্ব সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ জাগে।

বালতিতে আম ভিজছে। বড়মামা হাঁকছেন, 'নরশুয়া, লাগাও ঔর একঠো।' মেজমামার পরিপাকশক্তি দুর্বল। ভাস্কর লবণ মুখে ফেলতে ফেলতে আতঙ্কের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। স্মরণ করিয়ে দেন, 'বেশি যদি খেতে চাও, তাহলে কম খাও।'

বড়মামা খপং খপং করে ছুটছেন, পেছনে আমি। আমার আবার আস্তে ছোটা আসে না। মাঝে মাঝে তরতরিয়ে এগিয়ে যাই। খেয়াল থাকে না।

pathagar.net

বড়মামা হিস্ হিস্ করেন। তখন দাঁড়িয়ে পড়ে স্পট জগিং। বড়মামা এগিয়ে আসেন। আবার সেই ফর্মেসান, বড়মামা আগে, আমি পিছে।

আড়াল থেকে আওয়াজ—'দেখ, দেখ আগে নাচছে কুমড়ো, পেছনে চালকুমড়ো। আগে যায় হাতি, পিছে যায় নাতি।'

বড়মামা ওই সব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে কান দিতেন না। কোনো ভালো কাজ, মহৎ কাজ করতে গেলে লোকে টিটকিরি দেবেই। সব কথায় কান দিতে নেই। নিজের কাজ করে যাও। এখন আর কিছু বলে না। তবে আমার খুব লজ্জা করে। আমার কী, আমি তো দৌড়তেই পারি। ছোট ছেলে। বড়মামা বিশাল এক মানুষ, তাঁর কী দৌড়ানো সাজে! পাছে বড়মামা একা হয়ে যান, তাই সঙ্গে আসা।

ঋষি বঙ্কিম রোড দিয়ে আমরা চলেছি। একটা বাড়ির দোতলার বারান্দায় এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বড়মামাকে দেখে চিৎকার করে উঠলেন, 'আরে ডাক্তারবাবু। একটু দাঁড়ান প্লিজ। ডাক্তারবাবু একটু দাঁড়ান প্লিজ।'

বড়মামার তো থামার উপায় নেই। লাফাতে লাফাতে, ধীরগতিতে সামনে এগোতে এগোতে বলতে লাগলেন, 'অসুখ বিসুখ সব পরে, দশটার সময় চেম্বারে।'

'জ্বরটা কিছুতেই যাচ্ছে না যে। রোজ ঠিক মাঝরাতে আসছে।'

'মেরে তাড়াতে হবে। আর ওষুধ নয়, এইবার চৌকিদার।'

'এটা একটা কথা হল ডাক্তারবাবু। বুঝিবে সে কিসে....'

আমরা অনেকটা এগিয়ে এসেছি, ভদ্রলোক মুখ ঝুলিয়ে যতটা সম্ভব উঁচু গলায় শেষ করলেন।

'কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।'

বড়মামা আমাকে বললেন, 'এত কিছুর সেন্টিনারি হয়, এই কথাটার সেন্টিনারি হওয়া উচিত।'

হঠাৎ একটি ছেলে আমাদের পাশে পাশে ছুটতে শুরু করেছে। ছোটা তো নয় জগিং। দুলকি চালে ঝুপুং ঝুপুং করে লাফাতে লাফাতে সামনে এগোনো। ছেলেটির বয়েস কুড়ি থেকে বাইশের মধ্যে।

ছেলেটি বলছে, 'প্রায় একমাস হল ডাক্তারবাবু, ওষুধ খাচ্ছি। অম্বল একটুও কমল না।'

'ভুগছ কত দিন?'

'বছর তিনেক।'

'তিন বছরের ব্যায়রাম এক মাসেই সেরে যাবে?'

'যা খাই, খাওয়ামাত্রই পেটটা ফুলে ওঠে। আর ঢেউ ঢেউ ঢেকুর।'

'একই ব্যাপার! আমারও তাই। পরশু ধোঁকা খেয়েছিলুম, আজও বসে আছে পেটে ঘাপটি মেরে।'

pathagar.net

'লিভারের কাছে টেরিফিক পেন।'

'টেন্ডার লিভার। সাইজে আনতে হবে।'

'মাথা! সব সময় মাথা ধরে আছে।'

'পেটটাকে ক্লিয়ার করতে হবে!'

'গাঁটে গাঁটে ব্যথা।'

'ইউরিক অ্যাসিড জমেছে।'

'পাগল হয়ে যাব ডাক্তারবাবু।'

'হতে পারলে ভালো। একমাত্র দাওয়াই। পাগলদের কোনো রোগ থাকে না।'

ছেলেটা আমাদের সঙ্গে অনেকটা চলে এসেছে। আমরা কেদার ব্যনার্জি রোডে পড়ে গেছি। সামনেই মোহনদার চায়ের দোকান। মোহনদা চামচে ফেলে বেরিয়ে এলেন। লাফাতে লাফাতে আসছেন।

'ডাক্তারবাবু! ধরে ফেলেছি। চেম্বারে যা ভিড়। সোনোগ্রাফি করিয়েছি।'

'বেশ করেছ। কিছুই পাওয়া যাবে না।'

'ঠিক বলেছেন।'

'ওটা গলব্লাডার নয়, কোলাইটিস।'

'উপায়!'

'দু'মাইল।'

'মানে?'

'মানে রোজ সকালে আমার সঙ্গে এই ভাবে দু' মাইল ধপরধাঁই।'

দেখতে দেখতে আমাদের দল বড় হচ্ছে। ডাক্তারবাবুর চলমান চেম্বার। একটু দৌড়তে পারলেই ফ্রি-অ্যাডভাইস। পেট, মাথা, বুক, গাঁট এই চার সমস্যার নাম মানুষ। ভোলাদার মিষ্টির দোকান। তিনিও বিশাল শরীর নিয়ে তাল রাখার চেষ্টা করছেন। সমস্যা একটাই, কিছুই তেমন খান না, কিন্তু ক্রমশই ওজন বাড়ছে। যৌবনের সেই ঝরঝরে চেহারা দেখলে চোখ ফেটে জল আসে। পঁয়ত্রিশে শরীরের যদি এই অবস্থা হয় তাহলে চল্লিশে তো গুজরাটি হাতি। প্রেসক্রিপশন একটাই—দু'মাইল।

বীরেন শাসমল রোডে পড়া গেল। বড়মামার ভীষণ সুনাম তল্লাটে। ভাল মানুষ, ভাল ডাক্তার।

হঠাৎ দেখা গেল উল্টো দিক থেকে হরিনাম সংকীর্তনের দল আসছে। এই রাস্তার ওপরেই পাঠবাড়ি। মহাভক্ত, বৈষ্ণব সাধকের সিদ্ধ সাধনক্ষেত্র। আজ মনে হয় কোনো অনুষ্ঠান! সংকীর্তন বেরিয়েছে। নাচতে নাচতে আসছেন সবাই—হরে কৃষ্ণ হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।

রাস্তা জুড়ে আসছেন সবাই স্রোতের মতো। আমাদের জগিং-পার্টি তো ভেদ

pathagar.net

করে যেতে পারবে না। নামের এমন গুণ, বড়মামার ভাব এসে গেছে। শর্টস, কেড্‌স, টি-শার্ট—দু'হাত তুলে নাচছেন তিনি। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। উদ্দাম নৃত্য। দলের পরিচালক যেন বড়মামাই। ভক্ত গলায় দুলিয়ে দিয়েছেন সাদা ফুলের গোড়ের মালা। খোল বাজছে জোড়ায় জোড়ায় উচ্চ রোলে।

বড়মামার পেছন পেছন দল নাচতে নাচতে এসে গেল আমার মামারবাড়ির বিশাল উঠোনে। আনন্দ নৃত্য, মহানৃত্য, হুঙ্কার, মহাভাবে মূর্ছা। মাসিমা, মেজমামা, নরশুয়া, কাজের লোকজন সকলেরই চক্ষু ছানাবড়া। প্রতিবেশীরা দলে দলে ছুটে আসছেন।

কেন্দ্রে হাফ প্যান্ট পরা বড়মামা ভাবে টলছেন। বৃত্ত সংকীর্তনের দল। এক একজন তিন-চার হাত লাফিয়ে উঠছেন। বড়মামা ভাব সম্বরণ করে বললেন, —'কুসি তোর তুলসীমঞ্চ অপবিত্র করেছিলুম, এইবার দেখ, আজ কত হরি মহাপ্রভু পাঠিয়েছেন। শুচি, অশুচি, সব মনে রে ভাই। বলো, প্রেমদাতা ? বড়মামার তুড়ি লাফ। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদের নৃত্য। গলার মালা দুলে দুলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছে।

বড়মামা হুঙ্কার দিলেন—'কুসি', ভক্তদের জন্যে ভোগের ব্যবস্থা করো। মহাভোগ।' চার জোড়া খোল, ছ'জোড়া করতাল, সঙ্গে সংকীর্তন, তেমনি নৃত্য। প্রায় পঞ্চাশজন। সারা উঠোনে কলরোল, মত্ত মাতামাতি, বাতাসার হরির লুঠ। মেজমামা ভয়ে একেবারে তিনতলায়। মাসিমা হতভম্ব।

E I SEP 2005

বেশ বেশি রাতে সব মিটে যাওয়ার পর মাসিমা ক্লান্ত শরীরে বৈঠকখানার চেয়ারে কিছুক্ষণ এলিয়ে থেকে বললেন, 'বড়দা, তোমাকে আমরা এতদিন চিনতে পারিনি। তুমি হলে অবতার। আজ একেবারে ভক্তির ধারা বইয়ে দিলে। কোথা দিয়ে যে কী হয়ে গেল !'

মেজমামা বললেন, 'চিনতে পেরেছিস তো। ইনি হলেন যবন হরিদাস। মামলেট আর মালপো, পলান্ন আর পায়েস দুটোই চলে।'

বড়মামা তেড়েফুঁড়ে উঠলেন, মাসিমা করুণ মুখে বললেন, 'আজ থাক না, অনেক রাত হয়েছে। দুজনেই একটু তাঁর চিন্তা করো না। বলো, প্রভু ! আমাদের একটু মানুষ করো।'

দুই মামা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন, 'আর মানুষ হতে চাই না, তাহলেই অমানুষ হয়ে যাব।'

ঘড়ি বাজছে। এক, দুই...বারো।

pathagar.net

মহাপ্রস্থান

এখন দু'জনকেই সামলানো দায়। মাসিমা শ্বশুরবাড়িতে। দুই মামার পোয়া বারো। যখন যা প্রাণ চাইছে, তাই করছেন। আজ ভোর চারটেয় ঘুম ভাঙছে, তো কাল দশটায়। রোজ রাত বারোটার আগে কারো খাওয়ার ইচ্ছেই করে না। তারপর রাত দুটো-আড়াইটে পর্যন্ত গজর গজর। চোরেরা এই বাড়িটাকে তাদের লিস্ট থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে।

দু'জনের এখন খুব ভাব। মাসিমা যখন ছিলেন, তখন কথায় কথায় লেগে যেত। এখন একেবারে হরি-হর আত্মা। এ বলছে মেজো, তো ও বলছে, বড়। পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজই হয় না। বাড়িতে যিনি রান্না করেন, বামুনদি, তিনি যদি জিজ্ঞেস করেন, বড়দা, আজ কি রান্না হবে! বড়দা অমনি বললেন, দাঁড়াও মেজোকে জিজ্ঞেস করি। এইবার বড়তে, মেজতে আধঘণ্টা শলা-পরামর্শ হবে। দু'জনেরই পছন্দের খাবারের বিরাট লিস্ট হবে, দশ-বারোটা পদ। তারপরে দেখা যাবে, খাওয়ার সময় দু'জনেই বেপাত্তা। মেজো কলেজ স্ট্রিটের পুরনো বইয়ের দোকানে, সিন্ধু সভ্যতার ইতিহাসে মশগুল। বড় ডাক্তার, তিনি কোনো গোপ্পে রুগির বাড়ি, নাড়ি টিপে, মাছ ধরার গল্প করেই যাচ্ছেন, করেই যাচ্ছেন। ঘড়ি, সময়, দিন, রাত, এ-সবের কোনো তোয়াক্কা নেই।

মেজমামা যদি একবার ক্রশওয়ার্ড নিয়ে বসেন, হয়ে গেল। পাশে তিনখানা ডিকশেনারি। বড়মামা যদি মেডিকেল জার্নাল নিয়ে বসেন, রাত কাবার।

মাসিমা থাকলে, এই সব চলত না। এতটা বাড়াবাড়ি তিনি সহ্য করতেন না। কাগজ-পত্র ছোড়াছুড়ি করে, চিৎকার-চেঁচামেচি করে, আলো নিবিয়ে দু'জনকেই মশারির মধ্যে। সবশেষে বলতেন, দেখি, কে ফার্স্ট হয়। মানে, কে আগে ঘুমোয়, বড়ো না ছোট। মেজমামাই ফার্স্ট হতেন। বালিশ মাথা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাপরের মতো শ্বাস-প্রশ্বাস। বড়মামা সহজে ঘুমোতে পারেন না। এপাশ, ওপাশ, চিৎ, উপুড়। আমি বড়মামার পাশেই শুই। সবশেষে আমার সঙ্গে দুষ্টুমি। এই কাতুকুতু দিচ্ছেন। এই চিমটি কাটছেন। শেষে বিরক্ত হয়ে আমাকে বলতে হত, মাসিমাকে ডাকব?

মাসিমার ভয়ে বড়মামা লক্ষ্মীছেলের মতো ঘুমিয়ে পড়তেন।

এখন মাসিমা তো নেই। কাকে ডাকব শাসন করার জন্যে। বল্গাহীন উৎপাত। রাত ঠিক একটা। আমাদের খাওয়া শেষ হল। পাড়ার লোকে এখন

pathagar.net

মাঝরাত্তির। খাওয়া মানে যে-সে খাওয়া নয়। চর্বচষ্য-লেহ্যপেয়। দু'জনেই এখন দোতলার দক্ষিণের বারান্দায়। ইজি চেয়ারে একটু বিশ্রাম করছেন। সামনে গাছ-পালা, ফাঁকা মাঠ, দূরে একটা ঝিল। ঝিলের কিছুটা দূরে রেল লাইন। একটা ট্র্যানসমিশান টাওয়ার। মাথার ওপর লাল আলো। আরো দূরে একটা বড় ফ্যাকট্রি—অন্নপূর্ণা রোলিং মিল। দিন রাত কাজ হয়। দক্ষিণের বাতাসে শব্দ ভেসে আসছে। লোহার রড তৈরির ঝড়াং ঝড়াং শব্দ। যে-সব নক্ষত্রমণ্ডলী আকাশের মাথায় ছিল, তারা সব পশ্চিমে ঢলতে শুরু করেছে। আমিও একপাশে বসে বসে ঢুলছিলুম।

হঠাৎ কানে এল বড়মামা বলছেন, 'কাজটা ঠিক হচ্ছে না।'

মেজমামা গম্ভীর গলায় অভিভাবকের মতো বললেন, 'ঠিক করে করার চেষ্টা কর।'

বড়মামা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন কাজের কথা বলছি বল তো।'

'যে কোনো কাজ, এনি ওয়ার্ক, ঠিক করে করা উচিত। মনে নেই, সেই কোন ছেলেবেলায় আমরা পড়েছি, কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার। পাঁচজনে পারে যাহা, তুমিও পারিবে তাহা।' মেজমামা হাঁউমাউ করে হাই তুললেন।

বড়মামা বললেন, 'কিস্যু বোঝোনি। আমি বলছি, এত রাতে, এত খাওয়াটা ঠিক নয়। প্রথমত নটার মধ্যে খাওয়া উচিত।'

'শিশুরা খাবে। বড়দের জন্যে সময় অনেকটা বাড়ানো আছে।'

'দ্বিতীয় কথা, রাতের খাওয়া হবে লাইট। ভেরি লাইট।'

'ইন্ডিয়ান নিয়ম। আমেরিকান নিয়ম উলটো। দিনে লাইট, রাতে হেভি। বেশ জমিয়ে, গুছিয়ে, কবজি ডুবিয়ে খাওয়া।'

'স্বাস্থ্যের তৃতীয় নিয়ম, আফটার সাপার ওয়াকএ মাইল।'

'নিয়ম বদলে গেছে। এখন বলছে, খাওয়ার পরই অজগর হয়ে যাও। টেনে ঘুম।'

বড়মামা আক্ষেপের গলায় বললেন, 'কিন্তু ভাই দিন দিন ভুঁড়ি বাড়ছে। এই রেটে বাড়লে, সবাই বলবে, কুমড়ো পটাশ।'

'মোটার জন্যে তুমি স্কিপিং করতে পার।'

'এই শরীরে স্কিপিং! একমাত্র চাঁদে গেলে আমার পক্ষে স্কিপিং সম্ভব। সেখানে গ্র্যাভিটি নেই।'

মেজমামা বললেন, 'খুব আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে।'

'সে তো হচ্ছেই। অকারণে এত খাওয়া। এর হাফ খেলেই আমাদের হয়ে যায়!'

'আমি সে-ক্ষতির কথা বলছি না। আমি বলছি, সমস্ত জমা-প্যান্ট ছোট হয়ে যাচ্ছে সপ্তাহে সপ্তাহে।

pathagar.net

'এ তো আমারও সমস্যা। আমি প্রবলেম সল্‌ভ করে ফেলেছি।'

'কি ভাবে করলে ? ইলেকট্রনিকস দিয়ে ?'

'আরে না রে বাবা। মাদ্রাজি কায়দায়। ধুতি দু-ভাঁজ করে লুঙ্গির মতো করে পরছি। ভুঁড়ি তুই কত বাড়বি বাড়।'

মেজমামা বললেন, 'ওটা কোনো সলিউশান হল না। আমি কি ভাবছি জান, চলো আমরা পাহাড়ে যাই, একেবারে হিমালয়ে।'

বড়মামা লাফিয়ে উঠলেন, 'আঃ, একেবারে আমার মনের কথা। ছেলেবেলা থেকেই আমার খুব ইচ্ছে, এভারেস্টে উঠব, সাউথ কল দিয়ে।'

'আর আমার কি ইচ্ছে জান, মহাপ্রস্থানের পথ ধরে হিমালয়ে যাব। নো বাস, নো ট্রাম।'

'বেশ, তাহলে চলো, বেরিয়ে পড়া যাক। আমি এভারেস্ট। তুই মহাপ্রস্থান।'

আমার ঘুম ছুটে গেল। রাত দুটোর সময় এরা বলে কী। আর এদের আমি চিনি। বলা মানেই করা। আমি বললুম, 'আমাকে একা ফেলে রেখে তোমরা চলে যাবে ?'

বড়মামা বললেন, 'তুই এটা ভাবলি কী করে ? তোকে ফেলে রেখে চলে যাব ! তুইও যাবি আমাদের সঙ্গে।'

'তোমার তিনটে জার্সি গরু, দশটা দশ জাতের কুকুর, তিন খাঁচা পাখি তাদের কে খাওয়াবে ?'

বড়মামা একগাল হেসে বললেন, 'সে কি আর আমি ভাবিনি ভাগ্নে। অনেক ভেবে মাথা থেকে প্ল্যান বার করেছি। কোনো ক্যাটারিং কোম্পানিকে বলব, তারা এসে খাইয়ে যাবে। গরুদের দেবে জাবনা, কুকুরদের মাংস, ভাত। পাখিদের দানা।'

মেজমামা সন্দেহ প্রকাশ করলেন, 'এরকম কোনো ক্যাটারার আছে বলে মনে হয় না।'

বড়মামা বললেন, 'খোঁজ নেবো।' আধুনিক পৃথিবীতে সবই থাকে।'

আমি বললুম, 'মাসিমাকে রিকোয়েস্ট করলে কেমন হয়। যদি এসে কয়েকদিন থাকেন।'

বড়মামা, মেজমামা, দু'জনেই হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'খবরদার, খবরদার। কোনো ভাবে যেন জানতে না পারে, তাহলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।'

॥ দুই ॥

ভোরবেলা হরিদা এসে হাজির। আমাদের পুরনো কাজের লোক। কী কারণে যেন অনেকদিনের জন্যে দেশে চলে গিয়েছিলেন। আমরা তাঁর আসার

pathagar.net

আশা ছেড়েই দিয়েছিলুম। হঠাৎ বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে হাসতে হাসতে প্রভাতসূর্যের মতো উদয়। তাঁকে দেখে বড়মামা আর মেজমামার কি উল্লাস। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে দু'জনের ধেই ধেই নৃত্য। সঙ্গে অসাধারণ গান:

In you catch a chinchilla in chile
And then cutoff its beard. willynilly.
With a small rajor blade.
You can say that youv'e made
A chilean chinchilla's chinchilly.

এক রাউন্ড নাচের পর বড়মামা হরিদাকে জড়িয়ে ধরলেন:

'হরিদা! বাবা কেদারনাথ তোমাকে পাঠিয়েছেন। তুমি কোনো স্বপ্ন পেয়েছ?'

'স্বপ্ন নয়, আদেশ পেয়েছি। আমাদের বুড়োশিবতলার বেলগাছের মাথা থেকে ভর সন্ধেবেলা কে যেন গম্ভীরগলায় হেঁকে বললেন, 'হরে, ওরা বিপদে পড়েছে, শিগগির ছুটে যা। ছেলে দুটোকে সেভ কর।'

'বাবা মহাদেবের আদেশ। তবে ইংরিজিটা না বললেই পারতেন।'

'উনি ইংরিজিটা বলেননি, ইংরিজিটা আমার।'

'হ্যাঁ, তাই বলো।'

বেলার দিকে মেজমামা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন, রেল অফিস। টিকিট কাটতে। দুন এক্সপ্রেসে হরিদ্বার। হরিদ্বার থেকে ঋষিকেশ হয়ে হিমালয়। রুদ্রপ্রয়াগ, দেবপ্রয়োগ। রুট আমাদের তৈরি। দু'জনেই ঠিক করেছেন, মহাপ্রস্থানের পথ ধরেই এগোবেন। যতদূর যাওয়া যায়। পথের শেষে সত্যিই যদি স্বর্গ থাকে, তাহলে দরজাটা ঠেলে দেখে আসবেন, ভেতরে কতবড় বাগান, ফোয়ারা, ইন্দ্রপুরী! স্বর্গে মানুষ কী খায়। বড়মামার ধারণা, সবাই সেখানে রকম রকম আইসক্রিম খায়, স্ট্রবেরি, ভ্যানিলা, চকোলেট। বরফে গর্ত করে কামধেনুর দুধ আর চিনি ঢেলে দিলেই কুলফি মালাই।

সাতদিন পরেই আমরা তিনজন হরিদ্বার। হর কি পৌরিতে গঙ্গার ধারে তোফা বসে আছি। গঙ্গা বহে চলেছেন হর হর শব্দে। সত্যি কি জায়গা! বড়মামা প্রায় ধ্যানস্থ অবস্থায় ঘোষণা করলেন, 'আমি আর মর্তে ফিরব না।'

মেজমামা বললেন, 'এইটা তোমার স্বর্গ?'

'এইই হল স্বর্গের চৌকাঠ। কাল আমার আরো আনন্দের দিন। লছমনঝুলা পেরিয়ে সোজা চলে যাব সেই জায়গায় যেখানে মৃত্যু নেই, দুঃখ নেই, ভোট

pathagar.net

নেই, বোমা নেই, হিন্দি সিনেমা নেই। সেখানে অনন্ত যৌবন। জলে জন্ডিস নেই, আন্ত্রিক নেই, অ্যান্টিবায়োটিক নেই।'

মেজমামা বললেন, 'ওখানে কাটলেট নেই, চিলি চিকেন নেই, ফ্রায়েড প্রন নেই।'

'মেজ! তোর এখনো ভোগে এত মতি! ভোগই দুর্ভোগের কারণ। বিচার কর। কাটলেটে কি আছে! এক টুকরো মাংস। সেটা কি মাংস, কেউ জানে না, কুকুর হতে পারে, ধেড়ে ইঁদুর হতে পারে, সেটাকে কিমা করে, ময়দা দিয়ে বেঁধে, ডিম গোলায় চুবিয়ে লেড়ো বিস্কুটের গুঁড়ো মাখিয়ে শূকরের চর্বিতে ভাজা। ভাবলেই পেট গুলোয়। চিলি চিকেনে কি আছে। দীন-হীন-অসহায় একটা মুরগিকে শুধু হত্যা করেনি, নৃশংস এক রাঁধুনী তাকে নুন আর লঙ্কায় চুবিয়েছে। আর ফ্রায়েড প্রন! চিংড়ি হল জলের পোকা। পচা চিংড়ির গন্ধে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাহলে বুঝলে ব্যাপারটা! ভোজ মানে হিংসা, হত্যা, বদহজম, দুর্ভোগ। আমাদের এই বয়সে দুটো জিনিসের প্রয়োজন, ত্যাগ আর সংযম।'

মেজমামা আমতা আমতা করে বললেন, 'আমি তো তোমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট।'

'আরে তাতে কী হয়েছে, যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন। পঁয়তাল্লিশ আর পঞ্চাশ একই ব্যাপার। ফটি তো ক্রশ করেছে।'

॥ তিন ॥

আমার মামাদের থেকে থেকেই খুব খিদে পেয়ে যায়।

বেশ বসেছিলুম প্রবাহিনী গঙ্গার ধারে। যত রাত বাড়ছে চারপাশে তত লোক বাড়ছে। ভজন হচ্ছে। কথকতা হচ্ছে। কত আলো, কত ভক্তি। এরই মাঝে বড়মামা হঠাৎ বললেন :

'আর বসে থাকা যায় না। পেট চোঁ-চাঁ করছে।'

মেজমামা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আমারও একই অবস্থা। ছুঁচো ডন মারছে পেটে।'

বড়মামা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর কী অবস্থা?'

'আমি খিদে টিদে ভুলে গেছি। মনে হচ্ছে, সারা রাত এইখানে বসে থাকি।'

বড়মামা বললেন, 'আহা! অত কথা তোকে কে বলতে বলেছে? খিদে পেয়েছে কী না।'

'অল্প, অল্প।'

'তাহলে চলো। আর দেরি কেন?'

যে হোটেলে আমরা কদিন ধরে খাচ্ছি, তার সবই ভাল, বেশ পরিষ্কার,

pathagar.net

ধবধবে সাদা দেরাদুন চালের ভাত। সমস্যা একটাই, সেটা হল তরকারি। লাল রঙের বদখত একটা জিনিস। সবজিটা কী বোঝা মুশকিল—না আলু, না রাঙালু। মেজমামা নাম রেখেছেন, গজালুর তরকারি। ভাতকে গলায় চালান করার একমাত্র সহায়, পাঁপর।

মেজমামা খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'এ বেশ হয়েছে ভালো, সকালে গজালু, রাতে গজালু, শয়নে গজালু স্বপনে গজালু। সর্বং গজালুময়ং জগৎ।'

বড়মামা বললেন, 'এই ভাবেই মানুষের বৈরাগ্য আসবে ভাই। চলো, শুয়ে পড়া যাক। কাল অতি ভোরে ঊষাকালে আমাদের মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা।'

আমাদের নিবাসের ঠিক তলা দিয়ে গঙ্গা বয়ে চলেছেন 'হর হর' শব্দে। সেই সঙ্গীত শুনতে শুনতে ঘুম এসে গেল এক সময়। স্বপ্ন দেখলুম, তুষারমৌলি হিমালয়। মাথার ওপর চিল উড়ছে।

সাতসকালে মালাই দেওয়া চা খেয়ে যাত্রা শুরু হল। আমরা যেন সন্ন্যাসী। হাতে কম্বল, কমণ্ডলু, লাঠি। মামাদের পরিধানে আলখাল্লা। মাথায় সন্ন্যাসীদের টুপি। একটু বাড়াবাড়ি হলেও, দেখাচ্ছে সুন্দর। দু'জনের চেহারাই তো খুব সুন্দর। সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন। কেউ কেউ মনে হয় শিষ্য হবার বাসনা করছেন মনে মনে।

লছমনঝুলায় এসে আমাদের হাঁটা শুরু হল। গীতাভবনে সেই রাতের মতো যাত্রাবিরতি। কলকাতায় বসে ভাবাই যায় না পৃথিবীটা এত সুন্দর। পাহাড়ের পর পাহাড়। প্রবাহিত অলকান্দা। শীত শীত বাতাস। ধুলো নেই, ধোঁয়া নেই, সন্ন্যাসীরা ঘুরছেন। আশ্রমের পর আশ্রম। কোথাও বেদগান, কোথাও রামনাম। এই তো স্বর্গ।

এক বাঙালি ভদ্রলোক সেই থেকে সমানে বক বক করছেন, হাঁটাপথে যাবেন না বাসে যাবেন। ভদ্রলোক হিমালয় বিশেষজ্ঞ। কলকাতায় ফিরে গিয়েই আবার ছুটে আসেন হিমালয়ে। মহা আকর্ষণ।

বড়মামা বললেন, 'মশাই! বাস, ট্রাম তো জীবনে চাপলেন অনেক, পদযাত্রীদের পথে চলুন না একবার। সেটাও তো অ্যাডভেঞ্চার!'

'গাইড ছাড়া পারবেন যেতে?'

'পথই তো গাইড! পথই পথ দেখাবে।'

ভদ্রলোকের নাম, রবীন্দ্রচন্দ্র দত্ত। হাটখোলার জমিদার বংশের ছেলে। প্রচুর পয়সার মালিক কিন্তু অমায়িক। বিনয়ী। বিষ্ণুচরণ ঘোষের আখড়ায় ব্যায়াম করতেন। সুন্দর স্বাস্থ্য।

মেজমামা একটু তাতিয়ে দিলেন, 'এত সুন্দর চেহারা আপনার। আপনি ভয় পাচ্ছেন! বিপদই তো পদে পদে ভয় পাবে আপনাকে দেখে।'

pathagar.net

রবীনবাবু বললেন, 'ভয়ডর আমার নেই। আমি যৌবনে একবার সিদ্ধান্ত করেছিলুম বাঘের সঙ্গে লড়াই করব। মুখার্জিবাবুর সার্কাসের একটা বাঘও ঠিক করা হয়েছিল। লড়াইটা হবে পার্কসার্কাসের ময়দানে। শেষ পর্যন্ত ক্যানসেল হয়ে গেল।'

বড়মামার ছেলেমানুষের মতো আগ্রহ, 'কেন, কেন, ক্যানসেল হল কেন? লাস্ট মোমেন্টে ভয় পেয়ে গেলেন!'

'না না ভয় পাব কেন? টাকার জন্যে হল না। একটা বড় সাইজের বাঘের দামে দুলক্ষ টাকা। প্রফেসর মুখার্জি বললেন, রবীনবাবু আপনার সঙ্গে লড়াই মানেই বাঘটার মৃত্যু। দু'লক্ষ টাকা চোট। আমি বললুম, প্রফেসর মুখার্জি, যদি আমি মারা যাই। ভদ্রলোক অম্লান বদনে বললেন, আপনার আর কীই বা দাম! আপনার ওজনের একটা ছাগল হলেও না হয় কথা ছিল। কেটে ঝুলিয়ে দিলেই ষাট টাকা কেজি। কথা শুনুন! অসভ্য, ইতর।'

মেজমামা বললেন, 'কথাটা অপ্রিয় হলেও অতিশয় সত্য। মানুষের কোনো মূল্য নেই।' দত্তমশাই প্রতিবাদ করলেন, 'মানতে পারলুম না আপনার কথা। আইনস্টাইন, ওপেনহাইমার, ফেনম্যান, ফ্লেমিং, রাসেল, সক্রেটিস, এঁদের দাম নেই!'

'ওই রকম হতে পারলে দাম আছে, তা না হলে এক কানাকড়িও দাম নেই।' দত্তমশাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ন্যায্য কথা। আসলে কি জানেন, একবার জন্মে গেলে মরতে ভীষণ ভয় করে। ওটা তো আমাদের কাছে বেপাড়া ওপাড়ায় কি আছে কে জানে। বিশাল বিশাল উনুন, বিরাট বিরাট কড়া, সেই কড়ায় ফেলে হয়তো ফুলুরি ভাজার মতো ভাজবে।' মেজমামা এক ধমক লাগালেন, 'থামুন মশাই, একটা শিক্ষিত লোক হয়ে এই সব ভাবেন কী করে। একটা বেলুনের ভেতর কি থাকে?'

'হাওয়া।'

'এক একটা মানুষ এক একটা বেলুন। হাওয়াটা বেরিয়ে গেলেই চুপসে গেল। হাওয়ার মানুষ হাওয়াতেই মিশে গেল। যা বলবেন বুঝেসুঝে বলবেন, আপনি এখন আর কচি খোকাটি নন। নিন উঠুন। অনেক কথা হয়েছে, এইবার এনার্জি স্টোর করে নিয়ে বেরোতে হবে।'

কিছুটা পথ আমরা বাসে এলুম। ভয়ঙ্কর পথ। স্টিয়ারিং সামান্য এদিক ওদিক হলেই হাজার ফুট খাদে ধপাস। আমরা একটা জায়গায় তিনজন নেমে পড়লুম। কন্ডাকটার জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে নামছেন? যাবেন কোথায়? এখানে থাকার কোনো চটি নেই।'

মেজমামা উত্তরে বিজ্ঞের মতো হাসলেন।

pathagar.net

এই চটি শব্দটাই দত্তমশাইকে ভাবিয়ে তুলল। বাসটা চলে যেতেই দত্তমশাই শুরু করে দিলেন, 'হ্যাঁ মশাই, কাজটা কি ভাল হচ্ছে। চলতে, চলতে রাত তো হবেই, তখন আমরা থাকব কোথায়! চটি নেই তো!'

বড়মামা দার্শনিকের মতো বললেন, 'তিনি সেখানে রাখবেন সেইখানেই থাকব। তেমন হলো গাছতলা তো আছেই।'

দত্তমশাই বললেন, 'বাঘও তো আছে'।

মেজমামা বললেন, 'থাকলেই বা, ভয় কী, আপনি তো আছেন। রেওয়ারিশ বাঘের সঙ্গে লড়ে যাবেন, লাখটাকা লাগবে না।'

দত্তমশাই নিজের প্যাঁচে পড়ে ঢোঁক গিললেন।

কিছুদূর যাওয়ার পর এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা। বড়মামা তাঁর ভয়ঙ্কর হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'মহাপ্রস্থানের পথ কোনটা!'

সন্ন্যাসী অবাক হয়ে কিছুক্ষণ থমকে থেকে পরিষ্কার বাঙলায় বললেন, 'এখানে তো সবই মহাপ্রস্থানের পথ বাবা, একটু অসাবধান হলেই খাদে পতন ও সশরীরে স্বর্গে গমন। তবে হ্যাঁ, সেকালের তীর্থযাত্রীরা যে হাঁটাপথে কেদারে যেত, সেটা ওই বাঁ দিকে। ওপথে আজকাল আর কেউ যায় না। তোমরা যাবে না কি।'

মেজমামা টপ করে একটা প্রণাম করে বললেন, 'আশীর্বাদ করুন।'

সন্ন্যাসী একটু সন্দেহের চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে থেকে নিজের পথে চলে গেলেন।

দত্তমশাই বললেন, 'ঠিক আছে, মরতে যদি হয় তো মরব। আর আমি ভাবতে পারছি না। চলুন তো মশাই। আমার এইবার রোখ চেপে গেছে।'

তিনি তরতর করে এগিয়ে চললেন, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বলিষ্ঠ মানুষ। প্রায় ছ'ফুট লম্বা। টকটকে ফর্সা। ডানদিকে পাহাড়ের দেওয়াল, বাঁ দিকে সুঁড়ি পথ। ভাঙা-চোরা। বড়, ছোট পাথর ছড়ান। পাহাড়ের গা বেয়ে বৃষ্টির জল গড়াতে গড়াতে সরু সরু নালি তৈরি হয়েছে। বাঁ দিকের গভীর বন। দিনের বেলা, তাও ঝিঁঝিঁর ডাকে কান পাতা যায় না।

আমি সবার আগে নাচতে নাচতে চলেছি। বেশ ঠাণ্ডা, তাই কোনো কষ্টই হচ্ছে না। ভয় তো হচ্ছেই না। দিনের বেলা আবার ভয় কিসের। রাত আসুক দেখা যাবে। আমার দুই মামা থেকে থেকেই বলছেন, ওয়ান্ডারফুল, একস্ট্রা অর্ডিনারি, জীবন ধন্য। মরি যদি সেও ভালো। দত্তমশাই নিজেকে সাহস দেওয়ার জন্যে গান ধরলেন। আমি ভয় করব না ভয় করব না।

হঠাৎ আমাদের মনে হল, ব্যাপারটা কী। আমরা চারজন ছাড়া কোথাও কোনো জনপ্রাণী নেই, এদিকে সন্ধে হয়ে আসছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। লোকালয় বলে কিছু নেই। তার ওপর বাঁ দিকের জঙ্গল হঠাৎ অনেকটা নিচে চলে গেল।

তা প্রায় হাজার ফুট নীচে। সামনে ভাঙাচোরা পায়ে চলা পথ। খুবই সরু। একটু অসাবধান হলেই বাঁ দিকের গভীর খাদে। অন্ধকার ঘন হচ্ছে, পথের আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বড়মামার পাঁচ সেলের টর্চ এই বিশাল অন্ধকারের রাজত্বে দেশলাই।

বড়মামার চিন্তিত গলা পাওয়া গেল, 'মেজ আমরা এখন নো ম্যানস ল্যান্ডে। একেই বলে হর্নস অফ ডাইলেমা, এগোবো না পেছাবো।'

মেজমামা বীরের মতো বললেন, 'পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ভীরুরা। আমরা সাহসী, করেঙ্গে ইয়ে...' মেজমামা অদৃশ্য। বহু নিচে থেকে শোনা গেল, 'মরেঙ্গে'।

দত্তমশাই বললেন, 'যাঃ, আপনার মেজ ভাই গনফট। তলিয়ে গেছে'। বড়মামা বলেন, 'তলিয়ে গেছে মানে?'

'মানে, সামনে আর তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন? তিনি মহাপ্রস্থানে গেলেন। সামনে আর রাস্তা নেই, বিশাল খাদ। তিনি আত্মবলিদান করে আমাদের বাঁচালেন।'

বড়মামা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'মেজো মারা গেল?'

আমি ভাঙা পথের ওপর শুয়ে পড়ে মুখ ঝুলিয়ে থকথকে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ডাক ছাড়লুম, 'মেজোমামা?'

অনেকটা নিচে থেকে উত্তর এল, 'ফাসক্লাস আছি, জায়গাটা বেশ মনোরম। অনেকটা নিচে একটা নদী বইছে মনে হয়। জলের আওয়াজ পাচ্ছি।'

বড়মামাও আমার পাশে শুয়ে পড়ে মুখ ঝুলিয়ে টর্চলাইট মারলেন। আলোর পথ অন্ধকারে কিছু দূর নেমে হারিয়ে গেল। বড়মামা চিৎকার করে বললেন, 'মেজ! উঠে আসতে পারবি?'

মেজমামার উত্তর এল, 'অসম্ভব! আমার আশা তোমরা ছেড়ে দাও।'

দত্তমশাই অন্ধকারে আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বড়মামা তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, 'মশাই! এ তো দেখছি ফায়ার ব্রিগেডে খবর দিতে হবে। তাঁরা শুনেছি হাওড়া ব্রিজের মাথা থেকে পাগল নামাতে পারেন। কুয়ো থেকে গরু তুলতে পারেন।'

দত্তমশাই বললেন, 'ভুল করছেন, এটা কলকাতা নয়।'

'তা হলে কী হবে?'

'এই রাতে আর কী হবে। উনি ওইখানে যেমন আছেন থাকুন, আমরা এইখানে থাকি। ভোর হলে দেখা যাবে।'

'এই সরু জায়গায় আমরা থাকব কী করে? পাশ ফিরলেই তো পড়ে যাব!'

'আপনি কি এটাকে খাট ভাবছেন! ঘুমোবেন না কী! পাহাড়ে পিঠ দিয়ে আমরা জেগে বসে থাকব। তা ছাড়া এই জায়গা ছেড়ে চলে গেলে আর খুঁজে

pathagar.net

পাব না। আমরা সারা রাত গান গাইব। আমি ভাল কীর্তন জানি, মনোহরসাহী। আসুন জমিয়ে বসা যাক। খাবার দাবার যা আছে বের করুন।'

বড়মামা বললেন, 'খাবার তো মেজর ঝুলিতে।'

দত্তমশাই বললেন, 'বাঃ তোফা। সারারাত আমাদের নিরম্বু উপবাস।'

'আপনার খাওয়ার চিন্তা আসছে ? একটা মানুষ হাজার ফুট নিচে ঝুলছে, আমরা একটা ছাতের কার্নিসে কোনো রকমে বসে আছি, কনকনে বাতাসে দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে, একটু পরেই ওপর পাহাড় থেকে ভাল্লুক নামবে, আপনি খাওয়ার কথা বলতে পারলেন ?'

'না খেলে কাল আপনার ভাইকে তুলব কী করে ?'

উঃ, রাতের মতো রাত ! হাড়কাঁপানো বাতাস। ঘুরঘুট্টে অন্ধকার। মাঝে মাঝে অলৌকিক একটা আলো আকাশে খেলা করে যাচ্ছে। কিড্‌র কিট, কিড্‌র কিট করে একটা শব্দ অনবরতই হয়ে চলেছে। গুম্‌গুম্‌ করে পিলে কাঁপানো একটা শব্দ মাঝে মাঝে কানে আসছে। দত্তমশাই বললেন, পাহাড় ভেঙে পড়ার শব্দ। আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছি আমরা তিনটে ভাল্লুক।

বসে থাকতে থাকতে দত্তমশাই হঠাৎ বললেন, 'এই সময় যদি হঠাৎ পাহাড়ী বৃষ্টি নামে। সেই তোড়ে আমরা তিনজনেই নিচে নেমে যাব।'

বড়মামা জিজ্ঞেস করলেন, 'বৃষ্টি কখন হবে ?'

'এনি মোমেন্ট, এনি টাইম'।

শীতকাঁপা গলায় বড়মামা বললেন, তখন কী হবে ?'

দত্তমশাই বেপরোয়া গলায় বললেন, 'কী আর হবে ! রাখে কেষ্ট মারে কে, মারে কেষ্ট রাখে কে ?'

দূরে ভয়ঙ্কর একটা শব্দ হল গুম গুম করে। দত্তমশাই বললেন, 'ওই শুনুন। ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে।'

1 SEP 2003

কোনোরকমে দাঁতে দাঁত লাগিয়ে রাতটা আমরা কাটালুম। অসাধারণ একটা ভোর। সোনার পাত মোড়া একটা আকাশ। ভগবানের খোদ দপ্তরের রকমসকমই আলাদা।

বড়মামা খাদের কিনারায় মুখ ঝুলিয়ে ডাকলেন, 'মেজো'।

নিচে থেকে উত্তর এল, 'গুড মরনিং। ব্রেকফাস্ট ড্রপ করে দাও।'

'ব্রেক ফাস্ট ! খাবারের ঝোলা তো তোর কাছে !'

সে তো কাঁধ থেকে স্লিপ করে, আমাকে ত্যাগ করে আমার চেয়ে নিচে চলে গেছে।'

'তুই আছিস কোথায় ?'

pathagar.net

'মনে হচ্ছে একটা বাড়ির চালে বসে আছি।'

'সে কী রে ?'

'এটা একটা ফরেস্ট বাংলার ছাত। নিচে অনেক ফরেনার ঘোরাঘুরি করছে। সুন্দর সুন্দর সব মেমসায়েব।'

বড়মামা ছোট ছেলে যে-রকম বায়না করে সেইরকম গলায় বললেন, 'আমরাও তোর কাছে যাব ভাই।' মেজমামা অনেক নিচে থেকে হেঁকে বললেন, 'আমার মতো হড়কে নেমে এস।'

বড়মামা দত্তমশাইকে বললেন, 'আসুন আমরা তাহলে হড়কাই।'

দত্তমশাই বললেন, উনি বাইচান্স কপালের জোরে ওইখানে পড়েছেন। নিজের ইচ্ছেতে নয়। আমাদের বেলায় তা নাও হতে পারে। তালগোল পাকাতে পাকাতে সোজা নিচে, তারপর হাড়গোড় ভাঙা দ।'

'তা হলে ?'

'আমার মনে হচ্ছে, রাস্তা একটা আছে।'

'কোথায় ?'

আমরা আসার পথে অনেকটা পেছনে, বাঁদিকে একটা পথ দেখেছিলুম মনে আছে ? সেই পথটাই নেমে অলকানন্দা।

বেলা দ্বিপ্রহরে আমরা তিনজন ধুঁকতে ধুঁকতে অলকানন্দার তীরে সেই সুন্দর ফরেস্ট বাংলোতে পৌঁছে গেলুম। মেজমামা যে-জায়গাটায় এক মিনিটে পৌঁছেছিলেন আমাদের সেই জায়গায় আসতে সাত ঘণ্টা সময় লাগল।

সুপারিনটেন্ডেন্ট খাতা থেকে চোখ তুলে বললেন, 'আপনারা ক'জন আছেন ?'

বড়মামা বললেন, 'চারজন।'

'চারজন কোথায় ? তিনজন তো !'

'আর একজন চালে বসে আছে। আকাশ থেকে ল্যান্ড করেছে। আপনাদের মই আছে !' ভদ্রলোক অবাক হলেন। বেরিয়ে এলেন বাইরের কম্পাউন্ডে। খাড়াখাড়া পাইন গাছ। তারই আড়ালে একটা কটেজের লাল চালে মেজমামা পা ছড়িয়ে বসে আছেন। মাথায় মাঙ্কি ক্যাপ। চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে।

বড়মামা বললেন, 'ওই যে, ওকে নামাতে পারলেই আমরা চারজন। জাস্ট একটা মই পেলেই হয়ে যায়। ব্রিং এ ল্যাডার।'

মেজমামা ওদিকে, সেকালের জমিদাররা যে-কায়দায় তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে সেরেস্তায় বসে থাকতেন সেইভাবে আধশোয়া হয়ে চালে চালকুমড়োর মতো শোভা পাচ্ছেন।

pathagar.net

কাচ

ছেলেবেলায় আমি তো একটু দুষ্টু ছিলাম। সবাই বলত, ভীষণ দুষ্টু। একদণ্ড স্থির হয়ে বসতে জানে না। আমার মা বলতেন, 'ওইটাকে নিয়েই হয়েছে আমার ভীষণ জ্বালা। সারাদিন আমার এতটুকু শান্তি নেই।'

আমি লক্ষ্মী হওয়ার চেষ্টা যে করতুম না তা নয়। বইপত্র নিয়ে বসতুম। দু-এক পাতা হাতের লেখা করতে-না-করতেই মাথাটা কেমন হয়ে যেত। নীল আকাশে নিলুর ঘুড়ি লাট খাচ্ছে, পাশের মাঠে প্রতাপ তার গোলাপ ডাংগুলি খেলছে। মাথার আর কী দোষ!

আমরা তখন খুব একটা পুরনো বাড়িতে থাকতুম। বাড়িটার দুটো মহল ছিল। বারমহল আর অন্দরমহল। অনেক ঘর। চওড়া, টানা-টানা বারান্দা। তিনতলার ছাতটা ছিল বিশাল বড়। ইচ্ছে করলে ফুটবল খেলা যেত। সেখানে পাশাপাশি দুটো ঘর ছিল। কেউ একটু নির্জনে থাকতে চাইলে থাকতে পারত। একটা ঘরে থাকত আমার দিদির যত খেলনা। বড় পুতুল, ছোট পুতুল। দিদির বন্ধুরা বিকেলবেলা এসে খেলা করত। আমি মাঝে-মাঝে দুষ্টুমি করতুম। দিদি তখন তার বন্ধুদের বলত, 'দ্যাখ, ভাই কী বানর ছেলে।' দিদি আমাকে বানর বললে, আমার খুব ভাল লাগল। আমি দুষ্টুমি করলে দিদিরও খুব ভাল লাগত মনে হয়। মাঝে-মাঝে প্রবল লড়াই হত। তখন দিদি বলত, 'দেখবি, যখন কোথাও চলে যাব তখন বুঝবি ঠেলা। কে তোকে গরমের ছুটিতে আচার তৈরি করে খাওয়ায় দেখব।'

রোজ রাত্তিরে বাড়িতে একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হবেই হবে। বাবা অফিস থেকে এসে আমাকে পড়াতে বসবেন। সারাদিনের লাফালাফিতে ঘুমে আমার চোখ ঢুলে আসবে। জানা জিনিসও ভুল করব। বাবা পরপর যোগ করতে দেবেন। একটাও ঠিক হবে না। 'উইক' বানানটা ভুল হবেই হবে। দুর্বলটা সপ্তাহ হবে, সপ্তাহটা দুর্বল। বাবা মাকে ডেকে বলবেন, 'সারাটা দুপুর তুমি করো কী? ছেলেটাকে একটু দেখতে পারো না!'

মা তখন ফিরিস্তি দেবেন, ছেলে এই করেছে, ওই করেছে। বাবা গম্ভীর মুখে উঠে গিয়ে লম্বা বারান্দায় পায়চারি করবেন আর আক্ষেপ করবেন, 'নাঃ, হল না, কিছুই হল না। ফেলিওর, ফেলিওর।' রাতে খেতে বসে বলবেন, 'কালিয়া, পোলাও খেয়ে কী হবে, ছেলেটাই যার মানুষ হল না!'

pathagar.net

এত কাণ্ডতেও আমার কিছু হবে না। ঘুমিয়ে পড়ব। একসময় দিদি এসে আস্তে-আস্তে ডাকবে, 'চল্, খাবি চল। কাল থেকে একটু ভাল করে পড়বি। তোকে বকলে আমার খারাপ লাগে।' কোনও-কোনওদিন দিদি আমাকে খাইয়ে দেয়।

এইভাবেই চলতে চলতে গরমের ছুটি পড়ে গেল। একদিন দুপুরবেলা সবাই ঘুমোচ্ছে। আমিও মায়ের পাশে শুয়ে ছিলুম। দিদি কয়েকদিনের জন্য মামার বাড়ি গেছে। শুয়ে থাকতে থাকতে উঠে পড়লুম। ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। মা যে-ঘরে, তার পাশের ঘরে একটা টেনিস বল নিয়ে কেরামতি করছি। এখন থেকে প্র্যাকটিস না করলে, বড় হয়ে পেলের মতো খেলোয়াড় হব কী করে! বাবাই তো বলেছেন, 'সাধনাতেই সিদ্ধি।'

প্রথমে সাবধানেই সবকিছু করছিলুম, হঠাৎ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে মারলুম এক শট। বাবার বইয়ের আলমারির সব কাচ ভেঙে চুরমার। পাশের ঘর থেকে মা দৌড়ে এলেন। ধড়াধ্বাম মারাটাই আমাকে উচিত ছিল ; কিন্তু বাবা বলেছেন, 'একদম গায়ে হাত তুলবে না। ভয় ভেঙে যাবে। অন্য শাস্তি দেবে।'

মা আমাকে টানতে-টানতে ছাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে বন্দি করে দিলেন,

'থাকো এইখানে, বাবা এলে তোমার বিচার হবে। বড্ড বেড়েছ তুমি। নির্জলা উপবাস।'

চারপাশে খাঁ-খাঁ করছে রোদ। দুপুরের নীল আকাশে গোটাকতক চিল উড়ছে। জানলার ধারে বসে আছি মনখারাপ করে। বাবাকে আমি ভীষণ ভালবাসি। আলমারির সব কাচ চুর হয়ে গেল। খুব অন্যায় হল। কবে যে আমি মানুষ হব! এইসব ভাবছি। ভীষণ গরম। একটুও হাওয়া নেই। গাছের একটা পাতাও নড়ছে না। শেষকালে মনে হয় ঘুমিয়েই পড়েছিলুম।

গায়ে কেউ হাত রাখল। ধড়মড় করে উঠে বসলুম। সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন বাবা।

আকাশে তখনও শেষবেলার রোদ। ভয়ে কুঁকড়ে গেলুম। বাবার মুখের দিকে তাকালুম, হাসছেন। স্বপ্ন দেখছি না তো! দরজার দিকে তাকালুম। হাট খোলা। তখন আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস্ করলুম 'বাবা! আজ আপনি এত তাড়াতাড়ি এলেন?'

কোনও উত্তর নেই। বাবা হাসছেন। কেবল হাসছেন।

আমি বললুম, 'বাবা, আমি সব কাচ ভেঙে ফেলেছি। আমি খুব অন্যায় করেছি বাবা।'

বাবা তবু হাসছেন। মুখে এতটুকু রাগ নেই। আমি তখন প্রণাম করার জন্য বাবার পা স্পর্শ করতে গেলুম, দেখি কেউ কোথাও নেই। ঘর ফাঁকা। দরজাটা হাট খোলা। খুব জোর হাওয়া ছেড়েছে গ্রীষ্মের বিকেলের।

pathagar.net

আমি ভয়ে কেমন যেন হয়ে গেলুম। স্বপ্ন দেখেছি। নিশ্চয় স্বপ্ন। সাহস একটু ফিরে পেতেই এক ছুটে নীচে। দেখি মা রান্নাঘরে ঘুগনি তৈরি করছেন। আমাকে দেখে অবাক, 'কী করে এলি, কে তোকে দরজা খুলে দিল ?'

বাবা ঘুগনি খেতে ভালবাসেন, মা সেইজন্যই করছেন। কাচ ভাঙা নিয়ে ভীষণ কাণ্ডটা হয়ে যাওয়ার পরেই ঘুগনি এসে অবস্থাটাকে সামাল দেবে।

মাকে আমি সব কথা বললুম।

'তোর বাবা এসেছে ? কোথায় ?

'দরজা তো বাবাই খুলে দিলেন !'

'সদরের দরজা আমি খুলে না দিলে আসবে কী করে ?'

গোটা বাড়িটা সার্চ করা হল। বাবার পড়ার ঘর, শোওয়ার ঘর, ঠাকুরঘর, বাথরুম। আলনাটা দেখা হল। সেখানে বাবার অফিসের জামাকাপড় ছাড়া নেই। বাড়িতে ফিরে যা পরবেন সেইগুলোই গুছনো রয়েছে।

আমরা তখন পাশের বাড়িতে গিয়ে বাবার অফিসে ফোন করলুম। অফিসের বড়কর্তার সঙ্গে মা কথা বললেন। জানা গেল, বাবা অনেক আগেই সাইটে গেছেন। সাইট মানে উলুবেড়িয়ায়। সেখানে কোম্পানির নতুন ফ্যাক্টরি তৈরি হচ্ছে।

মা খুব অনুরোধ করলেন, 'আপনি নিজে একটু খবর নিন। মনে হচ্ছে, একটা কিছু হয়েছে।' ফোন নম্বরটা তাঁকে দেওয়া হল। টেলিফোনটাকে ঘিরে আমরা বসে আছি। ওদিকে মায়ের ঘুগনি পুড়ে ছাই। এক ঘণ্টা পরে ফোন বাজল।

কনস্ট্রাকশন সাইটে একটা লোহার বিম ক্রেন ছিঁড়ে বাবার মাথায় পড়ে গেছে। তখন বেলা ঠিক সাড়ে চারটে। আমি এমন বোকা ছিলুম, সেই খবরটা পেয়েই আমি নাকি মাকে বলেছিলুম, 'জানো, আমি কাচ ভেঙেছি বলে বাবা একটুও রাগ করেননি। শুধু হাসছিলেন।'

তখন আমার বয়েস ছিল আট। আজ আমি আশি। আমি আর কোনওদিন কিছু ভাঙিনি। না কাচ, না সম্পর্ক, না পরিবার, না জীবন। বাবার সেই হাসিহাসি মুখের হাসি যাতে কখনও না মিলিয়ে যায়, সেই চেষ্টা আমি করেছি।

pathagar.net

হাত না ডাল

আমাদের স্কুলের ছাতটা খুব সুন্দর। একেবারে গঙ্গার ধারে। ইংরেজ আমলের বাড়ি। আলসে চারটে কী সুন্দর! নানারকম ডিজাইন করা। আমরা রোজই নীচের মাঠে দাঁড়িয়ে হাঁ করে ওপর দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখি। আর মনে-মনে ভাবি, একদিন যদি ছাতে উঠতে পারতুম, কী মজাই না হত! কত দূর-দূর দেখতে পাওয়া যেত। হাওড়ার ব্রিজ, বালির ব্রিজ বেলুড়মঠ। কিন্তু ছাতে ওঠার উপায় নেই। সবসময় তালা দেওয়া। চাবি হেডমাস্টারমশাইয়ের কাছে। না, ছাতে তোমাদের ওঠা চলবে না। ওটা তোমাদের খেলার জায়গা নয়!

ভীষণ গম্ভীর মানুষ। একটার বেশি দুটো কথা বলতে চান না। চোখে ইয়া মোটা চশমা। ইয়া পুরু গোঁফ। খদ্দরের পাঞ্জাবি। পায়ে আবার শু-জুতো। চুল ছোট-ছোট করে ছাঁটা। বেশ মোটাসোটা একজন মানুষ। জ্ঞানের পাহাড়। বগলে সবসময় একটা মোটা বই থাকে, ওয়েবস্টারের ডিকশনারি।

সেদিন সুজন এসে খবর দিল, 'শোন, ছাতের দরজাটা আজ খুলেছে। ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করছে তো। রামাধর খুলে দিয়ে তার কোয়ার্টারে খেতে চলে গেছে। এই সুযোগ।'

আমাদের তখন আর মাত্র একটা পিরিয়ড বাকি। শনিবার হাফ ক্লাস। পিরিয়ডটা করতেই হবে। অঙ্কের ক্লাস। বিমানবাবু রোল কল করে না পেলে, পুলিশ দিয়ে ধরে আনবেন। সাঙ্ঘাতিক মানুষ। ক্লাসে ঢুকে টেবিলের ওপর একবার মাত্র বেতের শব্দ করেন, তাতেই আমাদের পিঠে দাগ পড়ে যায়। সত্যেন একদিন ক্লাসে মজা করেছিল। গঙ্গার ধারে কেশোরাম ইটে বসে চুলদাড়ি কামায়, 'ইটালিয়ান সেলুন'। রামধরকে বললেন, 'ডেকে আন।'

কেশোরামকে দিয়ে সত্যেনের মাথা কামিয়ে দিলেন।

কেশোরাম জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'সার, একটা টিকি রাখব?'

বিমানবাবু বললেন, 'ও কি সন্ন্যাসী হচ্ছে? প্রায়শ্চিত্তের চুল কীভাবে কাটে জানিস না?'

সত্যেনের বাবা খুব বুদ্ধিমান। তিনদিনের দিন ছেলের পৈতে দিয়ে দিলেন। বিমানবাবুরও নিমন্ত্রণ হয়েছিল। সত্যেনকে একটা বই দিয়েছিলেন, 'চরিত্রগঠন'। সেই বইটাতে অনেক কথার মধ্যে যে-কথা লেখা আছে, লজেন্স, চকোলেট, চানাচুর একদম খাবে না।

pathagar.net

অঙ্কের ক্লাস শেষ হল। সবাই বাড়ি চলে যাচ্ছে। মাস্টারমশাইরাও বেরিয়ে পড়েছেন একে একে। আমি আর সুজন গুটি-গুটি সোজা ছাতে। ট্যাঙ্ক পরিষ্কারের লোকেরা কেউই আমাদের দিকে তাকাল না। নিজেদের কাজেই ব্যস্ত। আমরা মনের আনন্দে ছাতে ঘুরছি। গড়ের মাঠের মতো ছাত। ইচ্ছে করলে ফুটবল খেলা যায়।

সিঁড়ির ঘরের ছাতে ওঠার জন্য লোহার সিঁড়ি আছে।

সুজন বলল, 'চল, ওই ছাতটায় উঠলে আরও দূরে দেখা যাবে। বলা যায় না, সমুদ্রও দেখা যেতে পারে। বঙ্গোপসাগর।'

সেই ছাতে উঠলুম দু'জনে। কেউ তো কোথাও বলার নেই। স্বাধীন আমরা। সত্যিই, কত, কত দূর দেখা যাচ্ছে। মনে হয় মনুমেন্টের চূড়াটাও দেখতে পাচ্ছি। আমরা বই-খাতা রেখে বেশ গুছিয়ে বসলুম। সুন্দর বাতাস দিচ্ছে। সুজন তার মামারবাড়ির গল্প বলছে। ওর মামাদের নাকি ঘোড়া ছিল। সেই ঘোড়াকে বলা হত ওয়েলার ঘোড়া। বাড়িটা নাকি এত বড় ছিল যে, একবার ঘুরে এলেই পা ব্যথা করবে। হতে পারে, কাশিমবাজারে কত কী হয়! আমরা তার কী জানি!

কথা বলতে-বলতে আমরা বই মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়েছি। পেটে যেন আকাশ ঠেকে। আমার মামার বাড়ির তেমন কোনও গল্প নেই, তাই সুজন একের পর এক গল্প বলে যাচ্ছে। ওর মামার বাড়ির ঘরগুলো নাকি এত বড়, এ-মাথায় দাঁড়িয়ে কথা বললে ও-মাথায় শোনা যায় না।

গল্প করতে-করতে আমরা ঘুমিয়ে পড়েছি। যখন ছাঁত করে ঘুম ভাঙল তখন সন্ধে হতে আর একটু দেরি। তাড়াতাড়ি চিলের ছাত থেকে নেমে এলুম। কাজের লোকেরা ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করে চলে গেছে। ছাতের দরজা ওপাশ থেকে বন্ধ। রামাধর তালা দিয়ে চলে গেছে।

আমি দেখেছি, কোনও বিপদ এলেই সুজন যা করবে, প্রথমেই যা করবে, তা হল ফোঁস-ফোঁস কান্না। এখানেও তাই হল, আমাকে জড়িয়ে ধরে ফোঁস-ফোঁস করে খানিক কান্না হল, আমরা ছাত থেকে নামব কী করে, না খেয়ে মরে যাব। বাবা মারবে। বিমানবাবু কেশোরামকে ডেকে ন্যাড়া করিয়ে দেবেন। হেডমাস্টারমশাই জলবিছুটি মারবেন।

এক দাবড়ানি দিলুম 'চুপ কর। বিপদে মাথা ঠাণ্ডা না রাখলে কিছু হয় না।'

যেদিকটায় রামাধরদার কোয়ার্টার সেইদিকে গিয়ে চিৎকার করছি, 'রামাদা, রামাদা।' কোনও সাড়া নেই। হঠাৎ খেয়াল হল, আজ শনিবার, রামাধরদা দেশে চলে গেছে। মরেছে! সে তো তা হলে সোমবারের আগে আসবে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হল, মরেছে, সোমবার তো সে দিবস, স্কুল বন্ধ।

pathagar.net

সুজনকে সাহস দিতে গিয়ে নিজেই থপাস করে বসে পড়লুম। শনি, রবি, সোম, তিনদিন এই ছাতে থাকতে হবে! নো খাবার, নো জল। সবচেয়ে কাছের বাড়িটাই এত দূরে যে, চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ফেললেও কেউ শুনতে পাবে না। স্কুলের সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে, তার একদিকে গঙ্গা আর একদিকে বাসরাস্তা। ছাত থেকে রাস্তার কিছুটা দেখা গেলেও রাস্তা থেকে এই ছাতটা দেখা যাবে না, গাছপালার আড়ালে পড়ে গেছে।

সুজন বলল, 'তোর জন্যই এই অবস্থা হল।'

'কথা শোনো, খবরটা কে এনেছিল। ছাত খোলা আছে, খবরটা কে আনল।'

'অনেকদিন ধরে তুই ছাতে ওঠার প্ল্যান করছিলি বলেই তো আমি খবরটা এনেছিলুম। তুই আমার সর্বনাশ করে দিলি। একে আমি অঙ্কে কম নম্বর পেয়েছি।'

'অঙ্কে কম নম্বর পেয়েছিস। প্রত্যেকবারেই তো তাই পাস। বেশি পেলেই ছাত থেকে নেমে যেতে পারতিস?'

'সে-কথা নয়। ছাত থেকে নামার পর আমার ধোলাইটা কেমন হবে, কোন স্কেলে হবে বুঝতে পারছিস। রিলে সিস্টেমে? প্রথমে দাদা, দাদার হাত থেকে বাবা, তারপর মা ফিনিশ করবে। সবশেষে দিদি জলপটি লাগাবে।'

'তুই নিজেরটাই ভাবছিস। আমারটাও কি কিছু কম হবে। আমার বাবার এক চড়, তোর বাবার একশোটা চড়ের সমান।'

'একদিন একটা খেয়ে দেখিস না। তিনদিন আর হাঁ করতে হবে না।'

'তুই কি ভাবছিস, আমরা ছাত থেকে নামার পর গলায় মালা দিয়ে অভ্যর্থনা করবে। দু'জন নভোচর মহাকাশ থেকে নামলেন। জেনে রাখ, জ্যান্ত আর নামতে হচ্ছে না। আমাদের ডেডবডি নামবে। সোমবারও ছুটি।'

'সোমবার ছুটি কেন?'

'মে ডে।'

সুজন শুয়ে পড়ল। ধরেই নিয়েছে, মরে যাবে। তা মরতেই যখন হবে, বসে-বসে কেন? শুয়ে-শুয়েই মরি।

একেবারে সন্ধে হয়ে গেল। গঙ্গার দিকে পশ্চিম-আকাশে সামান্য একচিলতে লাল। মাথার ওপর দিয়ে একঝাঁক বাদুড় সাঁই-সাঁই করে উড়ে গেল। বাদুড়কে আমি ভীষণ ভয় পাই। অদ্ভুত জীব। ওড়ে, কিন্তু গায়ে পালক নেই। আবার কী, ডিম পাড়ে না।

এতক্ষণ বাড়িতে হইচই পড়ে গেছে। বাবা এসে বলছেন, 'বানরটা গেল কোথায়! তোমাকে কিছু বলে গেছে?' মা তো আমার তেমনই, সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, 'সে এখনও স্কুল থেকেই ফেরেনি। তোমাকে তো আগেই বলেছি, আজকাল খুব লায়েক হয়েছে।'

pathagar.net

বাবা বলবেন, 'আসুক আজ, খোল-নলচে আলাদা করে দেব।'

কে লিখেছিলেন, ওই গানটা, 'কুপুত্র যদি-বা হয়, কুমাতা কখনও নয়।'

আমার দাদু আরও কড়া। আমার বাবাকেও মাঝেমধ্যে বানর বলেন। 'এই যে গুটিগুটি চললে কোথায়! আজ ফিরতে এত দেরি হল কেন! ফিরতে যে দেরি হবে, কাকে বলে গিয়েছিলে!'

'আজ্ঞে হঠাৎ একটা মিটিং!'

'রোজই তোমার মিটিং, ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করতে হচ্ছে। এতখানি বয়েস হল, বানর ছেলে, তুমি বোঝে না, আমরা কতটা দুশ্চিন্তায় থাকি।'

রাত আরও একটু বাড়লে, দু'জনে দু'দিকে খুঁজতে বেরোবেন। থানা, পুলিশ হাসপাতাল। কারও মাথাতেই আসবে না, আমরা স্কুলের ছাতে আটকে আছি। এখন যদি ভগবানকে খুব জোরে জোরে ডাকি, তা হলে ভগবান কি তালা খুলে দেবেন! ভগবান কোনওদিন কোনও ভাল কাজ করেননি। ইংরেজিতে দশটা নম্বর বাড়াতে বলেছিলাম, তাই পারলেন না। আমার বন্ধু শিখার বাবাকে বাঁচিয়ে রাখতে বলেছিলুম। রেখেছেন। ভগবান ওই দাদুর গীতার মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক হয়ে আছেন। শ্লোকের আর কতটুকু ক্ষমতা।

হতাশ হয়ে আলসের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসে আছি। সুজন দু'হাত দিয়ে মাথাটা ধরে আছে। ঘুমকাতুরে। এখনই ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমোলেই শান্তি।

ঘটাং করে একটা শব্দ হল। লোহার শব্দ। এইবার ভয় লাগছে। খুব ভয়। ছড়ছড় করে বাতাস বইছে। গাছে-গাছে পাতার সপসপ শব্দ। পশ্চিম আকাশে কুমড়োর ফালির মতো চাঁদ। এখনই অবশ্য ডুবে যাবে। এ-চাঁদের কোনও মানে হয় না।

শব্দটা হল কোথায়।

একবার জানতে পারলে ভয়টা কেটে যাবে।

এদিক-ওদিক তাকাতে গিয়ে চোখ আটকাল জলের ট্যাঙ্কের মাথায়।

ঢাকনাটা একপাশ খুলে কাত হয়ে আছে। আর ফিকে চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখছি, একটা হাত বাখারির খোঁচার মতো সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। পাঁচটা আঙুল উঁচিয়ে আছে আকাশের দিকে।

ঠিক দেখছি তো!

চোখ রগড়ে আর-একবার তাকালুম, 'হ্যাঁ, ঠিক। কোনও ভুল নেই।'

ভাগ্য ভাল, সুজন ঘুমিয়ে পড়েছে মিষ্টি হাওয়ায়।

সুজনকে ডেকে দেখালে ভূতের ভয়ে নির্ঘাত লাফ মারবে নীচে। আমার ভীষণ ভয় করছে। অজ্ঞান হয়ে গেলে ভাল হত। সে আর হচ্ছি কই। আমার ধাত খুব কড়া।

কিঁচ করে আর-একবার শব্দ হল। হাতটা যেন আরও একটু ওপর দিকে

pathagar.net

উঠল। মানুষের হাত। ভূতের হাত নয়। ভূতের হলে হাড়ের হত। কঙ্কালের হাতের মতো। তার মানে ট্যাঙ্কে একটা মরা মানুষ আছে। কোথা থেকে এল!

এইবার আমার ভয়টা অন্যদিকে যাচ্ছে। বিশাল নির্জন একটা ছাত। অন্ধকারে থমথম করছে। চারপাশে কেউ কোথাও নেই। জলের ট্যাঙ্কে একটা মরা মানুষ। ক্রমশ ফুলছে। একটা হাতের খানিকটা ঢাকনায় চাপ মেরে বেরিয়ে এসেছে। এই ছাদে আর কিছুতেই বসে থাকা যায় না। ওই জলের ট্যাঙ্ক যারা সাফাই করছিল তাদেরই একজন। এ খুন। খুনের কেস।

শরীরে কোথা থেকে ভীষণ একটা বল এল। ছাতের দরজাটা আমি ভাঙব। এইবার মনে হল ভগবান আছেন। দেখি ছাতের একপাশে একটা লোহার রড পড়ে আছে। অনেককাল আগে পনেরোই আগস্ট, ছাব্বিশে জানুয়ারিতে ছাতেই পতাকা তোলা হত। এই রডটা মনে হয় সেই রডটাই। গাঁথনি থেকে খুলে পড়ে আছে।

রডটা দু'হাতে ধরে প্রাণপণে দরজায় চার্জ করলুম। বিকট শব্দ করে বাড়ি কেঁপে গেল।

আচমকা ঘুম ভেঙে, দূর থেকে সুজন বলছে, 'করছিস কী?'

'দরজা ভাঙছি। বাঁচতে যদি চাস আমাকে সাহায্য কর।'

শক্ত কাঠ। সহজে কি ভাঙে! মারতে মারতে গলদঘর্ম।

শেষে মচ করে শব্দ হল। একটা প্যানেল চিড় খেয়েছে। আরও বারকতক মারতেই গোটা প্যানেলটাই নেমে গেল। মাথাটা গলবে।

কোনওরকমে মাথাটা গলিয়ে অনেক কসরত করে শরীরটাকে ওপাশে বের করে নিয়ে যেতে পারলুম। ঘুরঘুট্টে অন্ধকার।

সুজনকে বললুম, 'বই-খাতাগুলো সব আমার হাতে দে। কিচ্ছু যেন পড়ে না থাকে। তারপর তুই বেরিয়ে আয়।'

সুজন বললে, 'কাজটা ভাল করলি না। আমাদের স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে।'

'জলের ট্যাঙ্কটার দিকে তাকা!'

'কী রে ওটা!'

'মরা মানুষের হাত।'

আর কিছু বলতে হল না। সুজন আমার চেয়ে মোটা। কোনওরকমে ছেঁচড়ে-মেঁচড়ে বেরিয়ে এল। হাতড়ে-হাতড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামার পালা। দেওয়ালঘড়ির পেন্ডুলামটা টিস-টিস শব্দ করছে। একটা বেড়াল ইঁদুরের ধান্দায় অন্ধকারে ঘাপটি মেরে ছিল। মিঁআও করে ডেকে মারল লাফ।

শেষ বাধা গেট। সেটাও বাইরে থেকে বন্ধ।

'টপকাতে হবে সুজন।'

pathagar.net

'আমি পারব না।'

'তা হলে পুলিশে ধরুক তোকে, আমি চললুম।'

সুজন আমার হাত চেপে ধরল। ভয়ে কাঁপছে।

কোনওরকমে ঠেলেঠুলে সুজনকে পার করলুম। একটু কেটেকুটে গেল। এই গেটটা আমি অনেকবার টপকেছি। আমার কাছে কোনও সমস্যাই নয়। ধপাস করে রাস্তায়। রাত বেশ হয়েছে। জনপ্রাণী নেই।

সুজন বলল, 'তুই উলটো দিকে যাচ্ছিস কোথায়। বাড়ি তো এইদিকে!'

'আমি থানায় যাচ্ছি।'

'থানায় কেন?'

'একটা কথা বলবি না। আমার সঙ্গে আয়।'

থানা বেশিদূর নয়। গঙ্গার ধারেই। ভারী একটা জিপ অন্ধকারে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি যখন কিছু করব ভাবি, তখন আমার ভয়ডর আর থাকে না। থানায় ঢুকে দেখি, আমার বাবা, দাদু, আর সুজনের বাবা আর দাদা বসে আছেন। অফিসার ফোনে চিৎকার করছেন, 'হ্যালো মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল কলেজ।'

আমার দাদু বললেন, 'হয়ে গেছে, ছেড়ে দিন। মানিকজোড় হাজির। এখন ঠিক করুন, ধোলাইটা পারিবারিক হবে, না পুলিশি হবে!'

পুলিশ অফিসার ঝপাং করে রিসিভারটা ফেলে দিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন, 'কোথায় যাওয়া হয়েছিল? আড্ডা মারতে?'

কোনওরকমে বললুম, 'আগে এক গেলাস জল।'

দাদু সঙ্গে-সঙ্গে বাধা দিলেন, 'থানার জল খাবে না, জন্ডিস হবে।'

অফিসার বললেন, 'বেশি বড়লোকি চাল দেখাবেন না। তা হলে আমাদের সকলেরই তো ন্যাবা হত। আমাদের ট্যাঙ্ক রেগুলার পরিষ্কার করানো হয়।'

আমি গলাটা ভিজিয়ে নিয়ে বললুম, 'স্যার! ভীষণ একটা কাণ্ড হয়েছে।'

বাবা বললেন, 'নাও এইবার একটা গল্প শোনো।'

আমি তখন বলার জন্য ব্যস্ত। ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপে কান নেই।

'স্যার! আমাদের স্কুলের ছাতের ট্যাঙ্কে ডেডবডি। খুন!'

অফিসার বললেন, 'খুলে বলো। আগেরটা পরে, পরেরটা আগে নয়। স্ট্রেটলাইনে চলো। রহস্যকাহিনী তৈরি কোরো না।'

পুরো ঘটনাটা ছবির মতো করে বলে গেলুম। কিচ্ছু বাদ দিলুম না। সকলের চোখ গোল্লা গোল্লা।

অফিসার সেকেন্ড অফিসারকে বললেন, 'ফোর্স রেডি করুন।'

আমার আর সুজনের কী গর্ব। জিপে আমাদের আর কাউকে উঠতে দেওয়া হয়নি। শুধু আমি আর সুজন। প্রথমে হেডমাস্টারমশাইয়ের বাড়ি। তাঁকে ঘুম থেকে তোলা হল। পুলিশ দেখে ঘাবড়ে গেছেন।

pathagar.net

অফিসার বললেন, 'আপনার ছাতে খুন!'

'আমার ছাতে?'

'আপনার স্কুলের ছাতে। আমাদের সঙ্গে চলুন!'

যে-অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই জিপে উঠলেন। আমি সুজনের কানে-কানে বললুম, 'এবারের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার আমাদের দু'জনের বরাতেই নাচছে।'

স্কুলের গেট খোলা হল। পাঁচ সেলের টর্চ জ্বলে উঠল। গেট ছাড়াও স্কুলে ঢোকার বিশাল দরজাটাও বন্ধ। আমরা ক্লাসঘরের জানলা গলে বেরিয়েছিলুম। আমার বাবা, দাদু, সুজনের বাবা, দাদা, সবাই হাঁটাপথে স্কুলের সামনে এসে গেছেন। অফিসার তাঁদের ঢুকতে দেননি। ইংরেজিতে বলেছেন, 'প্লিজ, ওয়েট হিয়ার।'

আমরা উঠছি সিঁড়ি ভেঙে। সুজন আর আমি পুলিশ অফিসারদের পেছনে। আমাদের পেছনে হেডমাস্টারমশাই। তারপরে কনস্টেবলরা। উঠতে-উঠতে ভাবছি, ওটা যদি হাত না হয়ে গাছের ডাল হয়। তা হলে। রাষ্ট্রপতির সংবর্ধনাটা কেমন হবে।

হেডমাস্টারমশাই চাবি দিলেন। অফিসার ভাঙা দরজাটা খুললেন। ফাঁকা ছাত। আমার মনে হচ্ছে, এইবার অ্যানুয়াল পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবে। পাস না ফেল! হাত না ডাল!

অফিসার পাঁচ সেলের টর্চের তীর ছুড়লেন ট্যাঙ্কের মাথায়। আমাদের দমবন্ধ।

দু'কদম এগিয়ে গেলেন সামনে। আমরা সবাই দেখলুম, একটা হাত। পাঁচটা আঙুল ছেতরে আকাশে কী যেন খুঁজছে!

অফিসার বললেন, 'ইয়েস, হ্যান্ড!'

হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'হ্যাঁ, তাই তো, হাত।'

আর আমার মন চিৎকার করে উঠল, 'পাস, পাস!'

তারপর কী হল! সে তো অন্য এক বিরাট গল্প।

pathagar.net

ভূতের খেলা

আমার একটা ভূত আছে। আমারই ভূত। আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় ছায়ার মতো। কেউ দেখতে পায় না ঠিকই ; কিন্তু আমি বুঝতে পারি। কী ভাবে পারি এইবার সেই সব কথাই বলি। আমি প্রমাণ দেবো।

দুপুরবেলা। গরমের ছুটি। আমাদের দোতলার ঘরের জানালার পাশে বসে বেশ আপন মনে অঙ্ক কষছি। অঙ্ক হয়ে গেছে, ইংরিজি পড়ব। তারপর বাঙলা। ইতিহাস। ভূগোল। মনে মনে রুটিন তৈরি। গরমের ছুটিটাই তো ভাল করে পড়ার সময়। যতটা পেছিয়ে আছি ঠিক ততটাই তো এগোতে হবে। বড়রা বলবেন কী, আমি নিজেই তো জানি। ভাল করে পড়বো, ভাল রেজাল্ট করব। ভাল চাকরি পাবো। ইয়া বড় একটা গোঁফ রাখবো। লাল মতো একটা মটোর গাড়ি কিনবো। কথাতেই তো আছে-লেখা পড়া করে যে গাড়ি-ঘোড়া চাপে সে।

যেই না আমি শেষ কথাটা মনে মনে বলেছি অমনি কে একজন বেশ ভারী গলায় বলে উঠল না রে, লেখাপড়া করে যে গাড়ি চাপা পড়ে সে। ভূতের সঙ্গে অনেকক্ষণ তর্কযুদ্ধ হল। ভূত তো জিতবেই। ভূতের টেরিফিক পাওয়ার সবাই জানে।

জিজ্ঞেস করলুম—তাহলে, এখন আমার কী করা উচিত ?

—এমন একটা কিছু করো যাতে বেশ মজা আছে। এই যে বসে বসে একের পিঠে দুই করছ, এতে কোনও মজা আছে ? এ তুমি করছ প্রাণের দায়ে, ধোলাইয়ের ভয়ে। এতে কোনও চার্ম নেই। চার্ম। নিচে ভাঁড়ার ঘরের কুলঙ্গিতে তোমার মা কাচের বয়ামে বয়ামে আমের আচার করে রেখেছেন, একেবারে ম্যাডাগাসকার। এই সুযোগ। মা ঘুমোচ্ছেন।

—শোন, সেটা তো তাহলে চুরি হল।

—গবেট ! মায়ের জিনিস সব সময় এই ভাবে চুরি করেই খেতে হয়। কী তাহলে ইতিহাস পড়লে এতদিন ! ওই যে শ্রীকৃষ্ণ। অতবড় অবতার ! যাঁর গীতা তোমার বাবা রোজ সকালে পড়েন, তিনি কী করতেন ছেলেবেলায় ? ওই দেখ দেয়ালে ঝুলছে ছবি। ছেলের পিঠে ছেলে, তার পিঠে ছেলে, গোপাল তার ওপর খাড়া, হাতের নাগালে সিকে। ভাণ্ডে কী আছে ? ননী। গোপাল চোর ! অবশ্যই। তবে ননীচোর ! তোমার মা রোজ যে অষ্টোত্তর শতনাম পড়েন,

pathagar.net

তাতে আছে, ননীচোরা রাখালরাজা, শ্রীমধুসূদন ! একে বলে বাল্যলীলা। ধর্মও জান না, ইতিহাস জান না, তোমার ভবিষ্যৎ তো অন্ধকার !

—তাহলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে আসি।

খাতা, বই, কলম, পেনসিল সব পড়ে রইল জানলার ধারে। মা শোবার ঘরের খাটে নিশ্চিন্তে একটু বিশ্রাম করছে। একটা বই পড়ার চেষ্টা করছিল, বোঝাই যাচ্ছে। আধখোলা বইটা পাশে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মা পড়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমি খাবার ঘর থেকে একটা চেয়ার এনে ভাঁড়ার ঘরের উঁচু তাকের সামনে রাখলুম। আঃ সার সার বয়ামে আচার, মোরব্বা। কী তার রূপ ! সুড়ুক করে জিভের জল টেনে নিলুম। জয় গোপাল বলে উঠে দাঁড়ালুম চেয়ারে। আমার সামনে পরপর চারটে বয়াম। আচারে টইটম্বুর। তেল ঝাল টক নুন মিষ্টি। আমার চাই টক-মিষ্টি। তাড়াহুড়ো করার তো কিছু নেই। ধীরে বৎস। ধীরে। প্ল্যানটা গুলিয়ে গেল। বয়ামটা নামাবো, না একটা কিছু এনে, হাত ঢুকিয়ে তাইতে বের করে নোবো !

আবার সেই গলা—একটা ডিশ আনো। এক খামচা তাইতে তুলে নাও।

টুক করে নেমে পড়ো চেয়ার থেকে। পাঁচটা আঙুল তারিয়ে তারিয়ে চোষো। ওটা ফাউ। আসল তোমার ডিশে। সোজা চলে যাও ছাতে। জলের ট্যাঙ্কের ছায়া পড়েছে। সেখানে বেলফুলের টবের পাশে বসে একটু একটু করে সাবাড় করো। আকাশ দেখো, চিল ওড়া দেখ, শালিকের গান শোনো ; গরম বাতাস গায়ে মাখো। সব শেষে এতখানি একটা জিভ বের করে চেটে চেটে ডিশটাকে একেবারে সাফা করে ফেল। কোথায় লাগে তোমার শুকনো অঙ্ক, খড়খড়ে ইংরিজি।

ভূত যা বললে, আমি একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সেই নির্দেশ পালন করলুম। আমি তো অবাধ্যি নই। ভূত বললে—শোনোনি, জিভে দয়া করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

—না, কথাটা তা নয় তো। তুমি ব-এ, ভ-এ গোলমাল করে ফেলেছ। ওটা হবে জীবে দয়া করে যেই জন।

—গাধা ! জিভ ছাড়া কোনও জীব হয় ! সমস্ত কথার একটা ব্যাখ্যা থাকে। গীতার সাতটা ব্যাখ্যা আছে। ভগবতের তিনটে।

যাক ব্যাপারটা বেশ ভালয় ভালয় মিটে গেল। আচার-টাচার খাওয়া হয়ে যাবার পরে যখন অঙ্ক-টঙ্ক শেষ করে মাঠে খেলতে যাবার জন্যে রেডি হচ্ছি, তখন মা উঠে বসে তিনবার শ্রীমধুসূদন বললে। তার মানে আমাকেই বলা হল। আমি তো গোপাল। চুরি করে আচার খেয়েছি। গোপাল বড় হলেই মধুসূদন।

pathagar.net

রাতের বেলা বাবা খাবার টেবিলে চেয়ার টেনে বসতে গিয়ে বললে, চেয়ার রঙ করিয়েছ বুঝি! এখনও রঙ শুকোয়নি। চ্যাট চ্যাট করছে।'

মা বলছে, 'রঙ করাবো কেন? এ তো পালিশ করা।'

'এ সব তাহলে কী চট চট করছে?'

আমি কথা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বললুম, 'এবার তো আমেরিকা মঙ্গলগ্রহে চলল।'

বাবা আর একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'দাঁড়াও দাঁড়াও আগে যাক। কাজটা খুব সহজ নয়।'

মা কিন্তু খুব মানোযোগ দিয়ে চেয়ারটা পরীক্ষা করে চলেছে। আর নিজের মনেই বলছে-রসগোল্লার রস তো হবে না। বহুকাল রসগোল্লা আসেনি। চাটনি সাতদিনের মধ্যে হয়নি। তা হলে, তা হলে? মা যেন গোয়েন্দাগিরি শুরু করলে। মায়ের এই এক দোষ। মাথায় একটা কিছু ঢুকলেই হল। হেস্তনেস্ত করে তবে ছাড়বে।'

আমি বললুম, 'মঙ্গলগ্রহে মানুষ থাকলে বেশ হত।'

বাবা বললে, 'বেশ তো হত; কিন্তু পৃথিবী ছাড়া কোথাও মানুষ নেই।'

হঠাৎ মায়ের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললে, 'ফোঁস ফোঁস করে চেয়ারটায় কী শুঁকছো বলো তো, পুলিশ কুকুরের মতো?'

'দেখছি কেন চটচট করবে! কী লেগেছে! এ তো ঠিক নয়! চেয়ার কেন চটচট করবে! তোমার হাতে লেগেছে, বাইরের কারোর হাতে লাগলে, তিনি কী ভাবতেন? ভাবতেন জানোয়ারের বাড়ি!

'থাক গে, ও শোঁকাশুঁকি ছেড়ে দাও। রাত হয়ে গেছে, খাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক।'

মা হঠাৎ তীরবেগে ছুটে গেল ভাঁড়ারঘরের দিকে। সর্বনাশ করেছে। না, সর্বনাশের কী আছে! ধরতে পারবে না কী! তবু চোরের মন তো! আমি টেবিলে তবলা বাজাতে লাগলুম।

বাবা বললেন, 'না, না, ওটা তুমি ঠিক করছ না। তবলা আর টেবিল এক জিনিস নয়।' মা ভাঁড়ারঘর থেকে চিৎকার করে উঠল, 'কে আচারের বয়ামের ঢাকনা খুলে রেখেছে, খোকা!' আমি বাবাকে বললুম, 'দেখেছ বাবা, যত দোষ নন্দ ঘোষ।'

মা ঢাকনা খোলা বয়ামটা টেবিলে এনে আমাদের দু'জনের সামনে ঠকাস ঠকাস করে বসিয়ে দিল। বাবা বললে 'কী হল?'

'কী আবার হবে। এ তোমার ছেলের কাজ। এই চেয়ারে উঠে আচার পেড়ে খেয়েছে। সেই হাতে চেয়ারটা মাখামাখি করেছে। চাপাটা খুলে রেখেছে। এই দেখ দুটো আরশোলা ঢুকে বসে আছে। এক বয়াম আচার নষ্ট।'

pathagar.net

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার কাজ !'

বলতে যাচ্ছিলুম, না। ভূত আমার গলা চেপে ধরলো—মিথ্যে বোলো না। সত্য বলো। অন্যায় স্বীকার করো।

আমি মাথা নিচু করে বললুম, 'অন্যায় হয়ে গেছে।'

বাবা বললেন, 'ভেরি গুড। তুমি যে অস্বীকার করলে না, এর জন্যই তোমার সাতখুন মাপ। শোনো, ছোটরা এইরকম কাজ একেবারেই করবে না, এমন কোনও গ্যারেন্টি নেই। তবে না করলেই ভাল। জিনিসটা নষ্ট হয়ে গেল তো !'

ব্যাপারটা সহজেই মিটে গেল। মা বললে, 'চাইলেই যখন পাস, তখন তোর কষ্ট করে চুরি করার দরকার কী ?

বাবা বললে, 'আঃ, সে তুমি বুঝবে না। আচার জিনিসটাই এমন যে চুরি ছাড়া জমে না।' তা, সাত-আট দিন বেশ কেটে গেল। ভূতের উপদ্রব হল না। হঠাৎ ঘটে গেল এক ঘটনা। আমাদের বাড়ি কাজ করে মনুর মা। তার খুব জ্বর হয়েছিল। সবে ছেড়েছে। ভীষণ কিন্তু দুর্বল। আমি পড়ছি ; আর সে ঘরের এক ধারে ধুলোটুলো ঝাড়ছে ঝাড়ন দিয়ে। হঠাৎ একটা বিকট শব্দ। চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, মেঝেতে চুরমার হয়ে পড়ে আছে বাবার সবচেয়ে প্রিয় পাথরের মূর্তিটা। নটরাজ। বাইরে থেকে কিনে এনেছিলেন। মূর্তিটা বসানো ছিল বইয়ের র‍্যাকের মাথায়। মনুর মা মেঝেতে বসে পড়েছে। তার অসুস্থ, রুগ্ণ মুখ ভয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। ভাঙা একটা খণ্ড হাতে নিয়ে বসে আছে অসহায়ের মতো। দু'গাল বেয়ে চোখের জল নামবো নামবো করছে। আমি ভাঙা টুকরোটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বললুম, এ কী করলে ?

বললে বলতেই মা ছুটে এসেছে—কী ভাঙলো ?

আমার ভূতটা বেরিয়ে এল। এসেই বললে, অ্যাকশান, অ্যাকশান, কুইক, কুইক। আমি মনুর মাকে আড়াল করে উঠে দাঁড়ালুম। দাঁড়িয়ে বললুম, 'আমার হাত লেগে মূর্তিটা পড়ে গেছে মা।'

মা দু'হাতে নিজের মাথাটা চেপে ধরে বললে, 'সর্বনাশ ! এ কী করলি ! তোর বাবা অফিস থেকে এসে একেবারে মেরে ফেলবে। ওর সবচেয়ে প্রাণের জিনিস। আমি জানি না বাবা !'

একটা বড় কাগজ এনে চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা টুকরোগুলো কুড়োলুম সব। মনুর মাকে ফিস্ ফিস্ করে বললুম, 'চোখ মোছো। তোমার কোনও ভয় নেই। যা হবার আমার হবে।'

মনুর মায়ের সেই যে তাকাবার ভঙ্গি, আমি জীবনে ভুলবো না। ভূত বললে—এই তোমার পুরস্কার।

আমি একটা পাথর জোড়ার আঠা কিনে আনলুম। জ্যামিতির বাক্স থেকে

pathagar.net

বের করে আনলুম ছোট্ট সরু চিমটেটা। সেই দুপুর। সেই জানালার ধার। বাইরে রোদ-ঝলসানো জ্বলজ্বলে আকাশ। আমার সামনে কাগজের ওপর অসংখ্য টুকরোয় ছত্রাকার নটরাজ। বাবার প্রাণ।

আমার ভূত আমার পাশে বসে আছে। আমার কাঁধে হাত রেখে। সে আমার কানে কানে বললে, ভাঙা জিনিস জোড়া লাগানোই তো সাধনা! শুরু করো। সন্ধের আগেই জিনিসটাকে এমন করে জুড়ে ফেল, যেন তোমার বাবা দেখে আর বুঝতেই না পারেন।

দুপুর ক্রমশ গড়াতে লাগল বিকেলের দিকে। একের পর এক টুকরো ভাঙায় ভাঙা মিলিয়ে জুড়ে চলেছি। সে এক অদ্ভুত নেশা। মাঝে অতি সূক্ষ্ম টুকরোগুলো জুড়তে পারবো কি না বলে সন্দেহ আসছে মনে, তখন আমার ভূত আমাকে শক্তি ধার দিচ্ছে—পারবে, তুমি পারবে। একাগ্রতাই সে শক্তি। সন্ধের ঠিক মুখে, মূর্তি ফিরে গেল যথাস্থানে। বোঝার উপায় নেই।

কোথা থেকে কী হয়! আমি আজ পৃথিবীর একজন বিখ্যাত 'রেস্টোরার'। ভাঙা জিনিস জোড়া লাগাই। বাস করি লন্ডনে। কাজ করি বৃটিশ মিউজিয়ামে। গভীর রাতে চড়া আলোর তলায় টেবিলে বসে যখন কাজ করি—আমার ভূত বলে, কেমন মজা! তখন কিন্তু মনে পড়ে যায় মাকে—সেই আচার। মনে পড়ে যায় মনুর মাকে। মূর্তি ভেঙে বসে আছে, মেঝেতে। অসহায় হাতে একটা টুকরো।

বই নং
তারিখ
ফোন

pathagar.net

ঠিক মাঝরাতে

রাত বারোটা। চারপাশ নিশুতি, নিস্তব্ধ। কলকাতায় সহজে মানুষের ঘুম আসে না। ঘুম না এলেও দেকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। সিনেমার শেষ শো ভেঙে মানুষ বাড়ি চলে যায়। গ্যালিফ স্ট্রিটের ট্রাম ডিপো খাঁ-খাঁ করে। মাইলের পর মাইল নির্জন রাস্তায় ট্রাম লাইন গা এলিয়ে শুয়ে থাকে। গঙ্গা থেকে এঁকেবেঁকে মজা যে খালটা বেলগাছিয়া হয়ে, লবণ হ্রদ পেরিয়ে বেলেঘাটার দিকে চলে গেছে দুর্গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে, সেই খালের বুকে কুয়াশার আঁচলের মতো পাতলা ধোঁয়া উঠতে থাকে। মাঝে গপ গপ করে আগুন জ্বলে। যেন একটা ড্রাগন দিনের শেষে সব কাজ সেরে আঁকাবাঁকা দেহটিকে শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে মেলে একটু রাতের বিশ্রাম নিচ্ছে। এখনও রাগ আছে, তাই নিশ্বাসে আগুন ঠেলে বেরোচ্ছে। খালধারের বটতলায় একটা মোটরগাড়ির বিকল ভাঙা দেহ বহুকাল পড়ে আছে। চারপাশে ফিনকি ফিনকি ঘাস লকলকিয়ে উঠেছে। ওপাশে ভাঙাচোরা লোহা আর কাচের স্তূপ দুটো টিলার মতো পাশাপাশি বসে আসে। যেন দুই প্রহরী, গাড়ির ভাঙা খাঁচাটাকে পাহারা দিচ্ছে। ওপারে খালের জল ঘেঁষে সার সার ঝুপড়ি, গ্যালারির মতো ওপর দিকে উঠে গেছে। সারা দিন টিন মিস্ত্রির যে দোকান বড় বেশি শব্দ করে, সেই দোকান ঝাঁপ টেনে গভীর অন্ধকারে মুখ বুজে পড়ে আছে। কেউ যেন হাত নেড়ে বলে গেছে—চুপ্, আর একটুও শব্দ নয়। পশ্চিমে গঙ্গার দিক থেকে আসছে ফোঁস ফোঁস বাতাসের নিশ্বাস।

শীতও পড়েছে তেমনি। হাড়কাঁপানো। দাদু ফিস ফিস করে বললেন, 'কানে আর মাথায় ভাল করে মাফলার জড়িয়ে নাও। কী রকম শীত পড়েছে। দেখেছ! রাত যেন হি-হি করে কাঁপছে। হাত-পা গুটিয়ে কেমন সব কোণে বসে আছে দেখেছ!'

মুখের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে কথা বলছেন। ল্যাম্পপোস্টের চাপা আলো এসে পড়েছে দাদুর মুখে, মাথায় মাঙ্কি ক্যাপ। চোখ, নাক আর পাতলা ঠোঁট দুটো বেরিয়ে আছে। ফরসা চেহারা। কথা বলছেন, মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। রাত পাছে চমকে ওঠে তাই বাতাসের সুরে যেন কথা বলছেন।

'কোণে কোণে কারা বসে আছে দাদু?'

'দেখেছিস না! রাত জড়ো হয়েছে ঘুপচিতে ঘাপচিতে।'

pathagar.net

বহুদূরে রেলইয়ার্ডের ওপারে গোটাকতক কুকুর মড়াকান্না জুড়েছে। অন্ধকারে বটের পাতা চামচিকির ডানার মতো ভুতুড়ে বাতাসে কাঁপছে। মনে হচ্ছে এখুন গায়ে অন্ধকারের ছিটে লাগবে। কোথাও মনে হয় মালগাড়ি শান্টিং হল। এমন একটা অদ্ভুত শব্দ, যেন মাটির ভেতর থেকে কোনও দৈত্য বড় বড়, ভারী ভারী ঘড়া টেনে বের করছে। কাশীপুরের দিক থেকে ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনের বয়লারের স্টিম ছাড়ার তীব্র শব্দ ভেসে আসছে থেকে থেকে। এই শব্দটা শুনলেই মনে হয় পৃথিবীর পেট থেকে কিছু একটা বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

দাদু বললেন, 'গলার শেষ বোতামটা পর্যন্ত আটকে দে। খুব হাওয়া ছেড়েছে। তারা পর্যন্ত কাঁপছে।'

'তারা হাওয়ায় কাঁপে নাকি ? সে তো অমনি কাঁপে। টুইঙ্কল, টুইঙ্কল লিট্‌ল•স্টার। গ্রহদের নিজের আলো নেই। সূর্যের আলো ধার করে, তাই স্থির। বইয়ে পড়েছি। পরীক্ষায় এসেছিল, পাঁচের মধ্যে পাঁচ।'

'মাঝরাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তক্কো কোরো না।'

'আপনি বলেছিলেন, সব সময় যুক্তি-তক্কো চালাবে, তবেই তুমি নামকরা ব্যারিস্টার হতে পারবে।'

'সে এখন নয়, এখন নয়। দিনের বেলায়।

সামনেই ট্রামলাইনের চারটে লোহার পাত চকচক করছে। আমরা দু'জনে রাস্তার এপার থেকে ওপারে গেলুম। খালের ধারে। ঢালু পাড় নেমে গেছে। নীচে জলের দিকে। এক আঁজলা কালো অন্ধকারের ছলছলে চোখ। দাদু সামনে ঝুঁকে পড়ে, সেই মটোরগাড়ির কঙ্কালের ভেতর টর্চের আলো ফেললেন। অন্ধকার দুপাশে সরে গেল। চোখের ভুল কি না জানি না, এক ঝলকের জন্যে চোখের সামনে ভেসে উঠল, পেছনের আসনে হেলান দিয়ে বসে আছেন একজন পুরুষ একজন মহিলা। শ্বেতপাথরের মূর্তিতে আলো পড়লে যে-রকম দেখায় অনেকটা সেই রকম। চোখের মণি দুটো সাদা। যেন কালো ধুয়ে গেছে। এক ঝলকের দেখা। ভয়ে দাদুর একটা হাত চেপে ধরলুম।

আমি যা দেখলুম, দাদুও তাই দেখলেন কি না আমি জানি না। তবে মনে হল তিনিও যেন ভয় পেয়ে গেছেন। টর্চ নিবিয়ে আবার টর্চ জ্বালালেন। কোথায় কী ? এবার আর কিছুই নেই, মরচে-ধরা লোহার খাঁচা। পাকানো পাকানো চারটে স্প্রিং। প্রাণহীন সব লোহালক্কড়।

দাদুর হাত ছেড়ে দিলুম। আবার যেন সাহস ফিরে এল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, দাদু বললেন, 'তুমি ছোট আছ, একটু উঁকিঝুঁকি মেরে দ্যাখো তো। খাঁজেখোঁজে কিছু আছে কি না ?'

নতুন টর্চ, চারটে নতুন ব্যাটারি। দিনের মতো আলো। ভাঙাগাড়ির ভেতরে

pathagar.net

যত ষড়যন্ত্র, সব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্টিয়ারিং-এর গোল চাকাটা বেঁকে সামনের দিকে ঠেলে উঠেছে। একবার মনে হল, হাত দিয়ে ঘোরালেই 'টাইম মেশিনে'র মতো সময়টাই ঘুরে যাবে।

দাদু বললেন, 'সামনে, ওই ড্রাইভারের বসার জায়গাটা ভাল করে দ্যাখো। ক্লাচ, ব্রেক গিয়ার, ঘুপচিমতো হয়ে আছে। ভয় নেই, ভয় নেই আমি তোমার পেছনেই আছি।'

ভয় নেই বললেই কি আর ভয় চলে যায়। একটু আগে যা দেখেছি, হয়তো চোখের ভুল, তবু ভোলা যায় না। সামনে ঝুঁকে, একটু নিচু হতেই ভয়ে ভেতরটা গুড়গুড় করে উঠল। ব্রেকের কাছে, একমাথা চুল যেন মাটি ফুঁড়ে উঠেছে। এই প্রথম টের পেলুম ভয়ে মানুষের গলা বুজে যায়। ছিলেছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে উঠতেই দাদুর সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল। টর্চটা হাত থেকে পড়ে নিবে গেল। আমি বলতে চাইছি, একমাথা চুল, কি, একচুল মাথা। কী যে বলতে চাই নিজেই জানি না। শুধু চুচু করে চলেছি।

'অ্যাঃ, টর্চটা আবার কোথায় পড়ে গেল।' দাদু নিচু হয়ে খুঁজতে লাগলেন। আমি চুচু করছি।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কী চুচু করছ। কাবাডি খেলছ নাকি ?'

বাতাসে ভয় কিছুটা উড়ে যায়। এবার বাক্য ফুটল। 'ওখানে একমাথা চুল।'

'একমাথা চুল মানে ? মাথাভর্তি চুল !'

'পড়ে আছে পায়ের কাছে। নড়ছে-চড়ছে।'

'চুল আবার নড়ে নাকি ? মাথা যদি নাড়ায় তবেই নড়তে পারে। অ্যাঃ, তুমি ভয় পেয়ে গেছ। দেখি সরো। কেঁপেকুঁপে একেবারে অস্থির !'

দাদুর হাতের টর্চ থেকে আলোর রেখা বেরিয়ে সোজা গিয়ে পড়ল সেই জায়গাটায়। নিচু হয়ে ভাল করে দেখলেন। বড়রা ছোটদের মতো অত সহজে ভয় পায় না। আমিও যখন দাদুর মতো বড় হব আমারও খুব সাহস হবে। বাবার চেয়েও সাহসী। মাঝরাতে অন্ধকারে একাই ছাতে উঠে ঘুরে বেড়াতে পারব। মনেই হবে না পিঠে কেউ সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

দাদু নিচু হয়ে পাশ থেকে গাছের একটা ভাঙা ডাল তুলে নিলেন। মা আমাকে সঙ্গে পাঠিয়েছেন দাদুকে সামলাবার জন্যে। বলা যায় না ঝোঁকের মাথায় কখন কী করে বসেন !

'ডাল কী হবে দাদু ?'

'জিনিসটা কী একবার দেখতে হবে না ?'

'ওটা কারুর মাথা। হয়তো এই গাড়ির ড্রাইভারের। তলায় শুয়ে শুয়ে গাড়ি মেরামত করছিল, কোনওভাবে চাঁদিটা হয়তো আটকে গেছে। গাড়িতে চুম্বক থাকে তো ?'

pathagar.net

'তোমার মাথা।'

দাদু রেগে গেলেন। বড়দের এই দোষ। কথার কোনও ঠিক থাকে না। কথায় কথায় বলেন, ছোটদের অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে উত্তর দিতে হয়, ভুল বললে শুধরে দিতে হয়। মেজাজ খারাপ করতে নেই। ধৈর্য চাই, ধৈর্য। বাবা যখন রেগে কান মলে গাধা বলেন, দাদু এইভাবেই সাবধান করেন। আর এখন যে নিজেই রেগে যাচ্ছেন! বোধহয় ভয়ে।

এক হাতে টর্চ, এক হাতে গাছের ডাল। ডাল দিয়ে জিনিসটাকে একবার খোঁচা মারলেন। কান খাড়া করে ছিলুম। ভেবেছিলুম, খোঁচা খেয়ে এখুনি হয়তো কেউ বলে উঠবে, 'কে রে!' নাঃ, কোনও গলাই শোনা গেল না। রাত নিস্তব্ধ, বাতাসের শব্দ, পাতার খসখস্। জলের ধারে ঝিঁঝির শব্দ।

ডালে গেঁথে জিনিসটাকে কায়দা করে তুলে আনলেন, যেন নরমুণ্ডশিকারি। ভাল করে দেখে হো হো করে হাসতে লাগলেন! কী রকম নাটক করার মতো গলায় বলতে লাগলেন, 'বহুত ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে নকল চুল। এইবার, এইবার কী হয়? এইবার তুমি যাবে খালের জলে।'

'জিনিসটা কী দাদু?'

'থিয়েটারের নকল চুল।'

'এখানে এল কী করে?'

'মনে হয় রঙমহল থেকে কাকে মুখে করে উড়িয়ে এনেছে।'

'তা কী করে হয়?'

'আবার তক্কো! কেন হয় না?'

'প্রথমত রঙমহল এখান থেকে অনেক দূরে। দ্বিতীয়ত, সাজঘরে কাক ঢুকবে কী করে?'

'তুমি একটি গবেট। জানলা গলে এসে, টেবিল থেকে আমার হাতঘড়ি নিয়ে কাক উড়ে গিয়েছিল কী করে? সাক্ষীকে যখন সওয়াল করবে, তখন সব দিক ভেবে করবে। আগে, পরে, জীবনে যা দেখেছ, সব খেয়াল রেখে, তবেই চেপে ধরবে, তা না হলে আদালতে জজসায়েবের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। কেস ফর্দাফাঁই হয়ে যাবে। মনে রাখবে সব সময়, বাঘে বাঘে লড়াই। মক্কেল হল ভেড়া, আর মহামান্য আদালত হল, রাজার সিংহাসন। তুমি প্রমাণ করতে পারো, এটা কাকে উড়িয়ে আনেনি? পৃথিবীর কোনও কাক, কোনও দিন এটা নিয়ে উড়তে পারেনি। বেনিফিট অব ডাউট, অত সোজা ব্যাপার নয়! বুঝলে মাস্টার?'

'বেনিফিট অব ডাউট মানে?'

'ডাউট মানে সন্দেহ।'

'আর বেনিফিট মানে উপকার, তার মানে উপকারের সন্দেহ।'

pathagar.net

'তোমার মুণ্ডু, গ্রামার সব ভুলে গেছ। অব যার আগে বসে, বাঙলায় র তার পরে বসে। ডাউটের আগে অব। তার মানে, সন্দেহের উপকার, বা সুযোগ। যেহেতু প্রমাণ করা গেল না, সেই হেতু আসামী বেকসুর খালাস। কাক কি তোমার তেমন প্রাণী ? তোমার মায়ের স্টেনলেস স্টিলের কত চামচ নিয়ে উড়ে গেছে, খবর রাখো ? সেদিন একটা খুন্তি নিয়ে চলে গেছে। কাক ইজ এ ডেনজারাস অ্যানিমেল। আমার সঙ্গে পারবে না, আমি, এক বাঘা অ্যাডভোকেট।'

'কাককে অ্যানিমেল বলা ঠিক হবে ! অ্যানিমেল মানে তো জন্তু। বার্ড বলুন।'

'শোনো, এটা তর্ক করার জায়গা নয়। আমরা একটা মিশনে বেরিয়েছি।'

'পরচুল গো !' বলে লাঠির আগায় ধরা চুল খালের দিকে ছুড়ে দিলেন। ঘুরতে ঘুরতে এক রাশ অন্ধকার উড়ে গেল চিকচিক জলের দিকে।

আমি বললুম, 'এখানে তা হলে নেই।'

'এখানে মানে ? তোমার সামনে এই যে বিশ্বচরাচর পড়ে আছে, এ কি তোমার এখানের আওতাতেই শেষ হয়ে গেল ! এখান থেকে সেখান, সেখান থেকে সেখান, দূর থেকে আরও দূর। উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণমেরু, দৈর্ঘ্য জানা আছে ?'

'না'

'কী করো সারাদিন ? কেবল ব্যাডমিন্টন আর ক্রিকেট ? পৃথিবীর খবর রাখার চেষ্টা করো না। ভীষণ ব্যাকওয়ার্ড হয়ে যাচ্ছ, সাবধান !'

'কত ? না বকে বলে দিন না।'

'দেখি টর্চটা ধরো। আমার নোটবুকে লেখা আছে।'

টর্চ হাতে নিলেই আমার নেবাতে আর জ্বালাতে ইচ্ছে করে। বেশ লাগে। এই জ্বলছে, এই নিবছে। এই আলো এই অন্ধকার। আর একটা ইচ্ছে, কেউ হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছে, পাশে বসে থাকলে, চুপি চুপি হাত বাড়িয়ে যে-কোনও একটা রিড চুক্ করে টিপে দি। পিঁক করে উঠলেই গাইয়ে চমকে ওঠেন। সুর গোলমাল হয়ে যায়। বেশ মজা লাগে। বকুনি খাবার ভয়ে টর্চের বোতামে আর হাত দিলুম না। দাদু পকেট থেকে ছোট্ট নোটবুক বের করে, পাতা উলটে উলটে একটা জায়গায় থামলেন। আলোর সামনে ফেলে একটু নিচু হয়ে দেখে বললেন, 'ওপর থেকে মাটি ফুঁড়ে সোজাসুজি কেন্দ্র ধরে নেমে এলে বারো হাজার সাতশো তেরো দশমিক দুই পাঁচ কিমি।'

'আর গা বেয়ে হড়কে হড়কে নামলে ?'

'সে পরে, দিনের বেলা বই দেখে বলব। এখন এইটাই মুখস্থ করো, বারো হাজার সাতশো তেরো দশমিক দুই পাঁচ।'

'ভীষণ শীত করছে দাদু।'

pathagar.net

'তা তো করবেই। পড়ার কথা হলেই শীত করবে, দাঁত কন কন করবে, পেট খোঁচাবে, হরেক বায়নাক্কা হবে। সাধে ধড়াদ্‌দুম ঠ্যাঙানি খাও! ওই জন্যে খাও, স্বভাবের জন্যে।'

ঢং করে কোথাও একবার ঘড়ি বাজল। বললুম, বাব্বা, রাত একটা বাজল।'

'কে বলেছে?'

'ওই যে ঘড়ি বাজল।'

'সাড়ে হতে পারে।'

'কোন সাড়ে?'

'যে-কোনও সাড়ে। এগারো, বারো।'

'একে, আর সাড়ে হবে না, দেড়, আড়াই, সেই আবার তিনে গিয়ে সাড়ে। কেন দাদু?'

'নিশ্চয় কোনও ব্যাপার আছে। নিয়ম ছাড়া জগৎ চলে না। আইন ছাড়া আদালতে চলে না। কাল সকালে ব্যাকরণ দেখে বলে দোব।'

দূরে একটা গাড়ির হেডলাইট দেখা গেল। কেমন একা একা ফরফর করে চলে আসছে! দাদু বললেন, 'টর্চ নেবা। শিগগির লুকিয়ে পড়, ভাঙা গাড়ির ওপাশে।'

'কেন দাদু?'

'প্রশ্ন পরে।'

দু'জন লুকিয়ে পড়লুম। একটা জিপ চলে গেল। দাদু মাথা বাড়িয়ে এপাশ ওপাশ দেখে বললেন, 'অল ক্লিয়ার। উঠে দাঁড়াও।'

উঠে দাঁড়াচ্ছি, প্যাঁ করে কে যেন কেঁদে উঠল আমার পায়ের কাছে। উরেব্বাস্। পৃথিবী কাঁদছে। 'দাদু, পৃথিবী বোধহয় কাঁদছে।'

'পৃথিবীর কান্না তুমি কী করে শুনতে পেলে? সে কান্না শুনতে পান মহাপুরুষরা।'

আমি আর একবার পা ফেলতেই বেশ জোরে প্যাঁ শব্দ হল।

'ওই শুনুন।'

'হ্যাঁ রে, তাই তো রে, তোমার দুঃখেই পৃথিবী কাঁদছে।'

দাদু আমার পায়ের কাছে টর্চের আলো ফেললেন। একটা পুতুল পড়ে আছে, সেই পুতুল যার পেট টিপলে, হাওয়া বেরিয়ে শব্দ হয়। তোলার জন্যে নিচু হচ্ছিলুম, ধমক দিলেন, 'খবরদার না। সরে এসো, হাত দিও না। আমি আলো ফেলছি, দেখো তো ফুলটুল কিছু আছে কি না!'

'ফুল? ফুল থাকবে কেন দাদু? এখানে তো ঠাকুর নেই। একটা গাড়ি ভাঙা পড়ে আছে।'

pathagar.net

মুখে মুখে তর্ক না করে যা বলছি তাই দেখ। কিসে কী হয় তোমার জানা নেই।'

সামনে ঝুঁকে ফুল খুঁজতে লাগলুম। টর্চের আলো যেখানে যেখানে পড়েছে, সেই জায়গাটা যেন বিড়বিড় করছে। এতকাল শুনে এসেছি মাটি হল প্রাণহীন বস্তুকণা। মাটিতে প্রাণের জন্ম হয়, তা বলে মাটির কোনও প্রাণ নেই। এ আবার কি অদ্ভুত ব্যাপার, মাটি যেন চালভাজার মতো ফুটছে। মাঝরাতে পৃথিবীর চেহারা কি এইভাবেই বদলে যায় ? কী জানি বাবা ! একে শীত তায় ভয়ে শীত যেন আরো বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের বাড়িতে পুরনো আমলের পেছন-উঁচু একটা চেয়ার আছে। চেয়ারটা বাবা নিলাম থেকে কিনেছিলেন। ইংরেজ আমলের কোন্ এক বড় সায়েব বসতেন। আমার তো কিছুই তেমন মনে থাকে না, খেলার কথা ছাড়া, নামটা ভুলে গেছি। সেই চেয়ারটা রাতে কেমন যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। আপনি আপনি সরে যায়, কেউ যেন ঠেলে সরিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে। নানারকম শব্দ হয়। মা একদিন দুপুরে বসে বই পড়ছিলেন। আমি ঘরের একপাশে বসে ঘুড়ি জুড়ছিলুম। মা একটু করে পড়েন, আর বলেন, 'খোকা ঠেলছিস কেন ?' কী মজা, আমি কোথায় আর মা কোথায় ? শেষে মা ধড়মড় করে উঠে পড়ে বললেন, 'তোর মতো অসভ্য ছেলে যে-বাড়িতে সে-বাড়িতে কারুর কিছু করার উপায় আছে !' আমি বললুম, 'বারে, যত দোষ নন্দ ঘোষ। তুমি রয়েছ দক্ষিণ কোণে, আর আমি রয়েছি উত্তর কোণে তোমার চোখের সামনে, আমি কি ভূত যে এখান থেকে বসে বসে তোমার চেয়ার ঠেলব ?' বড়দের যেমন দোষ আছে, তেমনি গুণও আছে। বোঝালে বোঝেন। আমাদের মতো অবুঝ নন। সেই থেকে মা আর ওই চেয়ারটায় বসেন না। ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে থাকেন।

দাদু হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন, 'ওই যে, ওই যে।'

একটা জবা আর গোটাকতক নয়নতারা ফুল, এক টুকরো ছেঁড়া কাপড় পড়ে আছে।

'এ সব কী দাদু ?'

'তুমি আগে আমার কাছে চলে এসো। পরে প্রশ্ন, মাড়িয়ে ফেলেছ নাকি ?'

'না, মাড়াইনি।'

দাদু আমার মাথায় হাত রেখে বার কতক ইষ্টমন্ত্র জপ করলেন।

'ফুল কোথা থেকে এল দাদু ?'

'ও সব তুমি বুঝবে না। একে বলে ডাকিনীবিদ্যা। এই ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। এই রাত সাধুদের যেমন সাধনার সময়, পাপীদের তেমনি পাপের সময়। আমাদের চারপাশে যেমন দেবতারা ঘুরছেন তেমনি আবার শয়তানও ঘুরছে। এখন কী মনে হচ্ছে জানো ?

'কী দাদু ?'

pathagar.net

'পরচুলটা খালের জলে না ফেললেই হত। আজই সকালে কাগজে পড়লুম, এক অভিনেতার রহস্যজনক নিরুদ্দেশের খবর। তা হলে কি— ?'

'তা হলে কী দাদু ?'

'তিনি কি বেঁচে নেই ?'

'তার মানে ?'

'তুমি ও সব বুঝবে না ছোকরা, এ সব হল আইনের জগতের ব্যাপার। শার্লক হোমস হলে, কি তার সহকারী ওয়াটসন হলে বুঝতে পারতে। একেই তোমার বুদ্ধি কম, তার ওপর এই ঠাণ্ডায় তোমার বুদ্ধি জমে বরফ হয়ে গেছে।'

'এখানে তো নেই। এবার তা হলে কোথায় যাব ?'

'চলো, ওই বটগাছটার তলায়, ওখানে অনেক খাঁজখোঁজ আছে। হাতটা গোল করে আলোর মুখে ধরে দাদু গাছের ডালে মারলেন। আলোর রেখা ডাল স্পর্শ করে সোজা আকাশের দিকে ছায়াপথের মতো উঠে গেল, এই প্রথম অবাক হয়ে দেখলুম, আকাশ পৃথিবী থেকে কত দূরে ! আমাদের টর্চের আলোটা ভুতোমামার তুবড়ির মতোই শক্তিহীন। প্রত্যেক বছর খুব হাঁকডাক করে প্রতিযোগিতায় নাম দেন। তুবড়ি দশ-বারো ফুট তেড়ে উঠেই, দমাস করে খোল ফেটে যায়। একেবারে নাবালক।

বটগাছের ডালে বিউটিফুল একটা ঘুড়ি আটকে আছে। এখনও ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই হয়নি। বুকটা কেমন যেন করছে। দাদুর অনুমতি পেলে, তরতর করে ডালে উঠে গিয়ে ঘুড়িটা পেড়ে আনতুম। এ সব গাছ আমার কাছে কিছুই নয়। দুপুরবেলা অঙ্ক ছেড়ে, অনুবাদ ছেড়ে, গাছে চড়াটা এমন আয়ত্ত করে ফেলেছি, আমার সঙ্গে কেউ পারবে না। আমার যে-যে জিনিস ভাল পারি তার কোনও পরীক্ষা বড়রা কোনওদিন নিতে চান না। তা হলে যে ফার্স্ট হয়ে যাব। ওই যত অঙ্ক কষো, কবিতার লাইন মুখস্থ লেখো। কবিতা তবু ভাল ; কিন্তু ওই ব্যাকরণ ! শব্দরূপ, ধাতুরূপ ! আমি যখন বড় হব, তখন আমি মন্ত্রী হব, শিক্ষামন্ত্রী। সব আমি তখন পালটে দোব।

দাদু বললেন, 'উটমুখো হয়ে কী ভাবছ বলো তো। গাছের ডালে ঈশ্বরদর্শন হল নাকি ?'

'দাদু, ঘুড়িটা পেড়ে আনব ? এক মিনিট সময় লাগবে।'

'একটা ঘুড়ির দাম কত ?'

'ধারে সুতো দেওয়া হলে তিরিশ পয়সা। অর্ডিনারি হলে কুড়ি পয়সা।'

'একটা জীবনের দাম কত ?'

'জীবনের আমার দাম কী ? মানুষ কি কোথাও বিক্রি হয় ? আগে নাকি হত ? কোথায় যেন দাস-ব্যবসা হত। শেকল দিয়ে হাত-পা বেঁধে, চাবুক মারত। এই তো ছিল মানুষের জীবনের দাম ?'

pathagar.net

1 SEP 2005

'অনশন গো কত্তা। স্বদেশী রোগে সরে পড়ল।'

'জোর করে খাওয়াতে পারলে না?'

'কিছু থাকলে তো খাওয়া। স্বাধীন হয়েচি না বাবু? কেউ গাণ্ডেপিণ্ডে খেয়ে মরেচে, কেউ মরেচে না খেয়ে। দেশলাই আছে বাবু? একটা তা হলে বিড়ি খেতুম!'

'আমি বাবা ধূমপান করি না। তোমার হাতেই তো আগুন রয়েছে।'

'দেখেছেন বাবু, মাথাটা একেবারে গেছে। চল রে রঘু, চল, পা চালিয়ে চল বাবা।'

তারা 'হরিবোল' বলতে বলতে চলে গেল। দাদু তারাভরা আকাশের দিকে মুখ তুলে বললেন, 'ভগবান, তোমার কী বিচার!'

দাদু খালের ঢালুর দিকে এগোতে লাগলেন।

'ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন দাদু?'

'খালধারটা একবার ভাল করে দেখি।'

'ওই গড়ানে জায়গায় পড়ে গেলে কী হবে? ওখানে মানুষ যায়?'

মানুষ কোথায় না যায়! স্বর্গে যায়, নরকে যায়। হিমালয়ে যায়, চাঁদে যায়।'

'ও সব যাবার মতো জায়গায়, পচা খালধার একটা যাবার মতো জায়গা হল!'

'বিপদে পড়লে মানুষকে কোথায় না যেতে হয়! ওই তো ওরা শ্মশানে গেল!'

'খালধারে নেই দাদু, থাকলে সাড়াশব্দ পাওয়া যেত।'

'তা ঠিক। চলো তা হলে, ব্রিজের দিকে যাই। ওখান থেকে বাঁয়ে বাঁক নিয়ে, সেই গালা তৈরির কারখানার পাশ দিয়ে, সোজা চলে যাই রেল ইয়ার্ডে।'

'রেল ইয়ার্ডে! সেখানে রাতে কী হয় জানেন?'

'জানি। ওয়াগন ভাঙা হয়, তাতে আমাদের কী! আমরা আমাদের কাজ করব, ওরা ওদের কাজ করবে। রেলইয়ার্ড কারুর একার সম্পত্তি নয়, সকলের। কেউ যদি বলে আমার একার, তার নামে একটা কেস ঠুকে দোব। নাও চলো, তোমার ভয় করছে? ভয় করলে বাড়ি চলে যাও। মনে আছে, শেক্‌সপিয়ার কী বলেছিলেন? ভীরু প্রকৃত মরার আগে হাজারবার ভয়ে মরে, সাহসী মরে একবার।'

আমি কাঁদো-কাঁদো গলায় বললুম, 'চলুন তা হলে।'

আমাদের পেছনে গাড়ির ভাঙা খাঁচাটা হঠাৎ একবার কেঁপে উঠল। দাদু চমকে পেছনে ফিরে তাকালেন। টর্চ ফেললেন। কটমট, কটমট শব্দ হচ্ছে। কেউ যেন হাড় চিবোচ্ছে। দাদু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন।

pathagar.net

'খুব পেকেছ। আর কেনই বা পাকবে না! যা দিনকাল পড়েছে! এখন ফল পাকে না। মানুষ অকালে পেয়ে যায়'।

দাদু টর্চ নামিয়ে গাছের গোড়ায় আলো ফেললেন। উঁচু ঢিবির ওপর সিঁদুর মাখানো একটা গোল পাথর দেবতা হয়ে বসে আছেন। সকালে মনে হয় ফুল দিয়ে পুজো হয়েছিল। দুটো ধেড়ে ইঁদুর আলোর ভয়ে ন্যাজ গুটিয়ে কোটরে গিয়ে ঢুকল। দু জোড়া চোখ জ্বলছে! কী সাংঘাতিক দৃষ্টি। রাতে যেন গাছতলায় মানুষের আসা বারণ।

দাদু বললেন, 'নাঃ, ত্রিসীমানায় নেই। কোন্ চুলোয় মরতে গেল কে জানে?'

'এবার দাদু আর ভাল লাগছে না, বাড়ি চলুন। এবার পুলিশ এসে ধরবে!'

'আঃ, তা হলে বেঁচে যাই। আমাকে আর কষ্ট করে যেতে হয় না। পুলিশকেই তো আমি চাইছি এখন। মনে হচ্ছে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোতে পারে।'

ব্রিজের দিক থেকে নেচে নেচে একটা লণ্ঠনের আলো এগিয়ে আসছে। লোকটি কী বোকা! বোধহয় গ্রামের মানুষ। কলকাতার রাস্তায় যে আলো জ্বলে জানা নেই। ও বাবা, একজন নয়! অনেকে আসছে। ছেলেধরা নয় তো? দাদুর গা ঘেঁষে দাঁড়ালুম।

'কারা আসছে বল. তো?'

'ছেলেধরা।'

'গাধা! রাতে কেউ ছেলে ধরতে বেরোয়? মনে হয় মাছ ধরতে যাচ্ছে। দেখছ না, হাতে লণ্ঠন রয়েছে।'

দলটা কাছাকাছি আসতেই কানে এল, 'বলো হরি, হরি বোল।' থেমে থেমে হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে। মাঝরাতে কতদিন এই শব্দ শুনে মাকে আঁকড়ে-মাকড়ে ধরেছি। মনে হয়েছে কেউ যেন আমাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে। ছেলেধরা বলেছিলুম, ঠিকই বলেছিলুম।

দলটা আমাদের কাছাকাছি আসতেই লণ্ঠন হাতে দলপতি থমকে দাঁড়ালেন। সন্দেহের চোখে দাদুর বিশাল চেহারার দিকে তাকিয়ে কী ভাবলেন কে জানে, বেশ ভক্তিভরে বললেন, 'সেপাইজি, কাশীমিত্তির আর কতদূরে?

দাদু বললেন, 'আমি সেপাই নই গো কত্তা। কাশীমিত্তির প্রায় এসে গেছে। সোজা চলে যাও। কোথা থেকে আসা হচ্ছে?'

'বিষ্টুপুর।'

'কে গেল?'

'বউটা গেল গো?'

কী হয়েছিল?

pathagar.net

'ওরে ব্যাটা তুই ?

'কে দাদু ?'

'একটা কুকুর।'

আমরা ব্রিজের দিকে এগিয়ে চললুম। পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকিয়ে আছে তারারা। মা বলেন, ওরা সারারাত ধরে সেই সব ছেলেমেয়েদের খোঁজে যারা ভাল কাজ করে, মা-বাবার কথা শোনে, লেখাপড়া করে, ভাইবোনদের মারধর করে না। খুব ভাল হলে, আকাশে একটা তারা বেড়ে যায়। রোজই নাকি বাড়ছে, আমরা হিসেব রাখি না, জানতেও পারি না। তারা যে ছাই গোনা যায় না।

এই রাতে টালার ব্রিজটাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে। কালো ঢেউয়ের মতো এই উঠছে এই পড়ছে। সার সার আলো রাত-জাগা ছেলের মতো পরীক্ষার পড়া তৈরি করছে। ব্রিজের তলায় রেলইয়ার্ড। এক সার মালগাড়ি বিশ্রাম করছে। বেলগাছিয়ার দিক থেকে ভেসে আসছে হালকা একটা সানাইয়ের সুর।

দাদু বললেন, 'চারপাশে খুব বিয়ে লেগেছে। কেমন সানাই ভেসে আসছে শুনেছ! মন খারাপ করে দিচ্ছে।'

ব্রিজ থেকে এদিকে-ওদিকে সিঁড়ি নেমে গেছে ধাপে ধাপে। আমরা বাঁ দিকের সিঁড়ি ধরে ধাপে ধাপে নামতে শুরু করলুম। বাব্বা, ব্রিজের তলায় যেন মানুষের হাট বসে গেছে! সব শুয়ে আছে গড়াগ্‌গড়। যে যা পেরেছে মুড়ি দিয়েছে আপাদমস্তক। এক কোণে একটি মাত্র আগুনের ফুট্‌কি বড় হচ্ছে, ছোট হচ্ছে। ঘুম আসেনি, কেউ একা বসে বসে বিড়ি খাচ্ছে। কাশির শব্দ হল, হ্যা হ্যা খ্যা খ্যা।

'উঃ, মানুষের কী অবস্থা দেখেছ! গোরুরও একটা খাটাল জোটে!'

'মানুষ যে দুধ দেয় না দাদু!'

'অ্যায়, ধরেছ ঠিক। মানুষের দুধ কী ?

'বিদ্যা, গুণ।'

'কথাটা তা হলে মনে রেখো। জ্ঞানপাপী হয়ে বসে থেকো না।'

'আমি তো এখনও ছোট, তাই মাঝে মাঝে ভুলে যাই। বড় হই তখন দেখবেন। চাকরি করে প্রথমে মাইনে পেয়ে কী কী কিনব জানেন ?'

'কী কিনবে।'

'বিশাল বড় একটা বোমলাটাই, চার কাঠিম সুতো, দুশো চাঁদিয়াল ঘুড়ি, এক বাক্‌সো গুলি, দু'ডজন লাট্টু, একটা এয়ারগান, অনেক অনেক লজেন্স আর চকোলেট, চারটে পকেট সব সময় একেবারে ঠেসে রাখব। টিনুকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাব।'

pathagar.net

'মিনুর ওপর তোমার এত রাগ কেন ?'

'মা ওকে বেশি ভালবাসে।'

'হিংসে। হিংসেতে তোমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।'

শ্রীকান্ত চ্যাটার্জি লেনের মোড়ের ডাক্তারখানার ভেতরে আলো জ্বলছে। বন্ধ দরজার তলায় আলোর রুলটানা। ভেতরে মনে হয় দু-তিন জন রয়েছেন। চাপা গলায় কথা হচ্ছে। ওরই মধ্যে একজন বেশ উত্তেজিত। হঠাৎ ঝড়াস করে দরজা খুলে গেল। এক ঝলক আলো ছিটকে রাস্তায় নেমে এল। দরজার সামনে কালো ছায়ার মতো বিশাল একজন মানুষ। টাকে আলো পড়ে চকচক করছে। ভদ্রলোক খুব রেগে গেছেন। তেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছেন, ভেতর থেকে একজন হাত চেপে ধরে বলছেন, 'কী ছেলেমানুষি হচ্ছে অসীম এই রাত একটার সময় !'

ব্রিজের অন্ধকার ছায়ায় আমি আর দাদু লেপ্টে আছি। বেশ ভয়-ভয় করছে। আমি দেখেছি যখনই আমার মনে হয় এইবার কিছু হবে তখনই একটা কিছু হয়।

যে লোকটির হাত চেপে ধরা হয়েছিল, তিনি এক ঝটকা মেরে বললেন, 'না, আমি তোমাদের কোনও ব্যাপারে থাকতে চাই না। আমাকে ছেড়ে দাও।'

ভদ্রলোক ছিটকে রাস্তায় বেরিয়ে এসেই, কেমন যেন টলমল করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে পথেই বসে পড়ছেন। বুকে হাত চেপে ধরেছেন। দোকানের ভেতর থেকে দু'জন বেরিয়ে এসে বলছেন, কী, হল কী ? অমন করছ কেন ?

'হা, হা।'

একজন বললেন, 'আরে ওর তো হার্টের গোলমাল ছিল। অ্যাটাক হয়েছে। ছেলেটাকে তুমি কোথায় রেখেছ ? ছেলেটাকে ?'

'মা, মা।'

'শেষ সময়, মাকে ডেকে কী হবে ? তুমি সব গোলমাল করে দিলে ! ছেলেটাকে রাখলে কোথায় ?'

আমরা দু'জন অন্ধকারে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছি। দাদু এক হাতে আমার মুখ চেপে ধরে আছেন। বলা যায় না, আমি হঠাৎ কথা বলে ফেলতে পারি। কী যে হচ্ছে, কে জানে ? দু'জনের একজন আমাদের দিকে তাকালেন। গলা চড়িয়ে বললেন, 'কে ওখানে, কে ?'

আমরা আর একটু অন্ধকারের দিকে সরে এলুম। সাড়াশব্দ না পেয়ে আর একজন বললেন, 'আরে, আজ দুপুর থেকে ওখানে এক পাগলা এসে আস্তানা নিয়েছে। নে চল, ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে যাই। নে এবার খুনের দায়ে না পড়তে হয় !'

pathagar.net

ভদ্রলোককে চ্যাঙদোলা করে ভেতরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। যাক বাবা, বাঁচা গেছে। পায়ে যা মশা কামড়াচ্ছিল! দাদু ফিসফিস করে বললেন, 'পা চালাও, আর এখানে নয়। লোক তিনটেকে আমার তেমন সুবিধের মনে হচ্ছে না হে! যদি মারা যায়, এও একধরনের মার্ডার। জানে হার্টের রুগী, তাও হাত ধরে টানাটানি, ধাক্কাধাক্কি। আমি আর তুমি সাক্ষী রইলুম। প্রয়োজন হলে আদালতে যেতে হবে।

'দাদু ভদ্রলোক হা হা করে হার্ট বোঝাতে চাইছিলেন, মা মা বলে কী বলতে চাইলেন?'

'ওই দেখ, তুমি একটু আগে মায়ের বিচার করছিলে, তাই না! মা ছাড়া জগতে কেউ নেই। বুকের যন্ত্রণার অত বড় একটা লোক, সেও মা মা করে মাকে ডাকছে! দেখে শেখো।'

'আমার হার্ট খুব ভাল।'

'মনে তো হয় না, তোমার বোনের ওপর যা হিংসে!'

'ও সেদিন দুপুরে একা একা আইসক্রিম খেয়েছে। আমার জন্যে রাখেনি কেন?'

'গবেট! সময় আর আইসক্রিম কারুর জন্যে রাখা যায় না। গলে বেরিয়ে যায়। লেখাপড়া শিখে তোমার যা বুদ্ধি হচ্ছে! সারা জীবন ধোপার কাপড় না বইতে হয়!'

কথা বলতে বলতে আমরা শ্রীকান্ত চ্যাটার্জি লেনে ঢুকে পড়েছি। এখন বেশ ভালই লাগছে। একটা অ্যাডভেন্চারের গন্ধ পাচ্ছি। দাদু পুট্ করে টর্চের বোতাম টিপলেন। নর্দমার পাশে জলা জায়গায় বুনোগাছের ঝোপে দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে। কী রে বাবা, বাঘ নাকি! হতেও পারে। কাগজে দিয়েছে, পাটনার রয়াল সার্কাসের বাঘটা পালিয়েছে। বলা যায় না, জি টি রোড ধরে বেড়াতে বেড়াতে হয়তো কলকাতায় চলে এসেছে। সামনের বাড়ির নীচের ঘরে কাশির শব্দ হতেই দাদু টর্চ নিবিয়ে দিলেন।

'ঝোপের মধ্যে ওটা কী দাদু!'

'কুকুরবাচ্চা। শীতে কাঁপছে। আমাদের দেশের কুকুররা বড় অবহেলিত। দেখার কেউ নেই। এত সব প্ল্যান হচ্ছে, কুকুরদের জন্যে কোনও প্ল্যান নেই। একটা করে ডগ হাউস বানাতে পারে। কত আর খরচ!'

'হট হাউস কাকে বলে দাদু?'

'হট হাউসে গাছপালা রাখে, সে আলাদা জিনিস।'

আমরা হাঁটতে শুরু করলুম। রাত যত বাড়ছে কুয়াশায় চারপাশ ঝাপসা হয়ে আসছে। ব্রিজের ওপরে সার-সার বাতির চোখে যেন ধীরে ধীরে ছানি পড়ে আসছে। কিছু দূরেই একটা ব্যায়াম সমিতি। নাম লেখা বোর্ডের ওপর আলো

pathagar.net

ঝুঁকে আছে। নামটা ভারি সুন্দর, 'ভাস্কো ডা গামা স্পোর্টিং ক্লাব'। সামনে একটা খোলা জায়গা। ফুলগাছ দিয়ে ঘেরা। তাজা তাজা গাঁদা ফুটেছে। ক্লাবটাকে দেখলেই ভাল লাগে। পাকা বাড়ি নয়, আটচালা। রেখেছে বেশ সুন্দর করে।

টুং টাং, লোহায় লোহা ঠোকার শব্দ আসছে। এত রাতে কে আবার কী করছে! আর একটু এগিয়েই আমরা অবাক হয়ে গেলুম। বিশাল চেহারার এক ব্যায়ামবীর, একা একা দু'পা ফাঁক করে বারবেল ভাঁজছেন। গায়ে একটা স্যান্ডো গেঞ্জি। সাদা শর্টস। দু কবজিতে দুটো সাদা ব্যান্ড।

'দাদু, এত রাতে কেউ ব্যায়াম করে! এখন তো ঘুমোবার সময়!'

'আমরা কী করছি?'

'আমাদের কথা আলাদা।'

21 SEP 2005

'যার যখন সময় হয়।'

ধাম্ করে বারবেলটা পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে, ব্যায়ামবীর বুক চিতিয়ে হাঁপাতে লাগলেন। হঠাৎ আমাদের দেখে তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস থমকে গেল। জিজ্ঞেস করলেন, 'দাদা, নাইট শো'র সিনেমা ভাঙল?'

'সিনেমা। সিনেমার খবর রাখি না। বেশ তো ব্যায়াম হচ্ছিল, আবার সিনেমার খবর কেন?' দাদু সিনেমার নাম শুনলে ভীষণ রেগে যান। ব্যায়ামবীর হাতের গুলি নাচাতে নাচাতে বললেন, 'ওইটাই আমার ঘড়ি।'

কথা শেষ করেই তড়াক করে লাফিয়ে রিঙে উঠে বার্ড হয়ে ঝুলতে লাগলেন। অদ্ভুত ব্যাপার! গভীর রাত, কেউ কোথাও নেই। শীতে সব কাঁপছে, একা মানুষ ব্যায়াম করে চলেছেন।

দাদু বললেন, 'বুঝলে, একে বলে সাধনা। সারাদিনে সময় হয় না, তাই এই সময়টি বেছে নিয়েছে। চেষ্টা না থাকলে, মানুষের কিছু হয় না। ফাঁকি দিলে ফাঁকেই পড়তে হয়।'

'যাই বলুন, এই সময়ে পৃথিবীর কেউ ব্যায়াম করে না। আমি শুনিনি।'

'তোমার বয়েস কত হল যে এরই মধ্যে সব শুনে বসে আছ? নাও, নাও চলো।'

শ্রীকান্ত চ্যাটার্জি লেন সাপের মতো এঁকেবেঁকে রেল ইয়ার্ডের দিকে চলে গেছে। আমরা এবার চলেছি পশ্চিম দিকে। গঙ্গার হাওয়ায় হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। দাঁতে দাঁতে, পায়ে পায়ে ঠক ঠক করে ঠোকাঠুকি হয়ে যাচ্ছে।

রাস্তাটার শেষ মাথায় বেশ বড় একটা বাড়ি। সবুজ রঙ। চারপাশে টুনির মালা, ফোঁটা ফোঁটা তারার মতো নরম সুরে জ্বলছে। ঝলমলে আলোর মালা দেখলে আমার ভীষণ আনন্দ হয়। মনে হয় 'আরব্য উপন্যাসের' দেশে চলে গেছি। রাজকন্যা, পক্ষিরাজ, সোনার কাঠি, রুপোর কাঠি। বাড়িটার ঢোকার মুখে আবার নহবতখানা বসিয়েছে, ঝালরে আলোর মালা।

pathagar.net

'দাদু, আমাকে এ বছর আলোয়ারে নিয়ে যাবেন ?'

'এত জায়গা থাকতে আলোয়ার ?'

'ওই যে দেখুন ঝালরে কেমন আলো দুলিয়েছে। আমার ভীষণ রানা প্রতাপকে দেখতে ইচ্ছে করে, বুন্দির রাজাকে দেখতে ইচ্ছে করে।'

'বুঝেছি, এ সবই হল সিনেমা দেখার কুফল। খুব টিভি দ্যাখো আর গল্পর বই পড়ো।'

আজ দেখছি কথায় কথায় আমার খুব বকুনি হচ্ছে। দাদুর মেজাজ তেমন ভাল নেই। কী করে থাকবে ! শীতের অন্ধকার রাতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হলে আমারও মেজাজ চড়ে থাকত। আমরা বাড়িটার গেটের সামনে আসতেই এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন, মাথায় সাতপ্যাঁচ মাফলার জড়ানো। বেশ মোটাসোটা থলথলে চেহারা। লুঙ্গির ওপর কোট পরেছেন। চোখে চশমা। হাতে রুমাল আর নস্যির ডিবে। নাক টানলেন ফাঁ করে, কী শব্দ ! যেন জেটপ্লেন উড়ে গেল রাত কাঁপিয়ে। ভদ্রলোক আমার দাদুর পরিচিত। দাদু বললেন, 'এই যে বিধান, ঘুম ভাঙল ?'

'আরে মুকুজ্যেমশায় যে ! মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছেন ?'

'মর্নিং এখন অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত এসেছে। ভারত মহাসাগর পেরোবে, বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে আমাদের আকাশে আসতে এখনও ঘণ্টা ছয়েক লাগবে।'

ভদ্রলোক মামলার কথায় চলে এলেন, 'জালানকে ভাবছি এবার একটু টাইট দোব।'

'কাল তোমার মেয়ের বিয়ে। ভালয় ভালয় সেইটা আগে শেষ করো, তারপর মামলার কথা ভাবা যাবে। আদালতের কোনও লগ্ন নেই।'

'দয়া করে একটু পায়ের ধুলো দিন না।'

'এই মাঝরাতে ?'

'আমরা তো তিনরাত জেগে আছি। মেয়ের বিয়ে চাট্টিখানি কথা ! আসুন, আসুন ভিয়েন হচ্ছে। দেখলে আনন্দ পাবেন। টাবুর টুবুর পানতুয়া। আমার লাইফে অত পানতুয়া আমি একসঙ্গে কখনও দেখিনি। রসে হাবুডুবু খাচ্ছে।'

'তাই নাকি, তাই নাকি ?'

দাদু বড় বড় পা ফেলে গেটের দিকে চললেন। দুটো জিনিস দাদু ভীষণ ভালবাসেন, পানতুয়া, আর পাকা পেয়ারা। ভেতরের উঠোনে শামিয়ানা পড়েছে। গনগন করে উনুন জ্বলছে। বেশ জমজমাট ব্যাপার, মনে হয় না রাত হয়েছে। যেন এই সবে সন্ধে হল। বিশাল কেটলিতে চায়ের জল বসেছে। সিঁ সিঁ করে শব্দ হচ্ছে। কম বয়সী এক ভদ্রলোক ফর্দ করতে বসেছেন। তিনি কেবল বলছেন, 'দাদা, তাড়াতাড়ি বলো মাছ কতটা, ভোর হয়ে এল,

pathagar.net

লগন্‌সার বাজার, শেষ রাতে গিয়ে ধরতে না পারলে পাকা বিশ-তিরিশ কেজির মাছ পাব না।'

'আহা, তুই আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন ? ঠাকুরমশাইকে জিজ্ঞেস কর।'

'আঃ, ঠাকুরমশাই এই সময় আবার ফুড়ুত করে পালালেন কোথায় ?'

'আপনি ব্যস্ত হবেন না বাবু। আসছে আসছে, একটু দম নিতে গেছে।'

'হ্যাঁগা, দেরাজের চাবিটা রাখলে কোথায়, সুমি দুলটা একবার দেখতে চাইছে।'

'চাবি তো তোমার কাছে!'

'কী সর্বনাশ! চাবি তো তোমার কাছে! সন্ধেবেলা সেজ ঠাকুরপোকে দইয়ের অ্যাডভান্‌স বের করে দিয়ে তোমাকে দিলুম না! পাঞ্জাবির পকেটে রাখলে!'

'পাঞ্জাবি তো ছেড়ে ফেলেছি, হ্যাঙারে ঝুলছে।'

'তোমাকে নিয়ে সত্যি আমি আর পারব না। পাগল হয়ে যাব।'

'আসুন মুকুজ্যেমশাই, এদিকে আসুন, পানতুয়ার বাহার দেখে যান। গণেশ, মুকুজ্যেমশাইকে এক ভাঁড় চা দিস। খোকা, তমি চা খাও ?

'না, আমি চা খাই না।'

'তা হলে তুমি পানতুয়া খাও।'

গামছায় হাত মুছতে মুছতে ঠাকুর এলেন, 'পানতুয়ায় বাবু এখন হাত দেওয়া চলবে না। সেট করেনি, চমকে দিলে মাল নষ্ট হয়ে যাবে। এক নজর শুধু দেখে নিন। বেশি নজর দিলে মাল এলে যাবে।'

'সে কী, আমি যে মুকুজ্যেমশাইকে ডেকে আনলুম।'

'আমাদের বাবু কিছু তুকতাক আছে। কাল খাবেন। বারো-চোদ্দ ঘণ্টার ব্যাপার তো!'

সার সার টবে টাবুর টুবুর পানতুয়া। গন্ধে একেবারে মাত করে দিচ্ছে। আরশোলার মতো রঙ ধরেছে। এক-একটার সাইজ কী, ঠিক যেন টেনিস বল। দাদু আর আমি দু'জনেই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি হাঁ করে। এক সঙ্গে এত টগরবগর পান্তুয়া জীবনে দেখিনি। নতুন মাটির গেলাসে চা এসে গেল দাদু আর ভদ্রলোকের জন্যে। গেলাসের মাটি চা টানছে, সিঁ সিঁ শব্দে।

ভদ্রলোক বললেন, 'এত রাতে এমন সেজেগুজে নাতিকে নিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন মুকুজ্যেমশাই ?'

'আর বোল না, একেই বলে কপালের গেরো। টুসিকে খুঁজতে বেরিয়েছি।'

'টুসি ? টুসি কে ?'

'জজসায়েবের স্ত্রী আদর করে একটা কাবলি বেড়াল দিয়েছিলেন আমার মেয়েকে। সেই বেড়াল সন্ধের মুখে নিরুদ্দেশ। সাতটা বাজে, আটটা বাজে,

pathagar.net

ফেরার নাম নেই। মেয়ে তো কেঁদেকেটে অস্থির। যত রাত বাড়ে ততই বলে, এই শীতের রাত, বিশাল এই পৃথিবী, কত রকমের বিপদ, পথ ভুলে কোথায় গিয়ে বসে রইল, কি মরেই গেল, ধেড়ে ধেড়ে কুকুর ঘুরছে। খাওয়াদাওয়া শিকেয় তুলে সে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে হাপুস নয়নে কাঁদছে। মায়া বিধান, মায়া। জগৎটা মায়ার বাঁধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।'

'কাবলে বেড়াল কী রকম দেখতে হয় মুকুজ্যেমশাই ?'

'আহা, সে রূপের কোনও তুলনা হয় না। সাদা ধবধবে। চামরের মতো ন্যাজ। মিষ্টি এতটুকু মুখ। মিউ করে যখন ডাকে, মনে হয় পিয়ানো বাজছে। মানুষ তার কাছে লাগে না। ও সব হল কোলে কোলে থাকার জীব। চললুম হে। কাল দেখা হবে। হ্যাঁ, কালকের মেনুটা একবার শুনে যাই, ফিশফ্রাই থাকছে ?'

'ফিশফ্রাই ছাড়া চলে ! ফ্রাই থাকছে, মটন দোপেঁয়াজা থাকছে, রাতাবি সন্দেশ থাকবে, ভুলভুলাইয়া চাটনি থাকবে।'

'সে আবার কী জিনিস ?'

'আমিও ঠিক জানি না। আমাদের ঠাকুরের নতুন আবিষ্কার।'

'সাসপেন্সে রইলুম। দইটা বেশ জমবে তো ?'

'এ-ক্লাস দোকানের সুপার ক্লাস জিনিস ॥'

'মাথাটা যেন আমার জন্যে থাকে।'

'সে আর বলতে ? চল্লিশটা মাথা। কটা খাবেন খান না। ফাটাফাটি ব্যাপার।'

রাস্তায় নেমে দাদুকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'দই কি রাবণরাজা ? চল্লিশটা মাথা ?'

'তুমি সত্যিই একটি গবেট। চল্লিশ হাঁড়ি দই আসবে। চল্লিশের চল্লিশটা মাথা। তোমার কমনসেন্স একেবারে নেই। আইনে তুমি সুবিধে করতে পারবে না।'

'আমি তো আরও বড় হব।'

'বাচ্চা গাধাও গাধা, বড় গাধাও গাধা। দেহটাই বাড়বে। মগজ টুঁ টুঁ।'

হাঁটতে হাঁটতে আমরা রেল ইয়ার্ডে এসে পড়লুম। একেবারে ভুতুড়ে জায়গা। ডান পাশে বিশাল একটা গোরস্থান। এইবার আমার ভীষণ ভয় করছে। মা বলে ডাকতে ইচ্ছে করছে। মা এখন টুসি টুসি করছেন। আমার চেয়ে টুসি আদরের। কত কি ভাল ভাল জিনিস খায় ! আমি যদি টুসি হতুম !

'বেড়ালকে কী ভাবে ডাকতে হয় জানো ?'

'চুকচুক করে।'

'সঙ্গে একটা আয় যোগ করো, আয় আয়, চুকচুক

pathagar.net

'দাদু, আমার মনে হচ্ছে, বেড়াল এভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। বেড়াল খোঁজার অন্য কায়দা আছে।'

'যা বলি তাই করো, মাঝরাতে তক্কো করো না। নাও, ওই মালগাড়িটার তলায় নিচু হয়ে যা বললুম তাই করো। আমি আলো নিবিয়ে রাখছি। বাঘে আর বেড়ালে বিশেষ তফাত নেই। আলো দেখলেই ভয় পেয়ে যাবে।'

যেই না আয় আয়, চুক চুক করেছি, সাত দিক থেকে সাতটা, সাত রকম চেহারার কুকুর ছুটে এসে আমাদের গোল করে ঘিরে ন্যাজ নাড়তে লাগল।

'দাদু, টুসি আর এখানে নেই, ওদের পেটে আছে।'

'হ্যাঃ, তুমি সব জানো! অত সহজে বেড়াল কুকুরের পেটে যেতে পারে না। বেড়াল হল বাঘের মাসি। অলক্ষুণে কথা যত কম বলো ততই ভাল।'

'এইবার এদের নিয়ে কী করবেন? সব কটা মুখের দিকে তাকিয়ে পটাপট্ ন্যাজ নাড়ছে।'

'কী আর করব, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকব। ন্যাজ নাড়তে নাড়তে একসময় ক্লান্ত হয়ে চলে যাবে।'

অনেক দুরে ভারী একটা কিছু পড়ার শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুর সাতটা ভেউ ভেউ করে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে সেই দিকে ছুটল।

'দাদু, আবার চুকচুক করব?'

'না হে, জায়গাটা তেমন সুবিধের নয়। এখানে সাবধানে চোরের মতো কাজ করতে হবে। ওয়াগন ব্রেকারের উৎপাত আছে। বেশি গোলমাল করলে গুলি করে শেষ করে দেবে। এখন আমরা শুধু চাকার তলায় তলায় উঁকি মেরে দেখব। শীতে কোথাও জবুথবু হয়ে বসে আছে কি না।'

'এই অ্যাতো মালগাড়ি, জোড়া জোড়া চাকা, সব কি দেখা যাবে দাদু?'

'যাবে না বলে কিছু নেই, যাওয়াতে হবে।'

ট্রেন ইন্সপেকটারের মতো আমরা দু'জনে মালগাড়ির চাকার তলায় উঁকি মারতে মারতে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছি। আজ বরাতে কী আছে ভগবানই জানেন। একটা মালগাড়ি যে কত লম্বা হতে পারে আমার দাদুও জানতেন না। আমরা ন্যাজ ছেড়ে মালগাড়ির পেটের কাছে চলে এসেছি। মুখ আসতে এখনও অনেক দেরি। হঠাৎ কানে একটা শব্দ এল। কে যেন খুব সরু গলায় ডাকছে, মা, মা।

আমার কান খাড়া হবার আগেই, দাদুর কান খাড়া ছিল।

'ওই শোনো, টুসি ডাকছে।'

'ঠিক যেন মানুষের গলা দাদু।'

'পশুতে আর মানুষে তফাত কতটুকু বুনো!'

pathagar.net

যাক বাবা, সারাদিনে দাদু এই একবার আমাকে 'বুনো' বলে ডাকলেন। এ ডাক হল আদরের ডাক। 'মা, মা' ডাকটা আর বারকয়েক হয়ে থেমে গেল।

'ডাকটা কোথা থেকে আসছে বলো তো?'

'মালগাড়ির এই কামরাটার ভেতর থেকে।'

'ঠিক শুনেছ? এর ভেতর ঢুকল কী করে! নিশ্চয় মাছের গন্ধ পেয়েছে!'

দাদুর কথা শেষ হতে-না-হতেই স্পষ্ট কানে এল শিশুর গলা, 'মা, জল।'

আমি আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললুম, 'দাদু টুসি কথা শিখে গেছে। মায়ের কী ট্রেনিং!'

'চুপ।' দাদু ধমকে উঠলেন। 'এ টুসি নয়, বাচ্চার গলা, এর মধ্যে বন্দী হয়ে আছে। দাঁড়াও, দাঁড়াও।'

কোনও কিছু ভাবার সময় দাদু দাঁড়াতে বলেন।

'হয়েছে, হয়েছে, আজই সকালে কাগজে পড়লুম, কলকাতার এক ধনী ব্যবসায়ী বলরাম দাসের ছেলের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না সারা কলকাতা তোলপাড় হচ্ছে। পঞ্চাশ হাজার টাকা রিওয়ার্ড ঘোষণা করেছেন। কী কাণ্ড, সেই ছেলে, এর ভেতর ঢুকে বসে আছে!'

'কাল কলকাতায় কী ছিল দাদু! এত লোক নিরুদ্দেশ হয়ে গেল? মেলা ছিল নাকি!'

'তোমার মুণ্ডু ছিল। কলকাতায় রোজ কত লোক নিরুদ্দেশ হয় জানো! নষ্ট করার মতো আর সময় নেই। এখুনি উদ্ধার করতে হবে। আহা বেচারা!'

দাদু হাতের আড়াল করে টর্চের আলো ছুড়লেন। দরজায় ঢাউস এক তালা ঝুলছে।

'সেরেছে, এ যে দেখছি বিশাল এক তালা ঝুলছে! ভাঙতে হবে।'

'একজন ওয়াগন-ব্রেকারকে ডেকে আনবো? ওরা ঝট করে ভেঙে দেবে।'

'পাগল হয়েছে। হাতে দড়ি পড়ে যাবে, কি বুকে বুলেট!'

ঘ্যাড়াং ঘ্যাড়াং করে সাংঘাতিক এক শব্দে রাত কেঁপে গেল। গাড়ির বগিগুলো সামনে পেছনে দুলে উঠল।

দাদু চমকে উঠে বললেন, 'কী হচ্ছে বলো তো!'

'বোধহয় ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট হচ্ছে দাদু। ও তো রোজই একটা করে হয়, আজই বা কেন বাদ থাকে!'

মালগাড়িটায় হঠাৎ যেন কিসের টান ধরল। ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগোতে লাগল। দাদু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'ধরো, ধরো, পালাচ্ছে।'

কী যে বলেন দাদু! যারা একটা বেড়াল ধরতে পারে না, তারা ধরবে এত বড় একটা মালগাড়ি!

pathagar.net

গাড়ির গতি বেড়ে গেছে। ঘটাং ঘটাং করে সামনে এগিয়ে চলেছে। দাদু বললেন, 'নাম্বার লিখে নাও, নাম্বার লিখে নাও।'

'মোটরগাড়ির নম্বর থাকে পেছনে। মালগাড়ির নম্বর কোথায় দাদু ? এর তো আষ্টেপৃষ্ঠে সর্বত্র কত কী লেখা। ওই যে আপনি টর্চ ফেলেছেন, লেখা রয়েছে, এম. টি. আবার তার পাশেই লেখা টি. আর। তার মানে ?'

'তোমার কোনও জেনারেল নলেজ নেই। এত বড় ছেলে হলে ! তোমার বয়সের অন্য ছেলেরা কত কী জানে ! নাঃ, তুমি কোনও দিন আই. সি. এস হতে পারবে না। তেলেভাজার দোকান দিয়ে সংসার চালাতে হবে।'

'সে খুব ভাল। রোজ কেমন ফুলুরি আর বেগুনি খাব।'

চোখের সামনে দিয়ে মালগাড়ির ন্যাজ বেরিয়ে গেল। একজোড়া লাইন সামনে চকচক করছে। ওপর থেকে এক ঝলক আলো এসে পড়েছে। দাদু বললেন, 'আমরা কিছুই করতে পারলুম না। ছেলেটা চোখের সামনে দিয়ে এবার সত্যি নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। তুমি একটি অপদার্থ !'

'ওই যে দূরে গাড়িটা এঁকেবেঁকে চলে যাচ্ছে, ওর পেছনে ছুটব দাদু !'

'খুব হয়েছে, ওর পেছনে ছুটে তোমাকে আর দয়া করে নিরুদ্দেশ হতে হবে না। বোকা হলেও তুমি আমার আদরের নাতি। নেই মামার চেয়ে, কানা মামা ভাল। নাও চলো, আমি এখন থানায় যাব। মনে হচ্ছে, অনেক কিছু জেনে ফেলেছি। পুলিশ জানলে, তারা কিছু একটা করতে পারবে।'

যাবার আগে লাইনের ওপর টর্চের আলো ফেললেন। লম্বা মতো কী একটা পড়ে আছে খোয়ার ওপর।

'দ্যাখো তো ওটা কী ?'

'মনে হচ্ছে ডিনামাইট।'

'ডিনামাইট ? খেপেচ, ডিনামাইট আসবে কোথা থেকে ? তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। নাও, তোলো।'

ভয়ে ভয়ে জিনিসটা তুলে নিলুম, 'একটা পেনসিল দাদু।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও, ওটা একটা সাংঘাতিক ক্লু, ফিংগার প্রিন্ট নষ্ট করো না। রুমাল দিয়ে ধরি। এ সব শিখে রাখো। এই একটা পেনসিল দিয়ে পুলিশ এক ডজন অপরাধী ধরতে পারে।'

রুমাল জড়ানো পেনসিল কোটের পকেটে ফেলে দাদু যাবার জন্যে পা বাড়ালেন। আমি বললুম, 'টুসির কী হবে ?'

'টুসির ভাবনা টুসি ভাববে। আমাদের আর সময় নেই।'

দূরে সাতটা কুকুর তারস্বরে কেঁদে উঠল। ভীষণ কিছু একটা দেখে ফেলেছে বোধহয়।

pathagar.net

॥ দুই ॥

আমরা থানার সামনে এসে দাঁড়ালাম। কুয়াশায় চারপাশ ঝাপসা। অয়্যারলেসের টাওয়ার তিনকোনা হয়ে আকাশের টাগরায় গিয়ে ঠেকেছে। থানার সামনের মাঠে ধোঁয়া ঘোঁট পাকাচ্ছে। একপাশে একটা জিপগাড়ি। তার ভেতরেও কুয়াশা ঢুকে বসে আছে। অফিস ঘরে টিংটিং করে গোটাকতক আলো জ্বলছে। একজন পুলিশ অলেস্টার পরে বেঞ্চিতে বসে। হঠাৎ তাঁর হাত থেকে লাঠিটা শব্দ করে মেঝেতে পড়ে যেতেই চমকে উঠে বললেন, 'কে, কে ?'

ঘুমের ঘোরে মানুষের কত কী যে হয় !

দাদু বললেন, 'চোরের স্বপ্ন দেখছে।'

চোখ না খুলেই হাতটা মেঝের দিকে ঝুলিয়ে হাতড়ে হাতড়ে লাঠিটা তুলে, হাঁটুর ফাঁকে রেখে পুলিশ ঘুমোতে লাগলেন। এবার অল্প অল্প নাক ডাকছে। দাদু বড় বড় পা ফেলে অফিসঘরের দিকে এগিয়ে চললেন। অফিসে বিশেষ কেউ নেই। বিশাল চেহারার এক অফিসার আপন মনে টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে সিগারেট খাচ্ছেন। চোখ দুটো ঘুম-ঘুম।

দরজার কাছ থেকে দাদু বললেন, 'আসতে পারি !'

ভদ্রলোক না তাকিয়েই বললেন, 'আসুন'।

দাদু সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক ধড়মড় করে উঠে টেবিল থেকে পা নামিয়ে বললেন, 'আরেব্বাপ, মুকুজ্যেমশাই, কী সৌভাগ্য, কী সৌভাগ্য ! আবার ঘটি চুরি ?'

দাদু বসতে বসতে বললেন, 'না, এবার আর ঘটি চুরি নয়, অন্য ব্যাপার। আরও সিরিয়াস কেস।'

'কোথায় গিয়েছিলেন ? গঙ্গার চান হয়ে গেল !'

'অনীশ, তোমার সময়ের জ্ঞান খুব কমে গেছে। এখন মাঝরাত। মাঝরাতে কেউ চানে যায় ! যাক শোনো, জিনিসটা প্রায় সমাধান করেই এনেছি, একেই বলে ভাগ্য !'

ভদ্রলোক সামনে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'ধরে ফেলেছেন সেই ঘটিচোরকে ?'

'তোমার মাথায় কি ঘটি ছাড়া আর কিছুই নেই ? এ তোমার ছিঁচকে চোরের ব্যাপার নয়। বাঘা-বাঘা অপরাধীদের ব্যাপার। অভিনেতা নিরুদ্দেশ, ধনীর পুত্র অপহরণ। আজকের কাগজের বড় বড় দুটো খবর।'

'ও হ্যাঁ, ওই কেস দুটো ? বেশ জমাটি ব্যাপার। বিলিতি-বিলিতি গন্ধ আছে। অনেকদিন পরে গোয়েন্দারা একটু আনন্দ পাবেন।'

'আনন্দ পাওয়াচ্ছি !'

'আজ্ঞে' ?

pathagar.net

'আনন্দ পাওয়াচ্ছি। তিন ঘণ্টায় আমি দুটো কেসেরই ফয়সালা করে ফেলেছি। এখন কান টানলেই মাথা আসবে।'

'কী ভাবে ?'

'চেয়ারে বসে বসে, কীভাবে, কীভাবে, করলে কাজ হবে না। ওঠো, কোমরে বেল্ট চড়াও। ফোর্স বের করো। রাত ভোর হবার আগেই সব শেষ করে দিচ্ছি।'

'কী বলছেন মুকুজ্যেমশাই! আপনি কলকাতার একজন নামজাদা আইনজীবী, আপনি আবার কবে গোয়েন্দা হলেন ?'

'বেড়াল আমাকে গোয়েন্দা বানিয়েছে। আমি এখন ইঁদুরের গন্ধ পাচ্ছি।'

'ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন, তা না হলে আমরা হয়তো বোকা বনে যাব। আর তখন কী হবে জানেন ? কাগজে কাগজে লিখে আমাদের ভূত করে দেবে। আমি তো আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী নই, বন্ধু। আমাকে বলতে আপত্তি কী ?'

'তুমি তো আচ্ছা হে! এখন গুছিয়ে সব বলতে হলে অপরাধীরা ভাগবে।'

'ছোট করে বলুন। টেলিগ্রাফের ভাষায়।'

'শোনো তা হলে, খালধারে ভাঙা মটোরগাড়ি, তার ভেতর পরচুল, পায়ের কাছে শব্দ করা আলুর পুতুল, বন্ধ ডাক্তারখানায় তিনটে লোক, হার্টের গোলমালে একজন কাত, হা, হা, মা, মা, মালগাড়ির পেটে শিশুর ক্ষীণ কণ্ঠ, গাড়ি হাওয়া, লাইনে পেনসিল। এই নাও রুমালে জড়ানো পেনসিল। ফিংগারপ্রিন্ট, গন্ধ, কুকুরকে সাহায্য করতে পারে।'

পুলিশ অফিসার দাদুর টেলিগ্রাফের ভাষায় ঘটনার বিবরণ শুনে বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি ফোর্স বের করছি।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই জিপ তৈরি হয়ে গেল। পুলিশ অফিসার আমার দিকে তাকিয়ে দাদুকে বললেন, 'এই সব কাজে, ছোট নাতিটাকে নিয়ে যাবেন ? সেটা কি ভাল হবে ?'

'আরে ও-ই তো আমার অ্যাসিসটেন্ট। এতক্ষণ আমাকে সাহস দিয়ে দিয়ে চালিয়ে আনছে।'

'তা হলে চলুক।'

গাড়ি স্টার্ট নিল। অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রথমে আমরা কোথায় যাব ?'

'আমি গাইড করছি। ভয় নেই!'

দাদু ড্রাইভারের পাশে বসে, ডাইনে-বাঁয়ে করতে লাগলেন। গাড়ি চলল গড়গড়িয়ে। প্রথমেই সেই ডাক্তারখানা, যেখানে তিনজন লোক কিছু আগে গুলতানি করছিলেন। দরজার তলা দিয়ে কোনও আলোর রেখা বেরিয়ে আসছে

pathagar.net

না। চারপাশ নিঝুম অন্ধকার। গাড়ি থামল। অফিসার পুলিশি গলায় বললেন, 'এইখানে ?'

দাদু ধমকে উঠলেন, 'চুপ, আস্তে আস্তে। ষাঁড়ের মতো চেল্লাচ্ছ কেন অনীশ ?'

'অল রাইট, অল রাইট।'

বেশ মজা লাগছে। চোরেরা চোরের মতো হাঁটবে। পুলিশ চোরের মতো হাঁটলে হাসি পায়। আমার দাদুই যেন পুলিশ অফিসার। তিনিই হুকুম দিচ্ছেন ফিসফিসে গলায়, 'ডিসপেনসারিটা ঘিরে ফেলো, ঘিরে ফেলো।'

সঙ্গে সঙ্গে চারপাশে পুলিশ মোতায়েন হয়ে গেল। দাদু বন্ধ দরজায় কান রেখে শোনার চেষ্টা করছেন ভেতরে কেউ আছে কি না। দরজায় কিন্তু তালা ঝুলছে। পুলিশ অফিসার ফিসফিস করে সে কথা জানালেন। দাদু বললেন, 'এত দিন পুলিশে চাকরি করলে, ফলস কাকে বলে বোঝো না !'

'সবই বুঝি, শুধু একটা জিনিসই বুঝি না, এই ডিসপেনসারির ভেতর কে থাকতে পারে ?'

'এর ভেতরে সেই অভিনেতাটি আছে, যার নাম অসীমকুমার ! সঙ্গে আছে তার দুই চেলা।'

'তা, থাকে থাক না, মানুষকে তো রাতে কোথাও না কোথাও একটা থাকতেই হবে। শুধু শুধু খোঁচাখুঁচি করে তোলা কেন ?'

'বাঃ, বললে ভাল, সে নিরুদ্দেশ হয়ে বাড়ির লোককে কাঁদিয়ে এখানে থাকবে কেন ? নিশ্চয়ই সে এমন একটা কিছু করেছে, যার জন্যে লুকোতে চাইছে। কী করেছে জানো ? আমি নিজের কানে শুনেছি, রাস্তায় থেবড়ে বসে বুক চেপে ধরে বলছে, ছেলেটাকে আমি মালগাড়িতে রেখেছি। কার ছেলে ? সেই ধনকুবেরের ছেলে।'

'অসীমকুমার ধনকুবেরের ছেলেকে লুকিয়ে রাখবে কোন্ উদ্দেশ্যে। সব অপরাধেরই তো একটা কারণ থাকবে।'

'টাকা, টাকা। পৃথিবীর যত পাপ সব টাকার জন্যে। অভিনেতাদের টাকার প্রয়োজন হয়। তারা দু'হাতে টাকা ওড়ায়। বড়লোকের ছেলে নিরুদ্দেশ হলে পুরস্কার ঘোষণা করবেই। তখন নিয়ে গিয়ে সামনে ধরে দেবে, টাকাটি পকেটে পুরে ফিরে আসবে। আসলে সব ভেস্তে গেল হার্ট অ্যাটাক হয়ে।'

একজন পুলিশ শব্দ করে হাই তুললেন, দাদু বললেন, 'অ্যায় চুপ। এই যে অনীশ, দরজায় কান পাতো, ভেতরে কী হচ্ছে শুনতে পাবে।'

আমিও কান পাতলুম। সত্যিই একটা সন্দেহজনক শব্দ হচ্ছে। কেউ যেন কারুর গলা টিপে ধরেছে, কি গলাটা কেটেই দিয়েছে। কাটা গলায় নিশ্বাস নেবার ঘড় ঘড় শব্দ।

pathagar.net

অফিসার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'দারোয়াজা তোড়ো।'

তিন ধাক্কায় দরজা খুলে পড়ল। সবাই বীরদর্পে ঘরে ঢুকলেন। দাদু অনবরতই বলছেন, 'হ্যান্ডস আপ, হ্যান্ডস আপ।' টর্চ-এর আলো ঘরময় ঘুরছে। ভয়ে দম বন্ধ করে ছিলুম। আলো এখুনি হয়তো দপ করে এমন জায়গায় পড়বে, দৃশ্য দেখে অজ্ঞান হয়ে যাব। আর তখুনই অফিসার ব্যঙ্গ করে বলবেন, প্রথমেই বলেছিলুম ছোটকে সঙ্গে নেবেন না।

ঘরে কিন্তু কেউ নেই। গোটাকতক ইঁদুর আলো দেখে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। শব্দটা আসছে কলের মুখ থেকে। ভাল করে বন্ধ করা হয়নি। আলগা মুখ দিয়ে জল হাওয়ার চাপে শব্দ করে বিজগুড়ি কাটছে।

অফিসার বললেন, 'এই দেখুন, আপনার কথায় নেচে কী সর্বনাশ হল। এখন চুরির দায়ে ধরা না পড়ি। কাল সারা শহরে ঢিঢি পড়ে যাবে, পুলিশ দরজা ভেঙে ওষুধ চুরি করছিল। চলুন চলুন, বেরিয়ে চলুন। পা টিপে টিপে চলুন। দরজাটাকে ঠেকানোঠাকনা দিয়ে কোনও রকমে বন্ধ করে রেখে পালাই।'

আমরা এবার সত্যিই চোরের মতো, এদিকে-ওদিকে তাকাতে তাকাতে বাইরে এসে জিপে উঠে বসলুম। দাদু কিন্তু দমলেন না। তিনি বললেন, 'অনীশ, পাখি পালালেও ধরা ঠিক পড়বে। আমার ধারণা ভুল হতে পারে না। হ্যাঁ, ড্রাইভার, খালধারে চলো।'

খালের ধারে জিপ থামল। সেই ভাঙা মোটরগাড়ি। দাদু লাফাতে লাফাতে ঢালু বেয়ে নেমে খুঁজে খুঁজে জলের ধার থেকে পরচুলটা তুলে নিয়ে এলেন। একটু ভিজে গেছে, এই যা। চুলটাকে জিপের সিটে ছড়িয়ে দিয়ে ড্রাইভারকে বললেন, 'গোকুল মিত্তির লেনে চলা।'

ভোর হয়ে এসেছে। গোকুল মিত্তির লেনের চায়ের দোকান চালু হয়ে গেছে। থামঅলা হলদে রঙের একটা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াল বৈঠকখানায় আলো জ্বলছে। কথার আওয়াজ ভেসে আসছে। জানালায় উঁকি দিয়ে দেখা গেল যেন আসর বসেছে।

দাদু জানালার কাছ থেকে বললেন, 'ছেলের কোনও খবর পেলেন?'

ভীষণ রাগী চেহারার এক ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি কে?'

'আমরা পুলিশ।'

'আরে আসুন আসুন, অপদার্থ হলেও শীতের ভোরের এককাপ গরম চা খেয়ে যান। আপনারা কিস্যু পারবেন না জেনেই, রিওয়ার্ড ঘোষণা করেছিলুম। ফলও ফলেছে। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমার ছেলে আসছে। এক সহৃদয় ব্যক্তি নিয়ে আসছেন।'

দাদু বললেন, 'খুব ভাল কথা। আমরা আশেপাশেই আছি। সেই সহৃদয় ব্যক্তিটিকে দয়া করে আমাদের কথা বলবেন না।'

pathagar.net

আরে না মশাই। আপনারা কি ভগবান, যে জনে-জনে বলে বেড়াব, ভগবানের দর্শন পেয়েছি! নিশ্চিন্ত থাকুন।'

রক থেকে নেমে দাদু বললেন, 'অনীশ, তোমার হুইসলটা দাও। তোমরা ওই পাশের গলিতে অপেক্ষা করো। বাঁশি শুনলেই আসবে। শোনো, আমি যা করছি, সবই অনুমানের ওপর নির্ভর করে। না মিললে গালাগাল দেবে না।'

পুলিশের গাড়ি পাশের গলিতে চলে গেল। আমরা দু'জনে একটা বাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলুম গা-ঢাকা দিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা হলদে কালো ট্যাকসি এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াল। পেছনের আসনে—আরে এ-ই তো সেই টাকমাথা লোকটা। কাল রাতে দেখেছি। লোকটি জানালার কাচ নামিয়ে, বাড়িটা দেখতে দেখতে কর্কশ গলায় বলল, 'কী এই বাড়িটা?'

দাদুর চোখমুখ উত্তেজনায় চকচক করছে। গাড়ির শব্দ পেয়েই বাড়ির ভেতর থেকে পিল পিল করে ছেলে, মেয়ে, বুড়ো সব বেরিয়ে এলেন। মেয়েরা কাঁদছেন আর বলছেন, 'আহা বাবা এলি! বাবা এলি!'

লোকটির কী খাতির, 'আসুন আসুন, ভেতরে আসুন। আপনি আমাদের ভগবান। ভাগ্যিই দেখেছিলেন।'

অসীমকুমার মৃদু হাসতে হাসতে, আদর খেতে খেতে, নিভাঁজ ভালমানুষের মতো ঘরে গিয়ে বসলেন। আমি আর দাদু সব দেখতেও পাচ্ছি, শুনতেও পাচ্ছি।

দাদু বললেন, 'বাঁশি আর বাজাব না, তুমি ওদের গলি থেকে ডেকে আনো।'

অনীশবাবু আমার ডাক শুনে, দলবল নিয়ে চুপি চুপি চলে এলেন। গাড়িটা গলিতেই রয়ে গেল। দাদু ফিসফিস করে বললেন, 'আজ এক ঢিলে তিন পাখি মারব।'

দাদুই আগে ঘরে ঢুকলেন, 'কী খবর অসীমকুমার?'

'এই চলছে এক রকম। অ্যাঁ, আপনি আবার কে? হু আর ইউ?'

'আমি কেউ না বাবা, একজন বুড়ো। এঁরাই সব। এই যে আমার পেছনে।'

দাদুর পেছনে পুলিশবাহিনী। সেই দিকে তাকিয়ে টাকুবাবু বললেন, 'এ কী, এ আবার কী তামাশা!'

'তামাশা নয় বাবা। বাচ্চা ছেলেটাকে এই ভীষণ শীতে, সারা রাত মালগাড়িতে পুরে রেখে বড় কষ্ট দিয়েছ বাবা। সংসারে টাকার চেয়ে বড় কিছু নেই, তাই না বাবা অসীম! ছেলেটা সারা রাত জল জল করেছে। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা কিছু খেতে পায়নি।'

'কী যা-তা বলছেন? আমি সকালে দমদম ইয়ার্ডে একে কুড়িয়ে পেয়ে নামধাম জেনে এখানে নিয়ে এসেছি।'

pathagar.net

'রিওয়ার্ডের লোভে ? তা ধরো পুরস্কার ঘোষণা না করলে বাবাজি তোমার যে বড় পণ্ডশ্রম হয়ে যেত। টাকাটা যে এত সহজে আসত না।'

'কী আবোলতাবোল বকছেন ! ওকে আমি ধরতে যাব কেন ? এই জন্যে আজকাল আর কেউ পরোপকার করতে চায় না। থাকত পড়ে বেশ হত। খোকা, তোমাকে আমি ধরে মালগাড়িতে ভরে রেখেছিলুম ?'

ছেলেটি ফ্যালফ্যাল করে বললে, 'না, সে অন্য লোক !'

দাদু অনীশবাবুকে বললেন, 'ওহে অনীশ, একটু চেপে ধরো তো !'

ভদ্রলোককে খপ করে চেপে ধরতেই কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন। দাদু অমনি টাকের ওপর পরচুলটা পরিয়ে দিলেন। ছেলেটি বললে, 'তুমিই তো, তুমিই তো আমাকে ধরেছিলে। পুতুল দিয়েছিলে, চকোলেট দিয়েছিলে, মেরেছিলে, গলায় পেনসিল ঢুকিয়ে দিয়েছিলে।'

দাদু বললেন, 'অনীশ, এই তোমার এক নম্বর পাখি। মঞ্চ অভিনেতা, অসীমকুমার !'

মেয়েরা বললেন, 'কী সুন্দর, কী সুন্দর। পাশাপাশিতে কী দারুণ অভিনয় !'

দাদু চুলটা তুলে নিয়ে গোঁপ ধরে মারলেন এক টান। মুখটা একেবারে পালটে গেল।

'অনীশ, এই তোমার দ্বিতীয় পাখি, সেই নোটজালের অভিযুক্ত আসামী কালু সর্দার। যে পাঁচিল টপকে পালিয়েছিল। মুখটা মনে পড়ছে ?

দাদু এবার ডান গালের আঁচিলে মারলেন এক টান। নিজের চশমাটা চোখ থেকে খুলে বসিয়ে দিলেন চোখে। 'অনীশ, এই তোমার তৃতীয় পাখি, বম্বের ডিরেকটার টাবু, যে সারা কলকাতার শ-তিনেক লোককে গত বছর চিট করে হাওয়া হয়েছিল। তোমরা কাগজে ওর ছবি ছেপে লোককে সাধান করায়, বাবাজীবন ভোল পাল্টাতে বাধ্য হয়েছিল। নাও, এই মহাপুরুষ এখন তোমাদের সম্পত্তি।'

ঘর সুদ্ধ লোক হাঁ। আমরা হাঁ।

4 SEP 2005

সদলে থানায়। সেখানে সেকেন্ড অফিসার বললেন, 'স্যার, সাংঘাতিক কাণ্ড। কাল রাতে এগারোটার পর থেকে কলকাতার প্রখ্যাত আইনজীবী কিরণ মুখোপাধ্যায় আর তাঁর নাতি দু'জনেই মিসিং। কিরণবাবুর হাতে নাকি সাংঘাতিক একটা মার্ডার কেস রয়েছে।'

অনীশবাবু বললেন, 'এই নাও দুজনকেই, গাড়িতে ভরে বাড়ি দিয়ে এসো।

'তা হলে, ওঁরা যে ডায়েরি করিয়ে গেলেন—মিসিং, পাশে লিখে রাখি, ফাউন্ড।'

pathagar.net

'অবশ্যই, অবশ্যই।'

দাদু জিপে উঠতে উঠতে বললেন, 'পাখিটি ঘুঘু জাতীয়, ফাঁদটি ভাল করে পেতো। আর এই নাও, এই কাগজটা ডাক্তারখানায় ছিল। একটা চিঠির খসড়া। ছেলেটির বাবা পুরস্কার ঘোষণা না করলে, পঞ্চাশ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করে এটি ছাড়া হত। আর শোনো, দলে আরো জনাদুই আছে, তার মধ্যে সেই গুগলু মস্তানটাও আছে মনে হয়। দাওয়াই দিলেই সন্ধান মিলবে।'

চারপাশে ঝলমলে রোদ। সকালের কলকাতা। রাত পালিয়েছে। দাদুর সঙ্গে রাতে আর বেরোচ্ছি না কোনও দিন। আমরা বাড়ির দিকে এগোচ্ছি। বারান্দায় সার সার উদ্বিগ্ন মুখ। টুসিটা পাঁচিলে বসে আছে, ইয়া মোটা চামরের মতো এক ন্যাজ ঝুলিয়ে। কতই যেন লক্ষ্মী মেয়ে!

pathagar.net

রহস্য

'এটা তো জুতোর কালি। কালিতে আপনার এই ছড়ি পালিশ হবে কী করে?' 'যা বলেছি তাই করো। বড়দের কথা অবিশ্বাস করবে না। অবিশ্বাসী ছেলেকে বলে ডেঁপো ছেলে।'

দাদুর পাঞ্জাবি পরা হয়ে গেছে। চোখে সোনার ফ্রেমের সেই নতুন চশমাটা উঠেছে। পাঞ্জাবির হাতায় মিহি গিলে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পাকা চুলে বুরুশ চালাচ্ছেন। আয়নায় আমাকে দেখছেন আর কথা বলছেন।

'তাড়াতাড়ি হাত চালাও। রোদ উঠে গেলে সে বেড়ানোকে আর মর্নিং-ওয়াক বলা চলে না।'

'ছড়িটা অনেকদিন পড়ে থেকে ময়লা ধরে গেছে। আজ ছড়ি না-ই বা নিলেন। দুপুরে পরিষ্কার করে রাখব, কাল থেকে নিয়ে বেরোবেন।'

বুরুশ রেখে দাদু ঘুরে দাঁড়ালেন। 'কাজকে অত ভয় পাও কেন? হাতে ছড়ি থাকলে ইজ্জত বাড়ে, জানো কি তা? ওই আগরওয়ালের পাশে খালি হাতে ঘুরলে নিজেকে বড় ছোট মনে হয়। তোমার দাদুরও একটা প্রেসটিজ আছে।'

নেপাল এয়ারলাইন্সের কী একটা মামলা জিতিয়ে দিয়ে দাদুর খুব নামডাক হয়েছে। পুরনো গাড়ি বিদায় করে চাঁপাফুল রঙের নতুন একটা গাড়ি কিনেছেন। মাঝে মাঝে কোঁচার খুঁট কি রুমাল দিয়ে দরজার হাতল পালিশ করেন। বনেট চকচকে করে মুখটা চট করে একবার দেখে নেন।

প্রসাদদা স্টিয়ারিংয়ে মাথা রেখে মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ভোরের ঘুম এখনও চোখে লেগে আছে। আমারও মাঝে মাঝে হাই উঠছে। ভোরের এই ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুমটা যা জমত না! দাদুর এই বেড়ানো যে আর ক'দিন চলবে! পারা যায় না।

ছড়ির ডগা দিয়ে দাদু প্রসাদদার মাথার পিছনে টুক করে মারলেন। 'চলো হে প্রসাদচন্দ্র। পুব আকাশে লাল রঙ ধরেছে। আজ এই ব্যাটার জন্যে পুরোনো মিনিট লেট হয়ে গেল। গোয়েঙ্কার এতক্ষণে একশো পাক মারা হয়ে গেল!'

'গোয়েঙ্কা নয় দাদু, আগরওয়াল।'

'তুমি আমার চেয়ে বেশি জানো?'

'একটু আগে আপনিই বললেন আগরওয়াল।'

pathagar.net

'আরে, নামে কী এসে যায় ! আসল হল মানুষ। তোমাকে হুলো বললেও যা, গবা বললেও তাই। সেই এক দুর্দান্ত, অশান্ত, ছটফটে ছেলে। প্রসাদ, গাড়ি আজ এত আস্তে চলছে কেন ?'

'আজ্ঞে, ভোরবেলা তো, তাই একটু ঝিম মেরে গেছে। এখনও ভাল করে ঘুম ছাড়েনি।'

'চা খেয়েছ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি খেয়েছি।'

'তার মানেই, গাড়ি খেয়েছে। এইবার একটু ফুর্তিসে চালাও।'

ইডেনের পাশ দিয়ে গাড়ি গঙ্গার ধারে একেবারে ফোর্টের কাছে চলে এল। ভিজে-ভিজে ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি বেশ মোটা মতো একজন ভদ্রলোক ঢালু সবুজ মাঠের ওপর তালে তালে ছুটছেন। ভুঁড়ি নাচছে। গালের থলথলে মাংস নাচছে। এখানে মোটারা রোগা হতে আসেন। যাঁদের বাত আছে তাঁরা বাত সারাতে আসেন।

গাছতলায় গাড়ি দাঁড়াতেই দাদু নেমে পড়লেন। বেড়াবার জন্যে প্রাণ যেন ছটফট করছে। আমার দাদুর আজকাল খুব সুখ হয়েছে। যত দুঃখ আমার। বছরে চার-পাঁচবার পরীক্ষা দিতে হলে কার আর সুখ থাকে।

ছড়িটাকে বারকয়েক বাতাসে গোল করে ঘুরিয়ে হাওয়া খাইয়ে নিলেন। আন্দামান থেকে ছড়িটা দাদুর এক বন্ধু এনে দিয়েছিলেন। প্যাডক কাঠের তৈরি। প্যাডক আবার কী কাঠ, কে জানে বাবা ! দাদু চারপাশে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'কই, আমার ফ্রেন্ড ঝুনঝুনওয়ালাকে তো দেখছি না আজ ?'

'ঝুনঝুনওয়ালা নয়, দাদু, আগরওয়াল !'

'ওই হল রে বাবা !'

লম্বা-লম্বা পা ফেলে দাদু হাঁটা শুরু করলেন। এত জোরে হাঁটছেন যে আমাকে ছুটতে হচ্ছে। ইস্টবেঙ্গল টেন্টের দিকে ধাওয়া করেছেন। আরও অনেকে এসেছেন। সকলেরই কাজ জোরে জোরে হাঁটা। চেনা কেউ উল্টো দিক থেকে পাক মেরে ফেরার সময় মুখোমুখি হলে শুধু একটু মুচকি হাসা। কথা বলারও সময় নেই। মনে মনে গুনতে হবে পাকের সংখ্যা' এক পাক, দু পাক....।

প্রথম পাক মেরে ফেরার সময় রোজের অভ্যাসের মতোই দাদু বাঁ দিক ঘেঁষে আসছিলেন। কাঁটাতারের বেড়া, ঝোপঝাড়। শুরু হয়েছে ফোর্টের নিজস্ব এলাকা। পরিখা রয়েছে, জল নেই। জায়গাটা দেখলেই দিনের বেলাতেও গা ছম ছম করে। কেবল গাছ আর গাছ।

মাটির দিকে মুখ নিচু করে দাদু হঠাৎ থমকে পড়লেন, 'এ কী ?'

মাটিতে, ঝোপের ধার ঘেঁষে একটা চশমা পড়ে আছে। নতুন চশমা।

pathagar.net

আমাকে বললেন, 'তোলো।' নিচু হয়ে চশমাটা তুলতে গিয়ে দেখি, ঝোপের মধ্যে সোনালি আর একটা কী চকচক করছে। ছড়ি দিয়ে টেনে জিনিসটাকে বের করে আনলেন দাদু। ছোট্ট একটা ডায়েরি। চারটে কোণ পেতল দিয়ে মোড়া।

'নাও তোলো।'

নোটবুকটা দাদুর হাতে দিলুম। হাতে নিয়েই বললেন, 'ভিজে ভিজে ঠেকছে। সারা রাত এই ঝোপে পড়েছিল। শিশির লেগে গেছে।'

'গরমকালে শিশির পড়ে দাদু?'

'তক্ক করো না। সব কালেই একটু না একটু শিশির পড়ে। রাতের খবর তুমি কতটুকু রাখো হে খোকা! দশটা বাজতেই ভোঁস-ভোঁস ঘুম।'

'আপনি আজকাল ভীষণ ঝগড়া করেন।'

'ঝগড়া! তোমার সঙ্গে ঝগড়া! একে ঝগড়া বলে? ঝগড়া কাকে বলে তাই জানিস না। তুই দেখছি গোরুর চেয়ে গাধা।'

বাবা! সে আবার কী জিনিস! গোরুর চেয়ে গাধা? গোরু আবার কবে গাধা হল? না বাবা, তক্ক করব না। আবার গালাগাল খেতে হবে।

দাদু বললেন, 'ব্যাপারটা খুব ফিশি মনে হচ্ছে। আয় নির্জনে কোথাও একটু বসি।'

'ফিশি মানে কী দাদু? আঁশটে?'

'তোমাকে এখন ইংরিজি শেখাবার সময় আমার নেই। ফিশ থেকে বিশেষণ করে ফিশি, মাঝে মাঝে ডিকশনারিটা তো ওলটাতে পারো। বাড়িতে তো বইয়ের অভাব নেই।'

দূরে একটা গাছতলায় আমরা দু'জনে পাশাপাশি বসলুম। রোদ ফুটছে ধীরে ধীরে। কী সুন্দর দিন। সামনে ফোর্ট, পরিখা, লম্বা-লম্বা ছায়া। অনেক দূরে খাঁকি রঙের একটা মিলিটারি ভ্যান চলে যাচ্ছে। ঘোড়ায় চেপে একজন পুলিশ চলেছে। সাদা প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে তিনজন খেলোয়াড় সমান তালে ছুটছেন।

দাদু নোটবুকটা খুললেন। প্রথম পাতাতেই নাম আর ঠিকানা বিপুলকিরণ চৌধুরী। আলিপুর রোড। ফোন নম্বর। আরো সব নানা রকম নম্বর লেখা। গাড়ির লাইসেন্স নম্বর। ইনসিওরেন্সের পলিসি নম্বর। পরের কয়েকটা পাতা সাদা। তারপরে একটা পাতায় লেখা। 'সত্য আর কতদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকবে?' আবার সাদা পাতা। তারপর হঠাৎ লেখা, 'ধরি ধরি করি ধরতে না পারি।' শেষ লেখা, 'আজ মাঝরাতে যা থাকে বরাতে।'

দাদু আমার মুখের দিকে তাকালেন, 'কী বুঝলে?'

'ফিশি।'

pathagar.net

'অ্যা, ঠিক বলেছ।'

'ওই মাঝরাতেই মরেছেন। ডেডবডিটা মনে হয় কাছাকাছি কোথাও আছে। হয়তো ওই পরিখার ভেতরে।'

'গবেট, কেসটা তোমার মাথায় ঢোকেনি। বিপুলবরণ....'

'বিপুলকিরণ দাদু।'

'ওই হল রে বাবা। বিপুলবাবু একজন ধনী মানুষ। তিনি সত্যসাধনকে টাকা ধার দিয়েছিলেন। সেই সত্য ব্যাটা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তাকে হঠাৎ এখানে দেখতে পেয়ে বিপুলবাবু ধরতে ছুটেছিলেন। ধরি ধরি করি ধরিতে না পারি। দুম করে পড়ে গেলেন। চশমা চোখ থেকে ছিটকে চলে গেল। নোটবুক বুকপকেট থেকে পড়ে গেল। সবাই ধরাধরি করে হসপিটালে নিয়ে গেল। এই দুটি জিনিস কারুর চোখে পড়ল না। বুঝলে কিছু?'

'আজ্ঞে না। এই লেখাগুলো কি তাহলে ঘটনা ঘটে যাবার পর? আবার লেখা রয়েছে মাঝরাত। আপনি দাদু একদম ধরতে পারেননি।'

'ইয়েস, ঠিক বলেছ। আমিই একটি গবেট। তোমার তাহলে কী মনে হয়?'

'এটা মার্ডার কেস। যে কোনও কারণেই হোক ভদ্রলোক মাঝরাতে এখানে এসেছিলেন, সেই সময় চ্যাক।'

'চ্যাক, সে আবার কী?'

'চ্যাক করে ছুরি। ঠিকানা যখন রয়েছে তখন চলুন না ভদ্রলোকের বাড়িতে একবার যাই। জিনিসদুটো ফেরত দেওয়া যাবে। কিছু ঘটে থাকলে জানাও যাবে।'

'অল রাইট। চলো তা হলে।'

॥ দুই ॥

বিশাল বাড়ি। কিন্তু কেমন যেন ভুতুড়ে মার্কা। বড় গাছ, ছোট গাছ, সব একসঙ্গে জড়ামড়ি। বাইরে থেকে বাড়িটার কিছু-কিছু অংশ চোখে পড়ে। গাড়িবারান্দা, তার ওপর লাল টালি-ছাওয়া একটা ছাদ। দোতলার একটি অংশ চোখে পড়ার মতো, যেন হাওয়া-মহল, বাতাসে ঝুলছে। বাড়ির বিশাল গেটটি কিন্তু বন্ধ। বোম্বাই চেহারার তালা ঝুলছে।

দাদু আমার দিকে অদ্ভুত মুখে তাকালেন। জানি, বেশ কড়া কিছু বলবেন। ঠিক তাই। ছড়িটা তালার গায়ে ঠেকিয়ে, শব্দ করে বারকয়েক দুলিয়ে বললেন, 'তোমার কথা শুনে কিছু করলেই বড় ভুগতে হয়। সকালের বেড়ানোটা গেল। কমলালেবুর রস খাওয়ার সময় চলে গেল।'

'কমলালেবুর রস? এখন কমলালেবু পাবেন কোথায়?'

pathagar.net

'সেটা আমার ভাবনা নয়। আমেরিকায় বড় বড় লোকেরা সকালে কমলালেবুর রস খায়। আমিও খাব আজ থেকে। হরিদাসকে আমি বলে এসেছি। মাথাব্যথা তার।'

'এখন তাহলে আমাদের কী করা উচিত দাদু ?'

'বলো, তোমার হুকুমেই তো চলছি। আচ্ছা, আশেপাশে একটু খোঁজখবর করলে হয় না ? কাঠের নেমপ্লেটের নামটা তো ঝাপসা অস্পষ্ট হয়ে গেছে ; কিছুই তো পড়া যাচ্ছে না।'

বাড়িটার পাশে, পাঁচিলের শেষ মাথায় ছোট্ট একটা ঘর। কোনও কালে এই বাড়িরই আউট-হাউস ছিল। সামনের দিকে দরজা ফুটিয়ে এক ধোবিকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। তোলা উনুন গনগন করছে। দুটো ইস্ত্রি চাপানো রয়েছে। দড়িতে সার সার ভিজে ভিজে শাড়ি ঝুলছে। গাঁট্টাগোট্টা একটি লোক মল্লবীরের মতো ইস্ত্রি করে চলেছে। ভিজে জামা থেকে ইস্ত্রির উত্তাপে বাষ্প উঠছে। হাসা উচিত নয়, তবু হাসি পেয়ে যাচ্ছে, লোকটির মাথায় ইয়া মোটা একটা টিকি, কাজের তালে তালে ডাইনে বাঁয়ে দুলছে। ডগায় আবার কায়দা করে একটা কলকেফুল বাঁধা হয়েছে।

দাদু আমার সামনে দুটো আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'যে কোনও একটা ধরো।'

খপ করে মাঝের আঙুলটা চেপে ধরলুম।

দাদু বললেন, 'বাংলা।'

'তার মানে ?'

'বাংলায় প্রশ্ন করব, না হিন্দিতে, ঠিক ধরতে পারছিলুম না। তাই লটারি করলুম।'

লোকটিকে অনেক প্রশ্ন-টশ্ন করে যা জানা গেল, তা অনেকটা গল্পের মতো। বাড়িতে একজন মাত্র মানুষ থাকেন, তাঁর নাম বিপলবাবু। দাদু বললেন, 'ঠিক আছে, পু আমরাই করে নিচ্ছি উ লাগিয়ে।'

তা সেই বিপলবাবু বড় মজার মানুষ। বড় বড় চুল, দাড়ি, গোঁফ, যেন তুলসীদাসজি। কখনও প্যান্ট-কোট পরেন, কখনও শেরোয়ানি, কখনও আলখাল্লা। লোকজন বাড়িতে খুব কমই আসে। মাঝে মাঝে খুব লম্বামতো বুড়ো এক সায়েব আসে। খাস-বিলিতি সায়েব। খুব পুরনো আমলের একটা মোটর গাড়ি আছে। সে রকম গাড়ি এখানকার কালের রাস্তার চলে না। দুপাশে পাদানি, টেপা হর্ন, ইয়া তার চোঙা। শব্দ হয় ভ্যাঁক, ভ্যাঁক। কোনও কোনও দিন অনেক রাতে গাড়িটা গেট খুলে রাস্তায় নেমে আসে পাগলের মতো। পেছনের লাল আলোটা এত জোরে জ্বলে, যেন আগুন পড়ছে গলে গলে, টিকিদার তাই মনে হয়।

pathagar.net

আমার দাদু, আইনের মানুষ বাবা! তাঁর অন্য কথা মনে হবে আমি জানতুম। দূরে পার্ক করে রাখা গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে বললেন, 'মানুষ কেন যে আজকাল এত নেশা করে? সব সময় নেশায় টং হয়ে আছে। গাঁজার ধোঁয়ায় সব লাল দেখছে। গাড়ি লাল, আলো লাল, পৃথিবীটাই লাল।'

গাড়ি চলতে শুরু করল। প্রসাদদা দুটো জিনিস মনে হয় ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও পারে, গাড়িতে স্টার্ট দেওয়া, আর স্টার্ট বন্ধ করা।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'জিনিসদুটো তাহলে কোথায় জমা দেবেন? থানায়?'

'না, আমার কাছেই থাকবে। সশরীরে যোগাযোগ সম্ভব না হলেও, বিজ্ঞানের যুগে কণ্ঠস্বরে যোগাযোগ তো হতে পারে। সারাদিন টেলিফোনে সেই চেষ্টাই চলবে।'

কাপড়-জামা না পালটে দাদু প্রথমেই বসার ঘরে টেলিফোন-ডাইরেকটরি নিয়ে পড়লেন। বইটা খুললেই মেজাজ সপ্তমে চড়ে যায়। খুদে খুদে অক্ষর, লাখ-লাখ নাম। পাতা ওলটাচ্ছেন আর বলছে, 'যেমন দেশ, তার তেমন ব্যবস্থা।'

হরিদাসদা এক গেলাস লেবুর জল আর ছোট্ট একটা রেকাবিতে বড় এক কোয়া রসুন এনে পাশে রাখলেন। এ আবার কী ধরনের খাওয়া? আমেরিকান? 'মানুষ বড়লোক না হইলে পাগল হয় না।' কার উক্তি? আমার। 'মানুষ বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না'-র নকলে এই মাত্র তৈরি করে ফেললুম।...আমার কী প্রতিভা! জুভিনাইল ট্যালেন্ট। আমাদের পাড়ায় সাত বছরের একটি ছেলে সাংঘাতিক তবলা বাজায়। দাদু যখনই তার প্রশংসা করেন, তখনই বলেন ওই ইংরিজিটা।

'জয় বাবা ধন্বন্তরি'— লেবুর জল দিয়ে রসুনের কোয়াটা কোঁত করে গিলে ফেললেন। দম নিয়ে বললেন, 'জয় বাবা বাত-হরা, হৃদয়-হরণ রসুনায় নমঃ।'

রসুন আর পাতিলেবু একসঙ্গে শরীরের শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছে। ডাইরেকটরিটাকে রাগের চোটে তছনছ করে, আমার দিকে ছুড়ে দিলেন। দুম করে সোফায় এসে পড়ল ডানা-ছ্যাতরানো জটায়ুর মতো।

'তুমি একবার চেষ্টা করে দ্যাখো। নবজাতকের দৃষ্টি চাই ওই জরদগব থেকে কিছু পেতে হলে!'

সময়টা আমার খুব ভালই যাচ্ছে বলতে হবে। এক চান্সেই নম্বরটা পেয়ে গেলুম! নাম, ঠিকানা সব মিলে গেছে। দাদু বললেন, 'নম্বরটা লিখে রাখো। ঘণ্টাখানেক পরেই ফোন করা যাবে। তবে ফোন করে লাভটা কী হবে? চশমা আর নোটবুকের মালিককে কি পাওয়া যাবে? তিনি কি আর এ-জগতে আছেন?'

দাদু লাইব্রেরি ঘরের দিকে চলে গেলেন। এইবার সব বড়-বড় মক্কেলদের

pathagar.net

আগমন হবে। দাদু চলে যেতেই আমি টেলিফোনটা ভয়ে ভয়ে তুলে নিলুম। নম্বরটা ডায়াল করতেই বাজতে শুরু করল। কেমন যেন গা ছমছম করছে। অজানা জগতে শব্দ ধাক্কা মেরে মেরে কাউকে জাগাতে চাইছে। বলা যায় না তিনি হয়তো মৃত। পুরনো আমলের বড়-বড় বাড়িতে, অদ্ভুত-অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে।

রিসিভার তুলে নিলে যেরকম শব্দ হয়, সেই রকম একটা শব্দ হল। বাজনা থেমে গেল। উত্তেজনায় আমার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। কাঁপা কাঁপা গলায় বললুম, 'হ্যালো, হ্যালো।'

সাড়াশব্দ নেই, তবে রিসিভার যে তোলা হয়েছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কাকের ডাক, ম্যাকাও পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছি। অদ্ভুত আর একটা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, যেন ঝোড়ো বাতাস বইছে সাঁ-সাঁ করে। আর একবার হ্যালো বললুম। এবার আমার ভীষণ ভয় করছে। কিসের ভয় তা বলতে পারব না। বহুদূরে নির্জন কোনও বাড়িতে ফোন বাজছে, আমার মনে হচ্ছে একা একা আমি সেই ষড়যন্ত্রের জগতে ঢুকে পড়ে আর বেরোতে পারছি না।

চিৎকার করে ডাকলুম, 'দাদু।'

ছুটে এলেন, রিসিভারটা দিয়ে বললুম, 'ওই বাড়ি, বেশ রিং করছিল! রিসিভার কেউ তুলেছেন, কিন্তু সাড়া দিচ্ছেন না। শুনুন।'

কানে রিসিভার লাগিয়ে দাদু অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। বেশ জোরে জোরে বললেন, 'হ্যালো, হ্যালো।' তারপর বিরক্ত হয়ে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন ঝড়াং করে।

'তোমার যেমন কাণ্ড, কী ডায়াল করতে কী ডায়াল করেছ। ক্রস কানেকশান হয়ে বসে আছে।'

রিসিভারটা তুলে নিলেন। খুব রেগে রেগে ট্যাপ করতে লাগলেন। বারবার নামালেন, ওঠালেন, জিরো ডায়াল করলেন, নাইন নাইন ঘোরালেন। শেষে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ফোনটাকে কী করে দিলে তুমি? কার মধ্যে দিয়ে কী ঘুরিয়ে দিলে'!

'যেমন ঘোরায় সেই ভাবেই ঘুরিয়েছি দাদু। অন্য কোনও ভাবে ঘোরাইনি। একটাই তো চাকা, চাকার মধ্যে তো আর চাকা নেই!'

'দ্যাখো চেষ্টা করে যদি জট ছাড়াতে পারো। একই সঙ্গে পাখি ডাকছে, তার মানে লাইনের একটা মাথা গিয়ে ঢুকেছে চিড়িয়াখানায়, আর একটা মাথা মনে হয় কারুর ফুসফুসে ঢুকেছে, যে রকম সাঁই-সাঁই শব্দ হচ্ছে।'

দাদু নিজের কাজে চলে গেলেন। আমারও পড়া আছে। চশমা আর একটা নোটবুক নিয়ে মাথা খারাপ করলে পরীক্ষার ফলও খারাপ রবে। চশমা আর নোটবুক টেবিলের ওপর পড়ে রইল।

মাঝে-মাঝে টেলিফোন তুলে দেখা হতে লাগল, যদি ঠিক হয়ে গিয়ে

pathagar.net

থাকে। কোথায় কী, সেই এক পাখির ডাক, আর সাঁ-সাঁ বাতাসের শব্দ। সারা দিনে টেলিফোন আর ঠিক হল না। বিকেলের দিকে দাদু বললেন, 'আমার কর্তব্যজ্ঞান কী বলছে জানো, জিনিসদুটো নিয়ে অবিলম্বে আলিপুর থানায় গিয়ে অভয়চরণকে সব বলা। ব্যাপারটা খুব...'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ফিশি মনে হচ্ছে।'

'ভেরি গুড। মনে রেখেছ তাহলে। গেট রেডি। চলো তাহলে বেরিয়ে পড়া যাক।'

প্রসাদদার এখন দুটো কাজ, হয় গাড়ি মোছা, আর না হয় গাড়ি চালানো। কথায়-কথায় আফসোস করেন, 'ব্যাক গিয়ারটা এখনও তেমন সড়গড় হল না।'

থানার সামনে বিশাল ভিড়। দাদু প্রসাদদাকে বললেন, 'গাড়িটা একটু দূরে দাঁড় করাও। গণবিক্ষোভ চলেছে। কোথাকার জল কোথায় গড়াবে কে জানে!'

দাদুর বন্ধু অফিসার-ইনি-চার্জ অভয়চরণবাবুকে একদল ঘিরে ফেলেছেন। জনতা চেল্লাচ্ছে, তিনিও চেল্লাচ্ছেন, তারস্বরে বলছেন, 'আচ্ছা মুশকিল, এর আমি কী করতে পারি?'

জনতা বলছে, 'নিশ্চয় পারেন, আলবত পারেন, আপনার হাতে আইন আছে।'

দাদু দু'বার কাসলেন। সেই বিখ্যাত কাসি, যা শুনে এজলাসে জজসাহেবও তটস্থ হন। এ কাসি, কাসির কাসি নয়, দৃষ্টি আকর্ষণের শব্দ। জনতা চুপ হয়ে গেল।

দাদু বললেন, 'অভয়চরণ, ব্যাপারটা কী' একেবারে মেছোহাটা বসিয়ে ফেলেছ!'

'এই যে স্যার আপনি এসে গেছেন? নমস্কার, নমস্কার।' অভয়বাবু দাদুকে নমস্কার করতেই, জনতাও নমস্কার ঠুকে দিল।

দাদু এবার জনতার উদ্দেশে বললেন, 'কী হয়েছে? সমস্যাটা কী?'

জনতা কিছু বলতে যাচ্ছিল, সকলে একসঙ্গে, অভয়বাবু হাতের ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'সে এক পিক্যুলিয়ার কেস। মানুষের মাথা বটে। এক বাড়িওলা ভাড়াটে উচ্ছেদের জন্য করেছে কি, বিশ-বাইশটা লেড়ি কুকুর এনে পাশের ঘরে পুরে দরজায় তালা মেরে দিয়ে সরে পড়েছে। এইবার সেই বিশটা কুকুর বিশরকম সুরে অষ্টপ্রহর ডেকে চলেছে। এঁরা বলছেন, ভাড়াটে বেচারা তো পাগল হয়েইছে, সেই সঙ্গে সারা পাড়া পাগল হতে চলেছে। এ সমস্যার আমি কী করতে পারি! ভদ্রলোক বে-আইনি তো কিছু করেননি। কুকুর পোষার কনস্টিটিউশানাল রাইট সকলেরই আছে।'

'শোনো শোনো অভয়চরণ, সংবিধান অধিকার যেমন দিয়েছেন, তেমনি

pathagar.net

অধিকারের অপব্যবহার সম্বন্ধেও সাজার ব্যবস্থা রেখেছেন। ভদ্রলোকের উদ্দেশ্য কুকুর পোষা নয়, মানুষকে উত্ত্যক্ত করা। তুমি পাঁচ-আইনে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে এসো। তারপর আমি ঘানি ঘুরিয়ে ছেড়ে দোব।'

জনতা চিৎকার করে উঠল, 'যুগ যুগ জিও।'

এক কথায় থানা সাফ। অভয়বাবু সেকেন্ড অফিসারকে বললেন, 'একটা হুলিয়া বের করে লোকটাকে পাকড়াও করে আনো, আর তালা ভেঙে...।'

দাদু বললেন, 'না, না তালা ভেঙো না, ওইটাই তো প্রমাণ।'

ঝামেলা মিটে গেল। দাদু এবার নিজের কেস পাড়লেন, 'অভয়চরণ, ব্যাপারটা বড় মিস্টিরিয়াস। এই চশমা আর নোটবুকের ঠিকানা দেখে সকালে আমরা দুজনে আলিপুর রোডে গিয়েছিলুম, বুঝলে। বিশাল বাড়ি। ফটকে তালা ঝুলছে। পাশেই এক ধোবির ডেরা। সে আমাকে গল্প শোনাল, তাতে মনে হচ্ছে বাড়িটাও খুব মিস্টিরিয়াস। ইতিমধ্যে আমরা ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করি। সেও এক রহস্যময় ব্যাপার। ফোন বাজল। কেউ একজন রিসিভারও তুলল, ব্যস, সব খতম। সেই থেকে আমাদের ফোনে কেবল পাখির ডাক আর সাঁই-সাঁই শব্দ শোনা যাচ্ছে। তুমি একবার চলো অভয়চরণ।'

'আপনি মুকুজ্যেমশাই একটা না একটা ব্যাপারে বেশ জড়িয়ে পড়েন। তারপর কেঁচো খুড়তে সাপ বেরোয়।'

'আহা আমার কী অপরাধ বলো! সকালে ফোর্টের ধারে বেড়াতে গিয়ে যদি পেয়ে যাই, কী করে চোখ বুজিয়ে চলে আসি!'

'দাঁড়ান, এখুনি যাব। টক করে এক চুমুক চা মেরে নি।'

বেশ বড়-সড় কাপে তিন কাপ চা, অল্প গরম গরম সিঙাড়া এল। বেশ ভালই জমল। বাড়িতে আমি চা খাই না। এখন আমি দাদুর অ্যাসিস্টেন্ট মানে সমানে সমান। কিছুক্ষণের মধ্যেই দলবল তৈরি হয়ে গেল। অভয়বাবু আমাদের গাড়িতেই উঠলেন। আগে চলেছে জিপ, পেছনে আমাদের গাড়ি।

বাড়ির সামনে এসে আমরা নেমে পড়লুম। সেই একই তালা ঝুলছে। ধোবি বললে, সে কাউকে ঢুকতেও দেখেনি, বেরোতেও দেখেনি।

অভয়বাবু বললেন, 'আপনি বলছেন ফোন রিং করেছিল, রিসিভার কেউ তুলেছিল, কিন্তু সাড়া দেয়নি। তারপর রিসিভারটাও আর ঠিকভাবে নামিয়ে রাখেনি,যার ফলে আপনার ফোনে পাখি ডাকছে। তার মানে ব্যাপারটা খুব...।'

আমি বললুম, 'ফিশি।'

'ঠিক বলেছ, ভীষণ ফিশি। তাহলে তালা ভেঙে ঢুকতে হয়।'

দাদু বললেন, 'অবশ্য। রহস্যপুরীর ভেতরে কী হচ্ছে, আমাদের দেখতে হবে। দিনকাল আর আগের মতো নেই।'

পুলিশের হাতে তালা। এক চাড়ে খোল-নলচে সমেত ঠিকরে বেরিয়ে

pathagar.net

এল। চাকা লাগানো বিশাল গেট ঠেলতেই হাট হয়ে খুলে গেল। সামনেই একটা মার্বেল পাথরের স্ট্যাচু। একজন মহিলা ডিসকাস ছোড়ার জন্য চিরপ্রস্তুত। বিশাল-বিশাল গাছ কলকাতার অপরাহ্ণের আকাশ মাথায় করে রেখেছে। অজস্র পাখি ডাকছে, আর ডাকছে সেই ম্যাকাও।

অভয়বাবু বললেন, 'ব্যাপারটা কী!'

'ভৌতিক, স্রেফ ভুতুড়ে ব্যাপার। বাড়ি আছে, জনপ্রাণী নেই।' দাদু উত্তর দিলেন।

অভয়বাবু বললেন, 'নিজেকে ঠিক চোরের মতো মনে হচ্ছে। এখুনি দুম করে পেছন থেকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে কে? কাকে চাই? হাত ফসকে পুলিশের এই ব্যাটনটা পড়ে যাবে।'

দাদু বললেন, 'ঠিক বলেছ, আমরা কী রকম চোরের মতো পা টিপে টিপে হাঁটছি দেখেছ!'

নীচের তলা, ভোঁ-ভোঁ। আর একটি মাত্র ঘর দেখতে বাকি। নীচের সব ঘরই বেশ সাজানো-গোছানো, বড়-সড়। এই ঘরটি সবচেয়ে বড়। আর একমাত্র এই ঘরেরই দরজায় একটা পর্দা ঝুলছে। অভয়বাবু পর্দা সরাতেই আমরা চমকে উঠলুম। দরজার দিকে পেছন করে আরাম-কেদারায় বসে আছেন বিশাল এক পুরুষ। এক মাথা ধবধবে সাদা চুল।

অভয়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আসতে পারি?'

কোনও উত্তর নেই। এমনকি মাথা ঘুরিয়ে তাকলেন না পর্যন্ত। অভয়বাবু তখন ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'মে আই কাম ইন স্যার?'

উত্তর নেই। দাদু বললেন, 'হি ইজ ডেড। মার্ডার। আর হবে না, এত বড় বাড়িতে কোনও মানুষ বেশিক্ষণ থাকতে পারে? ভয়েই মারা যাবে।'

আমরা চুপি চুপি ঘরে ঢুকলুম। অভয়বাবু বললেন, 'ঘুমিয়ে পড়তেও পারেন।'

সামনে গিয়ে আমরা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলুম। মানুষ নয়, মানুষের মূর্তি। অভয়বাবু বললেন, 'অসাধারণ, কে এমন নিখুঁতভাবে তৈরি করেছেন বলুন তো! একেবারে ভড়কে দিয়েছে।'

'নিশ্চয়ই কোনও ইতালীয় শিল্পী।'

'আঃ, একটা হাতের কাজ বটে।' অভয়বাবু মূর্তিটার মাথায় একবার হাত বোলালেন।

দাদু বললেন, 'টেলিফোনটা তাহলে কোথায়, কোন ঘরে আছে?'

'দোতলায় থাকতে পারে।'

'এত বড় একটা বাড়ি, একটাও লোক নেই কেন আমার মাথায় আসছে না।'

pathagar.net

'আমরাও খুব ফিশি মনে হচ্ছে।'

দোতলার আয়োজন আরও বিশাল। চওড়া, টানা, চিক ফেলা বারান্দা। শেষ মাথায়, মোটা মোটা গরাদ বসানো খাঁচায় বিশাল দুটো ম্যাকাও পাখি খ্যা, খ্যা করে ডাকছে, আর মাঝে মাঝে লোহার গরাদে টিনকাটা কাঁচির মতো ঠোঁট ঠুকছে। ঘরের ভেতর ঘর, তার ভেতর ঘর। এমনি বেশ সাজানো-গোছানো, তবে দীর্ঘকাল ঝাড়ামোছা হয়নি। পাতলা ধুলোর স্তর জমে আছে মেঝেতে, ফার্নিচারে।

একেবারে শেষের ঘরে এসে আমাদের অনুসন্ধান শেষ হল। নীল কাচ ঘেরা, নীল একটি ঘর। সমস্ত অসবাবপত্র সাদা। বড় অদ্ভুত দৃশ্য। ছোট্ট একটি সাদা টেবিলের ওপর সাদা প্রিয়দর্শিনী ফোন। সাদা বেতের চেয়ারে অসাধারণ সুন্দর একজন মানুষ যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন। রিসিভার-ধরা ডান হাতটি টেবিলের ওপর এলিয়ে পড়ে আছে। মাথাটা সামনে ঝুলে আছে। বসে বসে ঘুমিয়ে পড়লে যেমন হয় আর কি!

অভয়বাবু বললেন, 'বাঃ, এ মূর্তিটার কী সুন্দর ভঙ্গি দেখুন। এটাও মনে হয় কোনও ইতালীয় শিল্পীর তৈরি।'

দাদু বললেন, 'তোমার মুণ্ডু। এটা মুর্তি নয় মানুষ! অ্যান্ড হি ইজ ডেড। মনে হয়, এঁরই নাম বিপুলবরণ।'

'বিপুলকিরণ দাদু।'

'আরে বাবা বরণ আর কিরণ এক জিনিস। ব্যাপারটা কী হয়েছে বুঝলে! টেলিফোনটি তুলে হ্যালো বলার আগেই স্ট্রোক।'

অভয়বাবু বললেন, 'এ পোস্ট-মর্টেম না হলে মৃত্যুর কারণ বলা যাবে না।'

'তুমি বলছ মার্ডার?'

'হতে পারে। আচ্ছা, মেঝেতে এত চুন-বালি পড়ে আছে কেন! মনে হচ্ছে সিলিং থেকে খুলে পড়েছে। বাড়িটা পুরনো ঠিকই; কিন্তু ভেঙে পড়ার অবস্থা তো হয়নি।'

দাদু সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটি ছিদ্র আবিষ্কার করলেন। রক্তমুখী নীলার মতো বাইরের আলো সেই ছিদ্রপথে নেমে আসছে। শুধু ওই ছেঁদা নয়, খানিকটা অংশ কেউ যেন ধারালো কিছু অস্ত্র দিয়ে কেটে দিয়েছে।

অভয়বাবু ব্যাটন তুলে উত্তেজিত হয়ে যেই দেখাতে গেলেন, 'ওই দেখুন....', কথা শেষ হল না। টানটান তার হঠাৎ ছিঁড়ে পড়ে গেলে যে-রকম শব্দ হয়, চিন করে সেইরকম একটা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটনের মাথাটা কেটে দু'করো হয়ে ঘুরতে ঘুরতে দূরে গিয়ে পড়ল।

'আরে ব্বাস, এ কী ব্যাপার?' অভয়বাবু ভয়ে মাথা নিচু করে মেঝেতে বসে পড়লেন।

pathagar.net

 F-1 SEP 2005

দাদু বললেন, 'কী আশ্চর্য! ভৌতিক ব্যাপার।'

'পুলিশ হয়ে ভূতে বিশ্বাস করি কেমন করে। দাঁড়ান, আর একবার পরীক্ষা করি। যে জায়গায় দাঁড়িয়ে যেভাবে ব্যাটনটা দুলিয়েছিলুম সেইভাবে আর একবার আর একটা কিছু দোলাই। ওই ল্যাম্প-স্টান্ডটা।'

অভয়বাবু ল্যাম্প-স্ট্যান্ডটা ধীরে ধীরে ওপরদিকে তুলতে লাগলেন। উত্তেজনায় আমাদের নিশ্বাস পড়ছে না। হঠাৎ একটা জায়গা বরাবর স্ট্যান্ডের মাথাটা আসতেই চিন করে সেইরকম একটা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা কেটে উড়ে গেল। কেউ যেন ধারালো অস্ত্রে কোপ মেরে দিলে।

অভয়বাবু মেঝেতে বসে পড়ে বললেন, 'কী বুঝছেন ? ওই জোনে মানুষের মাথা পড়লে উড়ে যাবে।'

দাদু গোল হয়ে চারপাশটা ভাল করে একবার দেখে নিলেন। চোখদুটো উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে। 'বুঝলে অভয়, এ ঘরে খুব বেশি নড়াচড়া না করাই ভাল। যে যেখানে আছি, সেইখানে দাঁড়িয়েই ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করা যাক।

'দাদু, আমি একটা কথা বলব ?'

'এই দুর্দিনে তুমি আবার আশান্তি করবে ?'

'অশান্তি নয়। আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, রিসিভারের যে মুখটা কানে দেওয়া হয়, সেই মুখটা টেবিলের ওপর এখন যেভাবে যেমন পড়ে আছে, সেই বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু থেকে কোনাকুনি একটা জ্যা টানলে, সেই জ্যা ছাদের যে অংশ স্পর্শ করে, সেই অংশটি ফুটো হয়ে খুলে পড়েছে। চোখে দেখে আমার যা মনে হল, আপনাকে বললুম।'

দাদু আর অভয়বাবু দুজনেই একসঙ্গে বললেন, 'বাবা, কী সাংঘাতিক জ্যামিতি! তার মানে ? তুমি কী বোঝাতে চাইছ ?'

'আজ্ঞে, ওই যে কাল্পনিক রেখাটির কথা আপনাদের বললাম, ওই রেখার লাইনে কোনও কিছু এলেই দু-টুকরো হয়ে যাচ্ছে। যেমন ল্যাম্পস্ট্যান্ডের মাথাটা। বিশ্বাস না হয় আবার পরীক্ষা করে দেখুন।'

দাদু বললেন, 'বলো কী! তোমার মাথা তো বেশ খুলে গেছে!'

অভয়বাবু বললেন, 'বেশ, আর একবার পরীক্ষা করা যাক।'

ল্যাম্পস্ট্যান্ডের বাকি অংশটা হিসেবমতো তুললেই চিন করে আবার সেই শব্দ, খানিকটা অংশ ঠিকরে চলে গেল। আনন্দে আমি হাততালি দিয়ে উঠলুম। আমার ধারণাই ঠিক।

অভয়বাবু বললেন, 'উঃ, তুমি ঠিক ধরেছ তো! আচ্ছা, কেন এমন হচ্ছে বলতে পারো ?'

'আজ্ঞে যতদূর মনে হয়, বিজ্ঞানের গল্প পড়ে যা জেনেছি, ওই রিসিভারের

pathagar.net

কানের অংশটি মারাত্মক, ওর মধ্যে এমন কোনও কল আছে, যা সুপারসনিক শব্দতরঙ্গ ছাড়ছে, যে তরঙ্গের ক্ষমতা অসীম। স্পেনে, এক্সম্যান বলে এক খুনি, ওই শব্দতরঙ্গ দিয়ে অনেক খুন করেছিল। নাইট অব দি বেলথাবাব বইয়ে পড়েছি। বিশ্বাস না হয় রিসিভারের মুখে একটা কিছু চাপা দিয়ে দেখুন।'

অভয়বাবু নিচু হয়ে টেবিলের ওপাশে গিয়ে উঠলেন। হাতের কাছে কিছু না পেয়ে একটা মোটা বই পাশ থেকে সাবধানে ইয়ারপিসের ওপর ফেলতেই সুঁই-সাঁত করে একটা শব্দ হল, সঙ্গে বই ফুটো। শুধু ফুটো নয়, দপ করে আগুন ধরে গেল।

দাদু বললেন, 'এ ক্লিয়ার কেস অব মার্ডার। ব্যাপারটা কী বুঝতে পেরেছ অভয়! রিসিভারটি তুলে কানের কাছে আনার সঙ্গে সঙ্গে ইয়ারড্রাম ছ্যাঁদা করে ব্রেনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেছে। মৃত্যুর কারণ—কনকাসনস অব দি ব্রেন।'

'সে তো বুঝলুম, কেসটা কিন্তু ভীষণ কমপ্লিকেটেড হয়ে গেল। দেখলেন তো সেই কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরল!'

'তুমি সবার আগে ওই বিপজ্জনক রিসিভারটিকে উলটে রাখো।'

'আজ্ঞে ও আমার কম্মো নয়। একসপার্ট আনাতে হবে।'

'তা হলে শব্দ যে অ্যাকসিস ধরে যাচ্ছে সেইটা খেয়াল রেখে ঘরটা একটু অনুসন্ধান করলে কিছু ক্লু পাওয়া যেতে পারে। ভদ্রলোকের নিশ্চয়ই ডায়েরি লেখার অভ্যাস ছিল। অন্তত আমার তাই ধারণা।'

'আচ্ছা আমার কিছু একটা সন্দেহ হচ্ছে মুকুজ্যেমশাই, মৃত ভদ্রলোকই কি বিপুলকিরণ, কারণ চোখে কোনও চশমা নেই।'

'আরে, চশমা তো আমার পকেটে। চোখে থাকবে কী করে।'

'চশমা যাঁরা দীর্ঘদিন পরেন তাঁদের নাকের ওপর একটু দাগ থাকে। কই চশমাটা দেখি।'

দাদু চশমাটা পুলিশ অফিসারের হাতে দিলেন। চশমাটা ভাল করে দেখলেন। চোখের সামনে তুলে ধরে, একবার কাছে এনে, দূরে সরিয়ে বললেন, 'মাইনাস পাওয়ার এবং বেশ ভালই পাওয়ার। যাঁর চশমা, তিনি মায়োপিক। চশমা ছাড়া পৃথিবী তাঁর কাছে ধূসর। চশমা ছাড়া একমুহূর্তও চলার কথা নয়। তাছাড়া ওই মুখের এই চশমা হতেই পারে না। কত বড় দেখেছেন?'

দাদু বললেন, 'ইনি তা হলে কে?'

অভয়বাবু বললেন, 'দেয়ালে দুটো ছবি ঝুলছে দেখেছেন? তার মধ্যে একজনের চোখে চশমা এবং এই চশমা। তার মানে, উনিই হলেন সেই নিরুদ্দিষ্ট বিপুলকিরণ। ছবিটার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখুন।'

দাদু বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ। ইনি তাহলে কে?'

pathagar.net

'দাঁড়ান, ওই ধোবিটাকে ডাকা যাক।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ধোবি এসে গেল। রুটি পাকাচ্ছিল। হাতময় আটা লেগে আছে। ঘরে ঢুকে লোকটি আড়ষ্ট হয়ে গেল। অভয়বাবু বললেন, 'এই বাবুকে চেনো, উঁহু কাছে যেও না, মরবে। দূর থেকে দেখে বলো।'

লোকটি বললে, 'এ বাবু, বিপুলবাবুর লেড়কা। কভি-কভি আসেন, কভি-কভি বাহার চলে যান। আওর কুছ হামি জানে না বাবু। সাচ বাত।'

'আচ্ছা, তুমি যাও।'

ধোবি সেলাম করে চলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি আর একটা জিনিস আবিষ্কার করলুম, মুখবন্ধ একটা চিঠি। চিঠিটা পোস্ট করা হয়নি। ঠিকানা লেখা হয়েছে, ডাকটিকিটও সাঁটা হয়েছে। যাঁকে উদ্দেশ করে লেখা তাঁর নাম মিসেস রোজমেরি চৌধুরী, যশলোক হসপিট্যাল।

দাদু বললেন, 'অভয়, চিঠিটা খোলা যাক।'

চিঠিটা খোলা হল। বাংলাতেই লেখা, 'মা, তোমার কথামতো বাবার তদারকি করতে এসে আমার খুব খারাপ লাগছে, বেশ ভয়ও করছে। বাবার এখন খুব খারাপ সময় যাচ্ছে। অর্থাভাব, শরীরও ভাল যাচ্ছে না। চারপাশে পাওনাদার। তার ওপর ম্যালকম নামক এক সায়েবের পাল্লায় পড়েছেন। দুজনে কিসের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কে জানে! আমার মনে হয় ওই সায়েবই বাবাকে শেষ করে দেবেন। আমার আশঙ্কা যে কতদূর সত্য কালই তার প্রমাণ পেলাম। মাঝরাতে বাবা আর ম্যালকম সায়েব নীচের লাইব্রেরি ঘরে, যেখানে আমার ঠাকুর্দার পিতার স্ট্যাচু আছে সেই ঘরে ঢুকলেন। আমার ঘরে বিছানায় শুয়ে শুয়েই টের পেলাম। ওঁদের দুজনকে অনুসরণ করার ইচ্ছা আমার আর হল না। সায়েব আমাকে তেমন পছন্দ করেন না। বাবাকে আজকাল কেমন যেন অপরিচিত মানুষের মতো মনে হয়। আমি ভাবলাম লাইব্রেরি ঘরে ওঁরা একটা কিছু খুঁজছেন, সেইটুকু আমি বুঝেছি। সারাদিন বইপত্তর ঘাঁটছেন, পরিবারের পুরনো রেকর্ড নাড়াচাড়া করছেন। একদিন ওঁদের একটা কথা ওভারহিয়ার করেছিলুম, 'সেভেনথ স্টেপ, আন্ডার গ্রাউন্ড।' কী তার মানে, বুঝিনি, বোঝার চেষ্টাও করিনি। এখন মনে হচ্ছে উদাস হয়ে ভুলই করেছি।

আজ এই দুপুর পর্যন্ত দুজনেরই পাত্তা নেই, অথচ গ্যারেজে গাড়িটা রয়েছে। এখন আমার কী করা উচিত! পুলিশে যেতে সাহস হচ্ছে না একটি মাত্র কারণে, সে কারণ তুমি জানো। আমার মনে হয় তোমার একবার আসা উচিত। ইতি সহস্রকিরণ।'

দাদু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'অভয় লাইব্রেরি, সব রহস্য ওই ঘরে। দুজনে ঢুকেছে কিন্তু বেরোয়নি।'

'কী থাকতে পারে ও ঘরে?'

pathagar.net

'এমন কিছু, যা দুজনে হন্যে হয়ে খুঁজছে। এই ম্যালকম লোকটাই বা কে ?'

আবার আমরা লাইব্রেরি ঘরে এসে ঢুকলুম। বাতাসে একটা পোড়া-পোড়া গন্ধ। কাগজ পোড়া ! চুরুট ! কিসের গন্ধ ! এ গন্ধ তো একটু আগে ছিল না। দাদু বললেন, 'অভয় একটা গন্ধ পাচ্ছ ?'

'পাচ্ছি মুকুজ্যেমশাই। আগে ছিল না।'

'আচ্ছা, সেভেনথ স্টেপ আন্ডারগ্রাউন্ড মানেটা কী ?'

'মাটির তলায় সপ্তম ধাপ।'

'কোন মাটি ? এই ঘরের মাটি ? আচ্ছা এই স্ট্যাচুটা কি আমরা ভাল করে দেখেছি ? বুড়ো, মাটিয়ে শুয়ে পড়ে কান পাতো।'

শুয়ে পড়ে কান পাততেই বহুদূর থেকে ভেসে আসা বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ শুনতে পেলুম। সেই রকমই মনে হল যেন ! দাদুকে বললুম। সকলেই একবার করে শুনলেন। অভয়বাবু বললেন, 'বাসুকির নিশ্বাস।'

দাদু বললেন, 'ইঞ্চি-ইঞ্চি করে মেঝেটা পরীক্ষা করা দরকার। এই ঘর। এই ঘরেই ওরা এমন কিছু সন্ধান পেয়েছে, যা মূল্যবান।'

আবার আমার আবিষ্কার। চেয়ারে বসে থাকা পাথরের মূর্তির তলায় একপাশে তেলের মত কী যেন পড়ে আছে। সহজে চোখে পড়ার কথা নয়। খুব খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে ধরা পড়ল। দাদু আর অভয়বাবু দুজনেই পরীক্ষা করলেন, 'ঠিক বলেছ তুমি, তেলই। তেল কেন এল ?'

অভয়বাবু চেয়ারের হাতল ধরে বাঁ দিকে টানতেই মূর্তিটা একটু যেন ঘুরে গেল।

'মুকুজ্যেমশাই, এটা যেন ঘুরতে চাইছে।'

'তাই নাকি ? এসো তাহলে, মারো টান, ঘোরাও, ঘোরাও।'

দুজনের টানে পুরো একশো আশি ডিগ্রি সহজেই ঘুরে গেল। মূর্তির মুখ হয়ে গেল দরজার দিকে। গোল একটা গর্ত। অল্প-অল্প ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সামান্য পোড়া পোড়া গন্ধ। ক্ষীণ একটা গোঙানির শব্দ। পাতালের অন্ধকার থেকে কে যেন অস্পষ্ট স্বরে বলছেন, 'একটু জল, একটু জল।'

দাদু বললেন, 'কুইক অভয় কুইক। আলো ফেলো, আলো।'

টর্চের আলো পড়তেই দেখা গেল, ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে পাতালের দিকে। অভয়বাবু আপনমনে বললেন, 'সেভেনথ স্টেপ আন্ডারগ্রাউন্ড !'

দাদু বললেন, 'মনে রেখো, সেভেনথ স্টেপ মানে সপ্তম ধাপ।'

'আমরা তাহলে নামতে থাকি মুকুজ্যেমশাই ?'

'অবশ্য, অবশ্য। প্রতিটি মুহূর্ত এখন মূল্যবান।'

এক ধাপ, দু ধাপ, ধাপগুলো বেশ উঁচু উঁচু। পোড়া পোড়া গন্ধটা বেশ

pathagar.net

প্রবল হচ্ছে ক্রমশ। পঞ্চম ধাপ। আমরা বেশ নীচে নেমে এসেছি। গরম একটা বাতাস আসছে। ষষ্ঠ ধাপে অভয়বাবু থেকে পড়লেন। পেছনে দাদু, তার পেছনে আমি। দাদু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল অভয়।'

'সপ্তম ধাপটা নেই মুকুজ্যেমশাই। ভেঙে ফেলেছে। এখন আমাদের জয় মা বলে লাফাতে হবে। পারবেন আপনি?'

'খুব পারব। মারো লাফ। খুব সাবধান। কিসের ওপর লাফাচ্ছ একবার দেখে নাও। তলিয়ে যেও না যেন।'

অভয়বাবু একটা পুলিশি লাফ মারলেন। অন্ধকার কোথায় গিয়ে পড়লেন বোঝা গেল না। টর্চের আলো দুলে উঠল। পর-পর আমরা দুজনে লাফিয়ে পড়লুম। অদ্ভুত সুন্দর এক সুড়ঙ্গ। সামনে চলে গেছে। কোথায় গেছে কে জানে! সোজা হয়ে দাঁড়ানোও চলে। ছাদটা যদিও মাথার খুব কাছে। দূরে একটা আগুন ফুলকি কেটে কেটে সামনে আমাদের দিকেই যেন এগিয়ে আসছে।

দশ-বারো পা এগোতেই গোঙানির শব্দটা আরও স্পষ্ট হল। একজন মানুষ কাত হয়ে পড়ে আছেন। মুখ বাঁধা। হাত-পা পিছমোড়া। দাদু বললেন, 'আরে! এই তো বিপুলকিরণ।'

অভয়বাবু হঠাৎ আতঙ্কের গলায় বললেন, 'সর্বনাশ, এ কী করেছে। কুইক, কুইক। আগুনটা কোথায় কী ভাবে এগিয়ে আসছে দেখেছেন। এখুনি ঝাড়বংশে শেষ হয়ে যাব।'

মুখখোলা একটা পেট্রলের টিন, তার ভেতর থেকে বেরিয়ে গেছে দড়ির পলতে। আর মাত্র হাত-পাঁচেক দূরে আগুন। দড়ি বেয়ে সাপের মতো খেলতে-খেলতে এগিয়ে আসছে। অভয়বাবু ছোঁ মেরে দড়িটা টিন থেকে তুলে নিয়ে দূরে ছুড়ে ফেলে দিলেন। ছুটে গিয়ে পা দিয়ে চেপে চেপে আগুনটা নিবিয়ে দিলেন।

দাদু বললেন, 'মারার কল বেশ ভালই তৈরি করে রেখে গেছে। কার কাজ বলো তো?'

অভয়বাবু বিপুলকিরণের মুখের বাঁধন খুলতে খুলতে বললেন, 'ইনিই বলতে পারবেন।'

বিপুলবাবু বললেন, 'একটু জল।'

দাদু বললেন, 'জল পরে, আগে বলুন ব্যাপারটা কী?'

'ম্যালকম, ম্যালকম আমার সর্বনাশ করে চলে গেছে।'

'কোথায় গেছে।'

'ওই সপ্তম ধাপের তলায় ছিল বহুমূল্য সোনার জগদ্ধাত্রী। কেউ জানত না। আমরা দুজনে সারা রাত ধরে খুঁড়ে বের করার পর আচমকা আমাকে আক্রমণ করে। আমার এই অবস্থা করে, সুড়ঙ্গ ধরে সোজা চলে গেছে সামনের দিকে।'

pathagar.net

'কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে এই সুড়ঙ্গ।'

'একেবারে ফোর্টের ধারে গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে।'

'বাবা সে তো দীর্ঘপথ! কতক্ষণ আগে গেছে?'

'খেয়াল নেই। এখন দিন কি রাত আমার জানা নেই।'

'আপনি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবেন?'

'একটু জল।'

আমার পকেটে কিছু লজেন্স ছিল। দুটো বের করে বিপুলবাবুর হাতে দিলুম মোড়ক খুলে। অভয়বাবু বললেন, 'চুষতে চুষতে চলুন। আর ভাববার সময় নেই।'

আমরা চারজনে প্রায় দৌড়তে শুরু করলুম। কী মজা! মাথার ওপর কলকাতা, আমরা তলা দিয়ে ছুটছি। উলটো দিক থেকে ড্যামপ বাতাস আসছে। সোঁদা-সোঁদা গন্ধ। মাঝে মাঝে হিস-হিস শব্দ আসছে। মনে হয় সাপ। জায়গায় জায়গায় মাথার ওপর গাছের শিকড় ঝুলে পড়েছে হিলহিলে সাপের মতো।

বিপুলবাবু হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন, 'আর আমরা ওকে ধরতে পারব না। বড় সাংঘাতিক ক্যারেকটার। বন্ধুর ছদ্মবেশে এসেছিল ইন্টারন্যাশানাল স্মাগলার।'

দাদু ছুটতে ছুটতে বললেন, 'তবু চেষ্টা। ও হ্যাঁ, এই নিন, আপনার চশমা আর নোটবুক। এই দুটোর জোরেই প্রাণে বাঁচলেন।'

এইবার মনে হচ্ছে কোথাও একটু বসতে পারলে হত। আলিপুর থেকে ফোর্ট, কম দূর! অভয়বাবু হাতের টর্চ সামনের দিকে অন্ধকারের বুক চিরে চলে গেছে। এতক্ষণ আলোকে অন্ধকার গ্রাস করে নিচ্ছিল। হঠাৎ আলো কিসে যেন ঠিকরে ফিরে এল। অন্ধকার ঝলমল ঝলমল করে উঠল। চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

দাদু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'জ্যোতি, জ্যোতি।'

বিপুলবাবু প্রায় চিৎকার করে বললেন, 'আমার সোনার জগদ্ধাত্রী।'

দেয়ালে পিঠ দিয়ে লম্বা চেহারার এক সায়েব চোখে হাত চাপা দিয়ে বসে আছেন। দেখলেই মনে হয় সম্পূর্ণ অসহায়। বিপুলবাবু দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'স্কাউন্ড্রেল ম্যালকম।'

ম্যালকমের হাতদুটো চোখের সামনে তোলাই ছিল অভয়বাবু কড়াক কড়াক করে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন। ম্যালকম ক্ষীণ স্বরে বললে, 'কে, পুলিশ?'

অভয়বাবু ব্যঙ্গের সুরে বললেন, 'কেন দেখতে পাচ্ছ না মানিক!'

ম্যালকম করুণ সুরে বললে, 'দেখতে পেলে, আমাকে কি আর এখানে দেখতে পেতে! ওই মূর্তি আমাকে অন্ধ করে দিয়েছে। শুধু অন্ধ নয়, আমার পা দুটোও অসাড় হয়ে গেছে। বিলিভ ইট অর নট।'

pathagar.net

'আমরা এখন তাহলে কোন্ দিকে যাব মুকুজ্যেমশাই। শুরুর দিকে, না শেষের দিকে?' অভয়বাবু প্রশ্ন করলেন।

দাদু বললেন, 'শুরুর দিকে। যেদিক থেকে এসেছি, সেই দিকেই যেতে হবে। বিপুলবাবু হয়তো দুঃখ পাবেন, তবু সত্যকে তো আর চেপে রাখা যাবে না। আপনার ছেলে সহস্রকিরণ খুন হয়েছে।'

আমি ভেবেছিলুম খবরটা শুনেই বিপুলবাবু উলটে পড়ে যাবেন। না, খুব সামলে নিলেন। সামান্য একটু মুখের শব্দ করে বললেন, 'আমাদের কিন্তু শেষ থেকেই শুরু করতে হবে।'

'তার মানে?'

'আমরা মূর্তিটা নিয়ে ফোর্টের দিকে যাব। ওখানে আমার গাড়িটা এই ব্যাটা সায়েব পার্ক করে রেখে এসেছে। গাড়িটাকে নিয়ে আসা দরকার। গাড়িটার এখন অনেক দাম। ওলড মডেল।'

'তা মূর্তিটা নিয়ে যাবার কী দরকার? ওটা এখানেই থাক না।' অভয়বাবু খুঁতখুঁতে গলায় বললেন।

বিপুলবাবু বললেন, 'এই অভিশপ্ত সুড়ঙ্গে আর ঢুকতে চাই না। তাছাড়া, আমরা এখন ফোর্টের খুব কাছে আছি। দেখছেন না, গঙ্গার বাতাস আসছে। আমরা গাড়ি চেপে ফিরে আসব।'

অভয়বাবু বললেন, 'ফিরে আসব কেন? সোজা থানা চলে যাব। মূর্তিটাকে সরকারি খাতায় জমা করে দিতে হবে।'

বিপুলবাবু বললেন, 'সে আবার কী কথা! আমার মূর্তি সরকারি খাতায় চলে যাবে? এ যে দেখছি হবু রাজার আইন।'

'বিপুলবাবু, এটা এখন আর মূর্তি নয়। সলিড গোল্ড। সরকারি আইনকানুন বড় জটিল। তাছাড়া আপনিই যে বিপুলকিরণ তার কোনও প্রমাণ নেই।'

দাদু বললেন, 'অভয়, পয়েন্টটা তুমি ভালই তুলেছ হে। ধোবি যে চেহারার বর্ণনা দিয়েছ তার সঙ্গে তো মিলছে না। বিপুলবাবু আপনার র‍্যাশান কার্ড আছে?'

'র‍্যাশানের চাল, র‍্যাশান কার্ড এসব আমার স্ট্যাটাসের অনেক নীচে। আমার কাছে খুব ইনসাল্টিং মনে হয়।'

'তা বললে চলে? র‍্যাশান কার্ড ছাড়া প্রমাণ করবেন কী করে, আপনি কলকাতার নাগরিক। তাছাড়া প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের সঙ্গে আপনার চেহারা একদম মিলছে না।'

'প্রত্যক্ষদর্শী আবার কে?'

'আপনারই ভাড়াটে ধোবি।'

'কী বর্ণনা দিয়েছে?'

pathagar.net

'বড়-বড় চুল, দাড়ি-গোঁফ, যেন তুলসীদাসজি। কখনও প্যান্ট-কোট পরেন, কখনও শেরোয়ানি'।

'ঠিকই বলেছে। কালই আমি দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে ফেলেছি, এই এক্সপিডিশনের জন্যে।'

অভয়বাবু বললেন, 'তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তর্কাতর্কি করে লাভ কী ? মূর্তি আপনার না সরকারের, আইন ঠিক করে দেবে। আমরা পুলিশ, আইনের কী বুঝি বলুন ? আর আপনি যদি বিপুলকিরণ সত্যিই হন, এক মিনিটে প্রমাণ করে দিতে পারবেন। গাড়ির লাইসেন্স আছে। ব্যাঙ্কের পাসবই আছে। নিন চলুন। এগিয়ে চলুন।'

বিপুলবাবু পকেট থেকে একটা বড় তোয়ালে বের করে মূর্তিটায় জড়িয়ে দিলেন। তারপর বেশ কসরত করে তুলে নিলেন কোলে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে বেশ ভারি। এতক্ষণ কেউ ভেবে দেখেনি, ম্যালকমসায়েব কী করে হাঁটবে। চোখ অন্ধ। পায়ে পক্ষাঘাত।

শলাপরামর্শ করে ঠিক হল, হাতকড়া বাঁধা অবস্থায় ম্যালকম যেমন আছে ওই ভাবেই থাকবে। একটা স্ট্রেচার এনে থানায় নিয়ে যাওয়া হবে চ্যাংদোলা করে।

অভয়বাবু বললেন, 'ফরোয়ার্ড মার্চ।'

শব্দটার মধ্যে কী আছে, কে জানে ! সকলেই আমরা এগোতে লাগলুম সৈনিকের মতো। পাঁচ মিনিটও হাঁটা হয়নি, সুড়ঙ্গ শেষ হয়ে গেল। সামনেই দশ ধাপ সিঁড়ি। মাথার ওপর গোলাকার আকাশ। ভীষণ অবাক লাগছে। অত বড় একটা গোলমুখ, বাইরের কারুর নজর পড়ে না কেন ? অনবরতই তো লোক চলাচল করছে। কেউ কি একবার ভাবেও না গর্তটা কিসের ! আচমকা কেউ পড়ে যেতেও তো পারে ?

সব প্রশ্নের জবাব পেলুম ওপরে এসে। গর্তের মুখটা মনে হয় কালও চাপা ছিল। গোল একটা ঘাসের চাবড়া উলটে পড়ে আছে একপাশে। লোহার ঢাকনার ওপর কার্পেটের ঘাস গজিয়েছে। অষ্টাদশ শতকের সুড়ঙ্গমুখ বিংশ শতকে খোলা হল। আমরা প্রিনস অব ওয়েলসের মেমোরিয়ালের কাছে উঠে এসেছি। সামনেই দ্বিতীয় হুগলি সেতুর বিশাল বিশাল পিলার। জায়গাটা বেশ নির্জন নির্জন। লোক চলাচল নেই বললেই চলে। দূরে দূরে গাড়ি ছুটছে। ফাঁকায় এসে দম ছেড়ে বাঁচলুম। একপাশে সেই বিদ্‌ঘুটে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। ধোবির বর্ণনার সঙ্গে বেশ মিলে যাচ্ছে। গাড়িটার পেছন দিকে অনেক পাইপ বেরিয়ে আছে। পুরনো গাড়িতে এত পাইপ থাকত নাকি ?

ফিস-ফিস করে দাদুকে প্রশ্ন করলুম। দাদু একটু বিরক্ত হলেন, 'তুমি আর জ্বালিও না বাপু।'

'ঠিক আছে, জ্বালাব না। তবে গাড়ির চেহারাটা বড় সন্দেহজনক।'

pathagar.net

অভয়বাবু মূর্তিটাকে ড্রাইভারের পাশের আসনে সাবধানে বসালেন। তোয়ালের মোড়কে ফুট-দুয়েক উচ্চতার একটি আকৃতি।

বিপুলবাবু বললেন, 'দাঁড়ান, আগে দেখি স্টার্ট নেয় কি-না। তা না হলে হাতল মারতে হবে। মাঝে মাঝে ঠেলতেও হয়।'

বিপুলবাবু দরজা খুলে চালকের আসনে বসলেন। দরজা বন্ধ করে পায়ের কাছে কোনও একটা কিছুতে চাপ দিলেন। ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। আওয়াজটা কানে লাগল। নতুন ধরনের আওয়াজ। পেছনের পাইপ দিয়ে নীল এক ঝলক আগুন বেরিয়ে এল। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে। সব কটা পাইপের মুখে আগুন জ্বলছে। এক একরকম রঙ। নীল, লাল, চাঁপাফুল।

অভয়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী, সব ঠিক আছে তো?'

বিপুলবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

'আমরা তাহলে উঠি।'

'হ্যাঁ, উঠে পড়ুন।'

অভয়বাবু দরজার দিকে হাত বাড়ালেন। ঠিক পেছনেই দাদু, পাশে আমি। নিমেষে ব্যাপারটা ঘটে গেল। বিদ্যুৎবেগে গাড়িটা গঙ্গার দিকে ছুটে গেল। অভয়বাবু বাতাসের ঝাপটায় উলটে পড়ে গেলেন। মনে হল একটা রকেট উড়ে চলে গেল। পেছন দিকে আগুন গলে গলে পড়ছে। সমস্ত আওয়াজ ছাপিয়ে শোনা গেল অট্টহাসি। 'গুডবাই মিস্টার চিপস।'

আমি আর অভয়বাবু দুজনেই দৌড়াতে লাগলুম। ব্যর্থ চেষ্টা। গাড়ি ম্যান অবওয়ার জেটির ওপর দিয়ে সোজা জলে নেমে তীব্র বেগে ডায়মন্ডহারবারের দিকে ছুটে গেল।

অভয়বাবু হতাশ হয়ে বললেন, 'এটা কী হল?'

'আজ্ঞে, গাড়িটা অ্যাম্ফিবিয়াস।'

'সে আবার কী?'

'উভচর। স্থলেও চলে, জলেও চলে। জেট ইঞ্জিন লাগানো।'

'ইডিয়েট।'

'কে, আমি?'

'তুমি না, তুমি না, আমি।'

'আমি পেছনে অতগুলো পাইপ দেখে দাদুকে বলেছিলুম। দাদু বললেন, আর জ্বালাসনি।'

'লোকটা কে বলো তো?'

'ওর নাম মনে হয়, ক্যালিপসো-থ্রম্বোফব।'

'সে আবার কে?'

'আজ্ঞে, বইয়ে পড়েছি, পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ অপরাধী।'

pathagar.net

'দূর, সে হল গল্প।'

'গল্পই তো সত্যি হল ?'

'তা ঠিক।'

দাদু এসে গেছেন, 'কি, ভেগেছে তো ?'

'হ্যাঁ, কলা দেখিয়েছে। আচ্ছা, চশমাটা ঠিক আপনি কোন্ জায়গায় পেয়েছিলেন ?'

'চলো দেখাচ্ছি।'

যেখান থেকে আমরা চশমা আর নোটবই পেয়েছিলুম সেই জায়গাটায় এলুম। কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ফোর্টের পরিখা। দুজন মিলিটারি অফিসার গলফ স্টিক উঁচিয়ে, অনেকটা নীচে ঝোপের মধ্যে কিছু একটা দেখাচ্ছেন উত্তেজিত হয়ে। কিছু দূরে একটা শকুন বসে আছে।

অভয়বাবুকে দেখে একজন চিৎকার করে বললেন, 'অফ্‌সার, হিয়ার লাইজ এ ডেডম্যান'।

অভয়বাবু তাঁর বিশুদ্ধ ইংরিজিতে উত্তর দিলেন, 'হাউ টু গো দেয়ার, হিয়ার ইজ কাঁটাতারের বেড়া।'

দাদু বললেন, 'ইশ, ইশ, ইংরিজি বাংলায় জগাখিচুড়ি করছ, বলো বার্বড ওয়ার ফেনসিং।'

'মুকুজ্যেমশাই, আমার আর মাথার ঠিক নেই, মরতে মরতে বেঁচে গেছি।'

'আর্মি অফিসাররা স্টিক নাচিয়ে বললেন, 'কাম দ্যাট ওয়ে।'

'কামিং, কামিং, উইথ মাই ফোর্স।'

দাদু বললেন, 'এখন আমাদের সেই আলিপুর অব্দি হাঁটতে হবে নাকি ?'

'হাঁটতে হবে কেন। এখনও পুলিশের সে খাতির আছে। হাত তুললে যে কোনও গাড়ি থেমে যাবে।'

'তার আগে চলো আমরাই একবার ডেড-বডিটা দেখে আসি। ফোর্টের প্ল্যাসি-গেট দিয়ে ঢুকে পড়ি। আমার ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে।'

'কৌতূহলের কী আছে ? ময়দানে অমন ডেডবডি হামেশাই পড়ে থাকে। আর একটা কেস বাড়ল।'

'আজ্ঞে না, এর সঙ্গে ওই চশমার যোগ আছে।'

ফোর্টের পথ ঢালু হয়ে ক্রমশ নীচের দিকে নেমে গেছে। দুজন অশ্বারোহী সৈনিক দুলকি চালে চলেছে। স্পটে পৌঁছতে প্রায় মিনিট-দশেক সময় লাগল। বাবা, কলকাতার তলায় এ যেন আর এক কলকাতা।

ঝোপঝাড়ের মধ্যে সাদা লংকোট-পরা একজন মানুষ যেন ঘুমে অচেতন। লম্বা-লম্বা চুল, দাড়ি। দাদু বললেন, 'এই দ্যাখো, আসল ঋিপুলকিরণ এখানে পড়ে আছে চিরনিদ্রায়। ব্যাপারটা কী বলো তো, মার্ডার !'

pathagar.net

'তাই তো মনে হচ্ছে। পুরোটাই ইনভেসটিগেশনের ব্যাপার। দেখলেন তো, তখনই বলেছিলুম, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবে।'

'তাই তো জগতের নিয়ম রে বাবা। বিপুলকিরণকে ওই দুটো ঠগ-কালই শেষ করেছে। অসাবধানে চশমাটা ফেলে রাখায় সব গোলমাল হয়ে গেল। পালের গোদাটা পালাল জেট গাড়িতে চেপে। ফাঁদে পড়ে গেল সায়েব।'

'আমি এখন কিছু মন্তব্য করব না। ফার্স্ট ইনভেসটিগেশন, দেন রিপোর্ট।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো বটেই। আইন ইজ আইন। তবে আমার অনুমানের কথা তোমাকে বললুম।'

অভয়বাবু অফিসারদের বললেন, 'আপনাদের ওয়্যারলেসটা একটু ব্যবহার করতে চাই। উই হ্যাভ আনআরথড এ টানেল, নিয়ার টু ইওর ফোর্ট। ডেডবডি হিয়ার, ডেডবডি দেয়ার, ডেডবডি এভরিহোয়্যার।'

দাদু বললেন, 'আঃ অভয় তোমার ইংরিজিটা তেমন সুবিধের নয়। কাজ করো, কাজ করো।'

আর্মি-অফিসাররা গলফ স্টিক নাচাতে নাচাতে এগিয়ে চললেন, আমরা পেছনে। বেতার প্রেরক যন্ত্রের বিশাল টাওয়ার আকাশের দিকে উঠে গেছে। এক ধরনের সুঁই-সুঁই আওয়াজ হচ্ছে। ঘরে বসে আছেন কানে হেডফোন লাগিয়ে এক জওয়ান।

অভয়বাবু বললেন, 'সমস্ত পোর্টকে অ্যালার্ট করে দিন, ক্লস্ট্রোফোবিয়া উভজানে চেপে ভাগছে। ক্যাচ হিম। ক্যাচ হিম।'

আমি বললুম, 'ক্লস্ট্রোফোবিয়া নয়, ক্যালিপসো থ্রম্বোফব।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ ক্যালিপসো থ্রম্বোফব।'

জওয়ান ভদ্রলোক, তিনবার হ্যালো হ্যালো করে বলতে লাগলেন, 'নট, নাইন, এইট, সেভেন, সিক্স.....।'

দাদু আমার হাত ধরে বললেন, 'চলো, সন্ধ্যাহ্নিকের সময় হল। বাকি কাজটা অভয় একাই করে নিতে পারবে।'

যেতে যেতে শুনলুম বাতাসে উড়ে যাচ্ছে সতর্কবাণী, 'পোর্ট ক্যানিং, পোর্ট হার্বার, অ্যালার্ট অ্যালার্ট ক্যালিপসো থ্রম্বোফব।'

ট্যাক্সিতে বসে প্রশ্ন করলুম, 'ক্যালিপসো থ্রম্বোফব কে দাদু?'

উদাস গলায় দাদু বললেন, 'কে জানে! মাস্তানফাস্তান হবে।'

'আমি জানি, আমার মনে পড়েছে, ক্যালিপসো একটা রেকর্ডপ্লেয়ারের নাম, থ্রম্বোফব একটা মলম।'

হিহি। কী মজা!

pathagar.net

বাঘমারি

কথা হচ্ছে, যাকে বলে গাল-গল্প। চার বন্ধু বসেছে আড্ডায়। চিমার ফরেস্টের ডাকবাংলোয়। চারজনে এসেছে পুজোর ছুটি কাটাতে। প্রতি বছরই এই চারজন কোথাও না কোথাও যাবেই। নদীতে, পাহাড়ে, বনে, জঙ্গলে। সব ক'জনেরই পায়ে ডানা বাঁধা। ঘরে মন টেকে না। চারজনেরই বয়স চল্লিশের কোঠায়। চারজনই বড় চাকরি করে। শরীর-স্বাস্থ্য ভালই। একই স্কুলে চারজন একই ক্লাসে পড়ত। সবই ভাল। একটাই যা গোলমাল, চারজনই বড় বড় কথার মাস্টার। বোলচালের শেষ নেই। এ হাতি মারে তো, ও মারে বাঘ। এ আল্পস পাহাড়ে উঠেছে তো, ও চড়ে বসে আছে এভারেস্ট। এ কুমিরের লেজ ধরে টেনেছে, তো ও ধরেছে অজগর। রাজা-উজির মারায় চারজনই ওস্তাদ। কেউ কারো কাছে হারতে রাজি নয়।

চারজনের নাম হল, অমল, বিমল, কমল, পরিমল।

বেলা চারটে টারটে হবে। দুপুরের খাওয়াটা বেশ টাইট হয়েছে। ডাকবাংলোর চৌকিদার গজানন। তার বউয়ের নাম চম্পা। রান্নার হাত খাসা। এমন মাংস রাঁধে, যেন কথা বলছে। পরোটায় এমন প্যাঁচ মারে আঙুল ঠেকালেই মুচুর মুচুর শব্দ। বিরিয়ানিতে অ্যায়সা দম লাগায় ঢাকনা খোলা মাত্রই গন্ধে মানুষ আধপাগলা। লুচির সঙ্গে কাবাব অ্যায়সা লড়িয়ে দেয়, কেয়া বাত, কেয়া বাত! খাওয়ার পর একঘণ্টা আর বাঙলায় বাতচিত করা যায় না, স্রেফ উর্দু, মায়সাল্লা, হাল হকিকৎ, মরহুম, এই সব বুলি অটোমেটিক বেরোতে থাকে।

সকালে বিরাট একটা ওয়াক হয়ে গেছে। বিকেলে আর নো ওয়াকিং। স্রেফ আড্ডা। শীতটাও জমিয়ে পড়েছে। পাহাড় টাহাড়গুলো সব জবুথবু। অস্ত-সূর্য শীতে কাঁপতে কাঁপতে বনের ওপারে পাহাড়ের আড়ালে জঙ্গলের কম্বলে তাড়াতাড়ি শুতে যাচ্ছে। চম্পা এক রাউন্ড চা দিয়ে গেছে। সন্ধের পর কফি দেবে।

গজানন একটু আগে সবাধান করে দিয়ে গেছে, "ঝোরার পাশে নরম বালিতে বাঘের পায়ের ছাপ দেখা গেছে। বাবুরা হুঁশিয়ার। বেশি রাত পর্যন্ত বাইরে বসে বসে ওই যে কী যেন দেখেন আজ আর দেখবেন না। ওই যে নেচার না কী। বাঘ দেখে ফেললে বিপদ আছে। এটা না কি মানুষ খায়। আগে একটা এসেছিল, সেটা খুব ভালমানুষ ছিল, শুধু ফুলকপি খেত।"

pathagar.net

অমল বললে, "কী যা-তা বলছ! বাঘ কখনো ফুলকপি খেতে পারে! বাঘ মানুষ খায়।"

অমল বললেই তো বিমল বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে পারে না। বললে, "কে বলেছে বাঘ হিংস্র প্রাণী! প্রাণীজগতে মানুষই সব চেয়ে হিংস্র।"

কমল বললে, "হতে পারে, তার মানে এই নয় বাঘ গরুর মতো ঘাস খাবে।"

পরিমল বললে, "আমি নিজে বাঘকে আলোচালের হবিষ্য খেতে দেখেছি।"

অমল কুঁক, কুঁক করে এক রাউন্ড হেসে বললে, "তুমি বাঘ দেখেছ। শুধু দেখনি, সেই বাঘ তোমার সামনে আলোচালের ভাত খেয়েছে, ডালভাতে আর কাঁচকলা দিয়ে! গাঁজাখুরি গপ্প আমি সহ্য করতে পারি না।"

—"এই দেখ, সত্যি কথাটাকে তোমরা মিথ্যে ভাবছ। আমি যদি, যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝাতে পারি তাহলে মানবে তো!"

—"এর আবার যুক্তি-তর্ক কী! বাঘ মাংস খায়। শ্রীচৈতন্যের আমলেও খেত, আজও খায়।"

—"আমি যে-বাঘটার কথা বলছি, সেটা ছিল বিধবা বাঘিনী। কপুরথালার মহারাজার গুলিতে তার স্বামী মারা গিয়েছিল। আমি যে সময়ের কথা বলছি, সেই সময় এদের বিধবারা মাছ-মাংস খেত না। এর ওপর আর কোনো কথা চলে!"

গজানন বললে—"না, চলে না। বিধবা হলে মাছমাংস খাবে কী করে! আমার মা বিধবা, আমি জানি।"

—"তুমি সব জান! বাঘের আবার বিধবা সধবা কী! বাঘ কি টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে করে!"

অমল রেগে গেছে! গজানন চলে গেল। রাতের রান্নার জোগাড় দিতে হবে। বাবুরা ভাল-মন্দ খায় আর খুব খায়। গজানন চলে যাওয়ার পর, অমল বললে, "বাঘ তোমরা সেভাবে কেউ দেখনি, আমি যেভাবে দেখেছি। আমি নেলকাটার দিয়ে বাঘের নখ কেটেছি।"

পরিমল বললে, "কেন, তোমার কি সেলুন ছিল!"

—"ঝট করে, একটা কমেন্ট করলে! আসল কথাটা শুনলে না! আমার দাদু ছিলেন মস্ত ডাক্তার। দিশেরগড় রাজ স্টেটের চিফ মেডিকেল অফিসার হয়ে গেলেন। আমরাও গেলুম। মহারাজা খুশি হয়ে দাদুকে একটা বাঘের বাচ্চা উপহার দিলেন। বেশ হৃষ্টপুষ্ট একটা বেড়াল বাচ্চার মতো। হবে না কেন! বেড়াল তো বাঘের মাসি। কী তার ওজন! হাসি হাসি মুখ।"

—"গায়ে বোঁটকা গন্ধ ছিল না?"

pathagar.net

— "বোঁটকা গন্ধ গাকবে কেন ! মহারাজার বাঘ। রোজ চান করে আতর মাখে।"

—"বাঘটা যখন বড় হল, তখন কি একে একে সব খেয়ে ফেললে। তোমার দাদুকে, দিদাকে, তোমাকে !"

—"আজ্ঞে না ! একটা কথা জেনে রাখ, বাঘের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার না করলে বাঘও তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না। বাঘ মানুষ নয়।"

—"তা বাঘটা বড় হল, না বনসাই গাছের মতো চিরকাল ছোটই রয়ে গেল !"

—"রীতিমতো বড় হল। আমরা ভাইয়েরা সেই বাঘের পিঠে চেপে বাগানে ঘুরতুম।"

—"তারপরে চেপেই রইলে, চেপেই রইলে, কারণ শুনেছি, বাঘের পিঠে চাপলে আর নামা যায় না।"

—"ওটা একটা ইংরেজি প্রবাদ, রাইডিং এ টাইগার। ওটার সঙ্গে এটার কোনো সম্পর্ক নেই। বাঘটা ছিল ইংরেজদের মতোই, ম্যানারস আর এটিকেট জানা ভদ্রলোক। রাতে বিছানায় আমাদের পায়ের কাছে ঘুমোতো। সকালে উঠে টুথব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজত।"

—"খবরের কাগজ পড়ত ?"

—"ইয়ারকি কোরো না, এইরকম সিভিলাইজড বাঘ আমি আর দুটো দেখিনি।"

—"কী করে দেখবে, ওটা তো বাঘ ছিল না, ব্যাঘ্রচর্মাবৃত মানুষ ছিল।" বিমল বললে, "শেষ পর্যন্ত বাঘটার কী হল ! মানুষ হয়ে গেল ?"

—"দাদু দিশেরগড় থেকে চলে আসার সময় বাঘটাকে অনেক দামে একটা সার্কাস কম্পানির কাছে বিক্রি করে দিয়ে সেই টাকায় একটা জাগুয়ার গাড়ি কিনেছিলেন।"

বিমল বললে, "আমার সঙ্গে একবার একটা বাঘের মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়েছিল।" পরিমল বললে, "তাহলে, আসল বিমলটা গেল কোথায় ?"

—"ঠিক বুঝলুম না !"

—"যে-বিমলের সঙ্গে বাঘের দেখা হয়েছিল, সে তো বাঘের পেটে গেছে।"

—"বাঘটা খুব অন্যমনস্ক ছিল, আমাকে গ্রাহ্যই করেনি, আমিও বাঘ বলে চিনতে পারিনি। আর চিনতে পারিনি বলেই বাঘটা আমার সঙ্গে বাঘের মতো ব্যবহার করেনি।"

—"কোথায় দেখা হল ! ময়দানে ?"

—"ঘটনাটা ঘটেছিল মান্দার হিলে। বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছি। হাঁটছি, হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে ফল্গু নদীর ওপর লম্বা একটা ব্রিজে এসে গেছি। দেখি

pathagar.net

কী ! উল্টো দিক থেকে আসছে। বেশ হেলতে দুলতে। সূর্য ডুবছে। নদীর বালি চিকচিক করছে। গাছপালার মাথায় শেষবেলার রোদ। আমি ভেবেছি, একটা কুকুর। জল-বায়ু ভাল। মানুষ চেঞ্জে আসে। হতেই পারে। স্বাস্থ্যবান কুকুর ! ব্রিজের শেষ মাথায় তিন-চারজন লোক, হাতে লাঠি। আসছে। আমাকে জিজ্ঞেস করছে, দেখা, ইধার কোই শের গিয়া ! এক শের নিকালা ! সঙ্গে সঙ্গে ধরেছি, ওটা স্বাস্থ্যবান কুকুর নয়, বড় একটা বাঘ। মার দৌড়। দৌড়তে দৌড়তে সোজা গয়ায়। একটা দোকানে ঢুকেই এক সের প্যাঁড়া খেয়ে ফেললুম।"

—"কতটা বেশি হল জানি না। তবে অনেকটাই কাটতে হবে। মান্দার হিল থেকে দৌড়ে গয়া যাওয়া যায় না, দু নম্বর, এক সের প্যাঁড়া খেলে মানুষ মারা যায়।"

—"মান্দার হিলে এক সের কেন তিন সের হজম হয়ে যাবে। জলের গুণ। পাথর খেলে পাথর হজম। একজন ফলঅলা বাইচানস একটা বাটখারা খেয়ে ফেলেছিল। তিন চার গেলাস জল খেতেই বিলকুল হজম।"

—"ফল থাকতে বাটখারা খেল কেন ?"

—"কম ওজনের বাটখারা ছিল, ওয়েটস অ্যান্ড মেজারসের লোক ধরতে এসেছিল, বাটখারাটা স্রেফ গিলে ফেললে। ইনস্পেকটার বোকা বনে চলে গেল।"

পরিমল বললে, "তোমরা বাঘ শিকার করেছ কোনো দিন ? আমি করেছি কুমায়ুন ফরেস্টে ইন দি ইয়ার নাইনটিন সেভনটি টু। সে একটা থ্রিলিং ব্যাপার। আমি এখানে, বাঘটা দশহাত দূরে। দুজনে মুখোমুখি। চোখে চোখে তাকিয়ে আছি। বাঘটা আমাকে দেখে জিভ বের করে ঠোঁট চাটছে। ভাবছে, কোন দিক থেকে খাবে !"

—"বাঘ সজনে ডাঁটা খায় ?"

—"মানে ?"

—"মানে, তোমার যা চেহারা ! অনেকটা ডাঁটার মতো।"

—"বাঘ সম্বন্ধে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই। বাঘ হাড় হাড় চেহারার মানুষ খুব পছন্দ করে। ওই যাকে বলে হাড়ে-মাসে। বাঘটাকে আমার মারার কোনো ইচ্ছেই ছিল না। ওর ফচকেমি দেখে রাগ ধরে গেল। একটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব। বললুম, ইয়ারকি হচ্ছে ! একটা মাত্র গুলি, কপালের মাঝখানে। মেরেই বললুম, সরি। বাঘটা, থ্যাঙ্ক ইউ, বলে শুয়ে পড়ল।"

—"তাহলে সেই বাঘের ছালটা কী হল ?"

অমল বললে—"কেন ! ওটা শ্রীমহাদেবকে দুর্গাপুজোর সময় দিয়ে দিয়েছে ! বাবা তো কৈলাসে ইদানীং ওইটা পরেই ঘুরছেন।"

পরিমল রেগে গিয়ে বললে, "তোমাদের চরিত্রের একটাই দোষ, কোনো

pathagar.net

কিছু বিশ্বাস করতে চাও না। বাঘ মারাটা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। যে কলকাতার রাস্তায় গাড়ি চালাতে পারে সে বাঘও মারতে পারে। দুটোর জন্যেই প্রয়োজন সাহস আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।"

—"শেষের শব্দ কী বললে! ওটা শুনলেই বাঘ সেনসলেস হয়ে যাবে। মুখে বাঘ সব বাঙালিই মারতে পারে। সত্যি বাঘ এলে কী হবে, বলা শক্ত।"

—"দুঃখ একটাই, সত্যি বাঘের দর্শন মেলে না।"

বাইরে থকথকে অন্ধকার। গাছের পাতায় বাতাসের ঝুপুর ঝাপুর শব্দ। হঠাৎ দূরে খুব একটা হইহই শোনা গেল। সঙ্গে টিন, ক্যানেস্তারা পেটানোর শব্দ। অমল বললে, "আজ মনে হয় ট্রাইব্যালদের কোনো উৎসব আছে।"

পরিমল বললে, "আমার সন্দেহ অন্য, এ তোমার গিয়ে বাঘ তাড়ানোর শব্দ।"

বিমল বললে, "হাতিও হতে পারে। বুনো হাতিরা বহুত অত্যাচারী।"

কথাটা শেষ হয়েছে কী হয়নি, চারজনের মাথার ওপর দিয়ে বিশাল একটা কী জাম্প করে খোলা দরজা দিয়ে সোজা ঘরে। সেখানে যা কিছু ছিল সব দুদ্দাড় করে পড়ে গেল। বিশ্রী একটা বোঁটকা গন্ধ।

চারজনেই একটা কিছু বলার চেষ্টা করছে, ভয়ে বাক্য সরছে না, বা বা বা। সত্যিই বাঘ। বাঘটা নিজেকে একটু সামলে সুমলে বেশ রাজকীয় ভঙ্গিতে দরজার সামনে এসে বসল। হাঁড়ির মতো গম্ভীর মুখ। চোখ দুটো জ্বলছে। লেজটা পেছন দিকে অনেক দূর চলে গেছে। প্রায় খাট পর্যন্ত। বাঘটা যেন পর্যবেক্ষণ করছে। চারটের মধ্যে কোনটাকে খাওয়া যায়! অমলই সবচেয়ে লোভনীয়। বেশ মোটাসোটা। রেওয়াজি শরীর। চারজনেই স্থাণু হয়ে গেছে। শরীর পাথরের মতো ভারী। চোখ বুজিয়ে চারজনেই সরু-মোটা সুরে মন্ত্রোচ্চারণের মতো বলে চলেছে—বাবা বাবা।

লাঠি, সড়কি, বল্লম নিয়ে দলটা বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। দৃশ্য দেখে থমকে গেছে। বাঘটা যেন টেররিস্ট। বাবু চারজন তার হোস্টেজ। ভাবটা এই, হয় আমাকে যেতে দাও, নয় তো এই চারটেকে চিবোই। দুপক্ষই থমকে আছে। কী হয়, কী হয়! বাঘটা একটু এগিয়ে এসে অমলের চেয়ার ঘেঁষে কুকুরের মতো বসল।

সাহস বটে চম্পার। রান্নাঘরে তিন কেজি মাংস মশলা মাখিয়ে রেখেছিল। চাঁপ তৈরি করবে বলে। সেই থালাটা নিয়ে, একেবারে বাঘের সামনে। বাঘটা যেন তার বনবাসী ছেলে।

—"খোকা! তুই এসেছিস বাবা?"

বাঘটা যেন হাসল। খুশিতে লেজ নাড়াতেই ঘরের ভেতরের সেন্টার টেবিলটা দেশলাইয়ের খোলের মতো ছিটকে এধার থেকে ওধারে চলে গেল।

pathagar.net

চম্পা বলছে, "ওরে আমার সোনা ! কত দিন ভাল-মন্দ খাওয়া হয়নি। গরু, ছাগল, মোষ খেয়ে খেয়ে অরুচি হয়ে গেছে। এই নাও, কাবাব খাও !"

বাঘের সামনে থালাটা রাখতেই সব চেটেপুটে সাফ। ঝাল লেগেছে। বদহজম হবে। জল খাও। বাবুদের জন্যে ফোটানো জল আছে ক্লোরিন দেওয়া, সেই জল খাও।"

গজানন এক গামলা জল নিয়ে এল। বাঘ চক চক করে পুরো জলটা খেয়ে বিশাল একটা হাই তুলল। চম্পা বললে, "বুঝেছি বুঝেছি, সোনার আমার ঘুম পেয়েছে। আজ আর বনে-জঙ্গলে শুয়ে কাজ নেই, যাও বাবুদের খাটে গিয়ে শুয়ে পড়।"

বাঘটা কী বুঝল কে জানে, সত্যি সত্যিই একটা খাটে উঠে শুয়ে পড়ল। চম্পা বাইরে থেকে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল। তাকিয়ে দেখল, বাবু চারজন প্রায় অজ্ঞান।

—"এই বাবু।"

ঘড়িতে দম দিলে টিক টিক শব্দ। বাবু চারজন সেইরকম আবার শুরু করল, বাবা, বাবা !

—"ঘ লাগাও, ঘ। বাবা নয়, বাঘ, বাঘ।"

অমল উঠে দাঁড়াল। ট্রাউজারটা ঢিলে হয়ে কোমরের নিচে ঝুলে গেল।

—"এ কী, আমার ভুঁড়ি ! আমার ভুঁড়ি কোথায় গেল !"

—"চুপসে গেছে বাবু !"

—"এতকাল যোগাসনে যা হয়নি !"

বিমল বললে, "রাত্তে আমরা কোথায় থাকব ?"

—"ভি আই পি এলে সাধারণ মানুষকে বাংলো ছেড়ে দিতে হয়। আজ আপনারা জঙ্গলে থাকবেন।" গজানন বললে—"ওই যে কি দেখেন আপনারা সেইসব দেখবেন, নেচার।"

pathagar.net

F-1 SEP 2005

ভূত অদ্ভুত

আমার ঠাকুরদা যখন বাড়িটা কিনছিলেন, তখন তাঁর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সকলেই বলেছিলেন, কাজটা ভাল হচ্ছে না। বাড়িটা ঐতিহাসিক, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ওলন্দাজ গভর্নরের কুঠিবাড়ি। কিন্তু, যেখানেই ইতিহাস, সেইখানেই তো ভূত। ইতিহাসের আর এক নাম ভূত বললেই বা ক্ষতি কী! বাড়িটায় যেমন অনেক রহস্য আছে, সেইরকম অনেক ভূতও আছে। তা না হলে এতদিন খালি পড়ে থাকে!

ঠাকুরদা বলেছিলেন, 'মশা তাড়াবার যেমন ধূপ আছে, আমার কাছে সেইরকম ভূত তাড়াবার ধুনো আছে। ভূতকে আমি তেমন ভয় পাই না, ভয় পাই মানুষকে।'

আমার ঠাকুরদা ছিলেন নামকরা শিক্ষক। আমাদের পরিবারের লোকসংখ্যাও কিছু কম ছিল না। সকলেই বিজ্ঞানচর্চা করতেন। ভূত, প্রেত, ভগবান, কোনওটাই মানতেন না। বাড়িটা কেনা হল প্রায় জলের দামে। বিশাল এক দোতলা বাড়ি। দু'মহলা। সামনের দিকটা পুব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত। পেছনের মহল দক্ষিণ থেকে উত্তরে। 'এল' শেপ। পেছনে একটা বারান্দা। পুবে শুরু হয়ে দক্ষিণ বরাবর পশ্চিম হয়ে উত্তরে ঘুরে গেছে। এই উত্তরটাই ছিল ভয়ঙ্কর। নিরালা, নির্জন। গাছপালা-ঘেরা। মনে হত ভূতের আড়ত।

নানা জনের কথায় ওই বাড়িতে ভূতের যে তালিকা পাওয়া গিয়েছিল, তা ছিল এইরকম—

এক, গভীর রাতে বাড়ির ন্যাড়া ছাদ থেকে কেউ একজন বিশাল একটা ঘুড়ি বাড়ত। কালো রঙের ঢাউস ঘুড়ি। অন্ধকার আকাশ। জ্বলজ্বলে তারা। কালো একটা ঘুড়ি প্রেতাত্মার মতো লাট খাচ্ছে, টাল খাচ্ছে। গোত্তা খেয়ে নীচে নামছে, পড়পড় শব্দে উঠে যাচ্ছে আকাশের টঙে। যাদের ঘুম ভেঙে যেত, তারা শব্দটা শুনতে পেত। সাহসী যারা, তারা বারান্দায় বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে তাকালে ঘন কালো ছায়ার মতো একটা কিছু দেখতে পেত।

দুই, কুয়োর সঙ্গে একটা হ্যান্ড-পাম্প লাগানো ছিল। গভীর রাতে কেউ সেটাকে পাম্প করত। হ্যাচাং-হ্যাচাং শব্দ শুনতে পেত প্রতিবেশীরা। তালাবন্ধ খালি বাড়ি অথচ জল পাম্প করার শব্দ। সাহসীরা তিনতলার ছাত থেকে এই বাড়ির পাতকো-তলায় টর্চলাইট ফেলত। লোক নেই, জন নেই। পাম্পের হাতল ওঠানামা করছে।

pathagar.net

তিন, মাঝরাতের ন্যাড়া ছাতে জলের মূর্তি। একটা মূর্তি চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু জল টলটলে। যেমন এক বালতি জল। বালতিটা নেই, জলটা বালতির আকার ধরে আছে। সেইরকম মানুষের আকারে জল। ছাতে টলে-টলে বেড়াচ্ছে। মাঝে-মাঝে আকাশে হাত তুলছে।

চার, সার্চলাইট। হঠাৎ একটা তীব্র আলার রেখা অন্ধকার চিরে আকাশের দিকে ছুটে যেত। গোল হয়ে ঘুরত। সেই আলোর উৎস এই বাড়ির ছাত।

পাঁচ, একবার এক যাত্রার দল এই পাড়ায় তিনদিন ধরে যাত্রা করতে এসেছিল। সেই দলকে এই বাড়িতে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। প্রথম রাতের অভিনয়ের পর দলের নায়িকা সকাল দশটার সময় ছাদ থেকে ভেতরের উঠোনে পড়ে গিয়ে, হাত-পা ভেঙে হাসপাতালে পড়ে ছিলেন এক মাস। তিনি বলেছিলেন, অদৃশ্য কেউ ছাত থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল।

ছয়, একবার এক ভবঘুরে মানুষ এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ভীষণ সাহসী। সারা পৃথিবী ঘুরেছিলেন তিনি। যাওয়ার আগে পাড়ার লোককে বলেছিলেন, এই বাড়িটায় অদ্ভুত একটা কিছু আছে। প্রবল বাতাস যখন কোনও ফাঁক-ফোকর দিয়ে বইতে থাকে তখন শিস দেওয়ার মতো একটা শব্দ হয়। সারা রাত এই বাড়িতে সেইরকম শব্দ হয়। বাইরে বাতাস নেই, ভেতরে বাতাস কেঁদে-কেঁদে ফেরে।

সাত, বাগানের মাটি খুঁড়ে একটা কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল। কোনও মহিলার। হাতে বালা ছিল।

আট, রান্নাঘরের বাইরের দেওয়াল বেয়ে একটা পোড়ামাটির নল সোজা উঠে গেছে তিনতলার ছাতে। খালি বাড়ি। তালাবন্ধ। কেউ কোথাও নেই। প্রতিবেশীরা দেখছে, গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

আমার ঠাকুরদা এর সব ক'টাই লিখে রেখেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন 'ভূতের লিস্ট'। বাড়ির দখল নিয়ে বললেন, "দেখা যাক, কোন ভূত কখন দর্শন দেয়। ভূতের দর্শন পেলে ভগবানেরও দর্শন পাব।" আমরা তখন খুবই ছোট।

আমি আর আমার দিদি সন্ধে হলেই দুজনে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতুম। এ-মহল থেকে ও-মহলে যেতে ভয়ে বুক কাঁপত। বারান্দার ঘুরপাক। বাঁ দিক দিয়ে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে। আর-একটা সিঁড়ি উঠে গেছে ছাতে। ডান দিকে বাগান থেকে উঠে এসেছে ঝোপঝাপ, গাছপালা। রেলিংয়ে ঝুঁকে নীচের দিকে তাকালে পাতকো-তলা। হ্যান্ড-পাম্পের হাতলটা অন্ধকারে নিরেট এক অন্ধকার। ঝিঁঝির ডাক। পাতার ফাঁকে ফাঁকে চিকচিকে জোনাকি। কে আবার শিখিয়ে দিয়েছিল, জোনাকিরা সব প্রেতাত্মা। তাই সন্ধেবেলা দিদি আর আমি যেন অবিচ্ছেদ্য দুই প্রাণী। দিনের বেলা যত ঝগড়া, রাত্তির হলেই গায়ে

Pathagar.net

গা লাগানো গলায়-গলায় ভাব। মা কি জ্যাঠাইমা হয়তো উত্তর মহলের রান্নাঘর থেকে ডাকলেন "উমা শুনে যা।" আমরা অমনই দু'জনে জড়াজড়ি করে হাজির হলুম।

মা আমাকে বললেন, "তোকে কে ডেকেছে! পড়া ছেড়ে উঠে এলি কেন?"

জ্যাঠাইমা মাকে বললে, "বুঝলি না, সব ভূতের ভয়ে জুজু হয়ে আছে।"

আমি আর দিদি দু'জনে যে-ঘরে বসে পড়তুম, সেই ঘরের দুটো জানলা। হা-হা করছে। জানলা মানেই ভূত। লম্বা-লম্বা হাত বাড়ালেই হল। জানলার দিকে পেছন ফিরে বসা চলবে না। ভূত পিঠে সুড়সুড়ি দিতে পারে। দু'জনে মাথা খাটিয়ে বের করলুম, দু'জনে পিঠে পিঠ দিয়ে বসব। একজনের মুখ এ-জানলার দিকে আর-একজনের মুখ ও-জানলার দিকে। ভূত যদি হাত বাড়ায়, দেখতে পাব আর চিৎকার করে উঠব। একটু করে পড়ি আর ভয়ে-ভয়ে তাকাই। তাকাই আর পড়ি, পড়ি আর তাকাই।

আমি যে-জানালাটার দিকে তাকাতুম, তার ওপাশেই ছিল বাইরে যাওয়ার সিঁড়ি, বাড়িটার দুটো সিঁড়ি ছিল। একটা খিড়কির, আর-একটা সদরের। ওটা ছিল সদরের সিঁড়ি। একদিন আমরা দু'জনে পড়তে বসেছি। পড়া বেশ কিছুটা এগিয়েছে, এমন সময় জানলায় একটা মুখ। সাদা লম্বা দাড়ি, চুল। ধকধকে দুটো চোখ। সঙ্গে-সঙ্গে আমার চিৎকার, "দিদি রে! ভূত।" বলা মাত্রই দিদির এক লাফ। দু'জনে বইপত্তর উলটে, জড়াজড়ি করে দৌড় মারলুম উত্তর মহলের রান্নাঘরের দিকে। জ্যাঠাইমা ময়দা মাখছিলেন। সোজা তাঁর ঘাড়ে। তিনজনেই চিতপাত। জলের ঘটি উলটে গেল। উলটে গেল দুধের ডেকচি। মা আলুর দমের আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিলেন। তিনি ভাবলেন, ভূমিকম্প হচ্ছে। মা ভয় পেলে ইংরেজি বলেন। চিৎকার করতে লাগলেন, "আর্থকোয়েক, আর্থকোয়েক। শাঁখ বাজাও, শাঁখ বাজাও।" জল, ময়দা, ডাল, দুধ সব মেখে আমরা উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, আমরা ভূত দেখেছি।"

"সন্ধে সাতটার সময় ভূত!"

না, ভূত নয়। এক ভদ্রলোক। আশুবাবু, আমার ঠাকুরদার বন্ধু। কবি। ভদ্রলোকের পেছন-পেছন ঠাকুরদাও উঠছিলেন সিঁড়ি দিয়ে। তিনি হুটোপাটির শব্দ শুনেছিলেন। রান্নাঘরে এসে বললেন, "ছি ছি! কী লজ্জার কথা। আশুবাবু বলছেন, আমার চেহারাটা কি এতই ভয়ঙ্কর যে, ছেলেমেয়ে দুটো ওইভাবে ছুটে পালাল। এ দাড়ি তো আমার অনেক দিনের। কবিতায় তেমন ফোর্স আসছিল না বলেই দাড়ি রাখতে বাধ্য হয়েছি, কবিগুরুর অনুপ্রেরণায়।"

মা বললেন, "বাবা, এ দুটো হল রামভিতু। দিনরাত, চলতে-ফিরতে ভূত দেখছে।"

পরে দিদিতে-আমাতে একটা গবেষণা হল। যতই হোক আমরা তো

pathagar.net

অপমানিত হয়েছি। ভয়ঙ্কর অপমান। ঠাকুরদার কবি-বন্ধুকে ভূত ভেবেছি।

দিদি বললে, "বিলু, ভূত সম্পর্কে তোর কোনও আইডিয়া আছে ? কেমন দেখতে না দেখতে ?"

আমরা দু'জনেই তো দেখিনি কখনও। কেবল শুনেছি। ভূত দেখা যায় না। ভূত কেবল কর্ম। কর্ম বললে ভুল হবে। ভূত হল অপকর্ম। নানারকম অদ্ভুত-অদ্ভুত কাজ করে। দিদি বললে, "একটা লিস্ট কর, এক নম্বর, ভূত অদ্ভুত-অদ্ভুত শব্দ করে। দুই, ঘাড়ের কাছে ঠাণ্ডা নিশ্বাস ফেলে। তিন, যে-কোনও জিনিসকে শূন্যে উঠিয়ে দেয়। চার, শুয়ে থাকলে ঠ্যাং ধরে ঘুরিয়ে দেয়। পাঁচ, বন্ধ জনলা-দরজা খুলে দেয়। ছয়, হা-হা করে হাসে। সাত, পিঠে সুড়সুড়ি দেয়। আট, ঝড় হয়ে বয়ে যায়। নয়, মেজাজ ভাল থাকলে জিনিসপত্তর হাতের কাছে এগিয়ে দেয়। দশ, জিনিসপত্তর অদৃশ্য করে দেয় আবার জিনিস রেখেও যায়। এগারো, ঘুমন্ত মানুষের বুকের ওপর চেপে বসে। বারো, কখনও অস্পষ্ট সাদা মূর্তির মতো কাউকে-কাউকে দর্শন দেয়। নাকিসুরে কথা বলে।"

লিস্ট শেষ হওয়ার পর দিদি বললে, "শোন বিলু, এর পর থেকে কোনও লোক দেখলে ভূত-ভূত করে চেঁচাবি না গাধার মতো। আমাদের একটা প্রেস্টিজ আছে। ছোট হলেও খুব ছোট নই। ভূতের কোনও চেহারা থাকে না। ভূত হল বাতাস, ভূত হল ধোঁয়া, ভূত হল শব্দ।"

বেশ চলছিল হেসে-খেলে আমাদের সংসার। মা আর জ্যাঠাইমা যেন দুই বোন। ঠাকুরদা যেন মহাদেব। বাবা আর জ্যাঠামশাই যেন হলায়-গলায় দুই বন্ধু। আর আমরা, ভাই-বোন, কেউ কাউকে ছেড়ে এক মুহূর্ত থাকতে পারি না। দু'জনে সকালে স্কুলে যাওয়ার সময় রোজ কী মন খারাপ ! অনেকক্ষণ দেখা হবে না দু'জনের। স্কুল থেকে ফেরার সময় দিদির স্কুলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতুম। দু'জনে একসঙ্গে গল্প করতে করতে ফিরতুম। দিদি ভীষণ বেড়াল ভালবাসত। পথে কোনও বেড়াল দেখলেই থমকে দাঁড়াত। বলত, বিলু, দ্যাখ, কী সুন্দর মা-লক্ষ্মীর মতো বেড়াল। চুক-চুক করে ডাকত। বেড়াল অমনই লেজ তুলে নির্ভয়ে দিদির কাছে এসে পায়ে গা ঘষত। আমার একটু দুষ্টুমি করার ইচ্ছে হত। লাফিয়ে গাছের ডাল ধরে টানছি। বুটজুতো দিয়ে পাথরের টুকরোয় শট মারছি। আর দিদি আমাকে সাবধান করছে। যখন শুনছি না, কান ধরে বলছে, বানর ছেলে। আমি হি হি করে হাসছি। দিদি ভয় দেখাচ্ছে, "বাড়ি চলো না, তোমার হবে।" বাড়ির কাছাকাছি এসে আমাদের দু'জনের দৌড় শুরু হল। রেস। দিদিকে খুব ফরসা আর সুন্দর দেখতে ছিল। যখন ছুটত, ফিতে-বাঁধা বিনুনি পিঠে দুলত। সপাত-সপাত শব্দ করত। ফরসা

pathagar.net

গাল দুটো গোলাপের মতো লাল হয়ে যেত। আর আমি তখন দিদিকে আরও ভালবেসে ফেলতুম।

এই সময় মা একদিন ভীষণ ভয় পেলেন। রাত এগারোটা নাগাদ কাজকর্ম শেষ করে রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে দক্ষিণের মহলে আসছেন, ডান দিকে ছাতে ওঠার সিঁড়ি। জায়গাটা অন্ধকার-অন্ধকার। হঠাৎ দেখলেন, লালপাড় শাড়ি পরে কে একজন ছাতে উঠে যাচ্ছে। মা ভেবেছিলেন, জ্যাঠাইমা। জিজ্ঞেস করলেন, "এত রাতে ছাতে যাচ্ছ কেন।" কিন্তু ঘরে এসে জ্যাঠাইমাকে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। মায়ের কথা কেউ বিশ্বাস করতেই চাইলেন না। শেষে বাবা আর জ্যাঠামশাই টর্চ নিয়ে ছাতে গেলেন। কিছুই দেখতে পেলেন না।

ঠাকুরদা বললেন, "কিছুই না, চোখের ভুল, অমন হয়। ভূত তো বাইরে নেই, আছে মানুষের মনে।"

সবাই সায় দিলেন, "ঠিকই তো, ঠিকই তো।"

মা কিন্তু পর-পর তিনদিন একই সময় সেই মূর্তিকে ছাতে উঠে যেতে দেখলেন। জ্যাঠাইমা ছাড়া কেউই তেমন পাত্তা দিলেন না, মায়ের এই দেখাটাকে। ঠিক সাতদিনের মাথায় ছাতে কাপড় শুকোতে দিতে গিয়ে মায়ের পায়ের তলায় একটা মাছের কাঁটা ফুটে গেল। হয় কাকে এনেছিল, না হয় বেড়ালে। কাঁটাটা টেনে খুলে ফেলে দিয়েছিলেন। নীচে নেমে এসে জ্যাঠাইমাকে একবার বলেছিলেন। জ্যাঠাইমা আয়োডিন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। জিনিসটাকে কেউই তেমন ভয়ের চোখে দেখেননি, কিন্তু সেইদিনই সন্ধেবেলা মায়ের কেঁপে জ্বর এল। ডাক্তার এলেন। পরীক্ষা করে বললেন, "আর কিছু করার নেই, ধনুষ্টঙ্কার হয়ে গেছে।" চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মা চলে গেলেন।

দিদি আর আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকি আকাশের দিকে। মনে-মনে ভাবি, মা হয়তো কোথাও বেড়াতে গেছেন। হঠাৎ ফিরে আসবেন। একদিন। দু'হাতে জড়িয়ে ধরবেন আমাদের দু'জনকে। আমি দিদির দিকে তাকাই। দিদি আমার দিকে। দু'জনেই কেঁদে ফেলি।

দিদি বলে, "মায়ের মতো মা কি আর পাওয়া যাবে রে বিলু! আর বেঁচে থেকে কী হবে। জ্যাঠাইমাও আমাদের মা। তা হলেও, মা একটা আলাদা জিনিস।"

পাড়া-প্রতিবেশীরা বলতে লাগল, তখনই বলেছিলুম, বাড়িটা হানাবাড়ি। শুনলে না তোমরা! এখনও সময় আছে। সংসারটা চুরমার হয়ে যাওয়ার আগে পালাও। কেউই সে-কথা শুনলেন না। বাবা বললেন, "এদের মা যেখানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন, আমার কাছে সেই জায়গাটা তীর্থ।"

জ্যাঠামশাই বললেন, "ঠিকই তো, ঠিকই তো!"

ছটা মাস কোথা দিয়ে কেটে গেল। শীতের মুখে দিদি একদিন সেই মূর্তি

pathagar.net

দেখতে পেল সিঁড়িতে। লালপাড় শাড়ি পরে ছাতের সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে উঠে যাচ্ছে ওপরে। দিদি ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল, "বিলু এইবার আমার মরার পালা।"

সকলে দিদিকে জেরা শুরু করলেন, "তুই কী দেখেছিস, ঠিক করে বল।" দিদি বললে, "বলে আর কী হবে! আমি যা দেখার দেখেছি। এইবার আমাকে নিয়ে যাবে। আমাকেও চলে যেতে হবে মায়ের কাছে।"

আমি আর দিদি এক বিছানায় পাশাপাশি শুতুম। চাঁদের আলো এসে পড়েছে দিদির মুখে। দিদি অনেকক্ষণ জেগে শুয়ে ছিল কপালে হাত রেখে। হঠাৎ আমার দিকে পাশ ফিরে বললে, "শোন, বিলু আমি তো চলে যাচ্ছি, আমার যা আছে সব একটা বাক্সে ভরে তোর কাছে রেখে দিবি। কাউকে দিবি না। বাক্সটার ওপর বড়-বড় করে লিখে রাখবি, 'আমার দিদি'। যখন তুই অনেক, অনেক বড় হয়ে যাবি, তখনও বাক্সটা তোর কাছে রেখে দিবি। মাঝে-মাঝে খুলে দেখবি। যখনই খুলবি আমার গলা শুনতে পাবি, বিলু।"

সে-রাতে দু'জনেই জেগে রইলুম। কারও চোখে ঘুম নেই। সকালে সারা বাড়িতে ভীষণ উত্তেজনা। আমাদের ছাতে আমাদেরই সাদা ধবধবে বেড়ালটা মরে পড়ে আছে। সুস্থ-সুন্দর বেড়াল। আগের রাতে জ্যাঠাইমার হাতে মাছ-ভাত খেয়ে গেছে। এমন তো হওয়ার কথা নয়। ফুলের মতো সাদা একটা বেড়াল দলা পাকিয়ে পড়ে আছে ছাতের এক কোণে। কাল রাতে কাগজের একটা দলা নিয়ে কত খেলেছে! দিদির কোলে শুয়ে ঘড়ঘড় করেছে। জ্যাঠাইমা যখন রান্নাঘরে রাঁধছিলেন, পিঠে গা ঘষেছে।

দিদি ঘরে গিয়ে চুপ করে বসল। আমাকে বলল, "বড় ভয় করছে রে বিলু! আমার মৃত্যুটা কীভাবে হবে! ছাতে, না ঘরে!"

আমার ঠাকুরদা সেদিন আর স্কুলে গেলেন না। কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় বাবা আর জ্যাঠামশাইকে বলে গেলেন, "তোমরা উমাকে ঘিরে বসে থাকো, যেন নিয়ে না যেতে পারে!" কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন, কিছুই বললেন না।

অনেকক্ষণ পরে ফিরে এলেন একটা লরি চেপে, সঙ্গে তিনজন লোক। সেইদিনই আমরা বাড়িটা ছেড়ে দিলুম। সব জিনিসপত্তর নিয়ে আমরা আর-একটা বাড়িতে এসে উঠলুম। ভূত আছে কি না জানি না, কিন্তু ভূত যেন একালের টেররিস্ট। দিদির বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে সেদিন বলেছিল, "বাড়িটা ছাড়, নয়তো একেও মারব!"

শুধু একটাই দুঃখ, বাড়িটায় না এলে, মা হয়তো আজও বেঁচে থাকতেন!

pathagar.net

কুশলের সাইকেল

অমরবাবু মানে অমর বসু আমাদের ব্যাকরণ পড়াতেন। ব্যাকরণ যতটা নীরস, অমর-সার তার চেয়েও নীরস ছিলেন। চেহারাটা ছিলো কোষো পেয়ারার মতো। আমরা নাম রেখেছিলুম সব্যসাচী-সার। ডান হাত, বাঁ হাত, দুটোই সমান চলত। বেত আর ডাস্টার দুটোই চালাতেন অক্লেশে। আর একটা কি ? বাদ দিতেন না কাউকে। ফার্স্ট থেকে লাস্ট বেঞ্চ, সবাই গোল আলু, ঠিকরে আলু। আঁচড়, শুধু কামড়টাই বাদ যেত। আমরা বলাবলি করতুম, আর একটু বয়স বাড়লে ক্লাসে আমাদের কামড়েও দিতে পারেন। তবে একটাই কথা—সব্যসাচী-সারের বয়স বাড়লে আমাদেরও বয়স বাড়বে। বছরের পর বছর ফেল না করলে আমরা পাসটাস করে বেরিয়ে যাব। তখন যাকে কামড়াবেন, তাকে কামড়াবেন, আমাদের দেখার দরকার নেই।

অমর-সারের ছেলের নাম কুশল। কুশল আমাদের সঙ্গেই পড়ে। ফার্স্ট বেঞ্চে বসে। ভাল ছেলে। ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়। অঙ্কে আর ইংরিজিতে ভীষণ ভাল। কুশলের তেমন অহঙ্কার নেই। আমাদের সঙ্গে মেশে। মুখ গোমড়া করে বসে থাকে না। কুশলের চোখ খুব খারাপ। পুরু লেন্সের চশমা চোখে। কাচের আড়ালে বড়-বড় চোখ দুটো ঝকঝক করে। কুশল একটু তড়বড়, তড়বড় করে কথা বলে। কথা বলার সময় হাত নাড়ে খুব। ছেলেটা খুব সরল। আমার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব। স্কুল ছুটির পর ক্লাসরুমে বসে দু'জনে অনেকক্ষণ গল্প করি। তার কাছে আমি আবার অঙ্ক বুঝে নিই। যে-অঙ্ক আমি জীবনে কষতে পারব না, কুশল তা নিমেষে করে ফেলে।

যে-কুশল কখনও স্কুল কামাই করে না, সে পর-পর তিনদিন ক্লাসে আসছে না। ব্যাপারটা কী হল ! অমর-সারকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "সার, কুশল কেন আসছে না ?"

"কুশল কেমন আছে কুশল জানে, আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না।" ভয়ে পালিয়ে এলুম। আমার আর-এক বন্ধু অপূর্বকে বললুম, "কুশলের কী হল বল তো ?"

"চল না ছুটির পর দেখে আসি।"

"সার যদি মারেন !"

"কারও বাড়ি গেলে মারে, মারামারি সব ক্লাসে।"

pathagar.net

স্কুল থেকে প্রায় এক মাইল হবে কুশলদের বাড়ি। খেলার মাঠ, বোসদের ঝিল, বরফকল, হরেনবাবুর কাঠকল পেরিয়ে, শ্মশানের পাশ দিয়ে, নদীর ধারে বাড়িটা। বড়লোকদের বড়-বড় বাগানবাড়ি, সারাদিন ঝিম মেরে থাকে। সেইরকম দুটো বাগানবাড়ির মাঝখানে অমর-সারের বাড়ি। বেশ বড় একটা উঠোন। উঠোনের মাঝখানে একটা কামিনী গাছ। লাল দালান। পেছনেই নদী। বাড়িটা বেশ শান্ত। আমরা ডাকছি, "কুশল, কুশল !" কোন সাড়া নেই। সময়টা বিকেল-বিকেল। কৃষ্ণকলির ঝোপে, সাদা, হলুদ, নীল ফুল ফুটেছে। কামিনীর ডালে চড়াইপাখির ঝাঁক গল্প করছে। আবার ডাকলুম—"কুশল" ! আমরা এই প্রথম কুশলদের বাড়িতে আসছি। অমর-সারের ভয়ে আগে কখনও আসিনি। বেশ ভয়-ভয় করছে। এইবার একটু জোরে ডাকলুম, "কুশল।" মায়ের মতো দেখতে এক মহিলা বেরিয়ে এলেন, "তোমরা কে বাবা ?"

"আমরা কুশলের বন্ধু। কুশল কেন স্কুলে যাচ্ছে না মাসিমা ?"

"কুশল তো হাসপাতালে।"

"হাসপাতালে ? কেন কী হয়েছে ?"

"তোমরা জানো না !"

"কোন হাসপাতালে মাসিমা ?"

"জেলা হাসপাতালে।"

"কী হয়েছে কুশলের ?"

"কুশলকে আর চেনা যাচ্ছে না। চুনের গামলায় পড়ে গেছে।"

আমি আর অপূর্ব দু'জনে বোকার মতো মুখের দিকে তাকালুম। কুশলের মা বললেন, "আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই বাবা, আমি এখন কুশলকে দেখতে যাচ্ছি। তোমরা আসবে তো এসো।"

হাসপাতালের বিছানায় কুশল শুয়ে আছে। গোটা শরীর সাদা ব্যান্ডেজে জড়ানো। মুখেও ব্যান্ডেজ। শুধু নাকের একটুখানি আর চোখ দুটো বেরিয়ে আছে। কুশল চিত হয়ে শুয়ে আছে। মনে হচ্ছে একটা বোয়াল মাছ। চোখ দুটো গুলির মতো জ্বল-জ্বল করছে। নাকটা মাছ ধরার ফাতনার মতো জেগে আছে। ব্যান্ডেজের ভেতর থেকে একটা কিছু বলার চেষ্টা করল। কাচের জানালায় ডুমো মাছি আটকে গেলে যেমন বুজুর-বুজুর শব্দ হয়, সেইরকম একটা শব্দ ছাড়া কিছুই বোঝা গেল না।

আমি আর অপূর্ব দু'জনে দুটো টুলে বসলুম। কুশলের বিছানা ঘেঁষে। কুশলের মা বসে আছেন মাথার কাছে। ছেলের চুলে হাত বুলোচ্ছেন। চুল

pathagar.net

ছাড়া শরীরে আর কোনও অংশ তো খোলা নেই। অপূর্ব বলল "তুই কী করে এমন হয়ে গেলি কুশল ?"

কুশল কাচের গায়ে মাছির গলায় যা বলল, সেটা হল, কুশলের অনেকদিনের ইচ্ছে, সাইকেল চালানো শিখবে। অমর-সার বার-বার সাবধান করেছিলেন, "কুশল, টেস্ট পরীক্ষার আগে সাইকেল-মাইকেল নিয়ে মেতো না। পরীক্ষার পর তুমি নর্দমায় পড়ো ; খানায় পড়ো আমার কিছু বলার নেই।" কুশল বাবার কথা অমান্য করেছে।

"তা লোকে তো সাইকেল নিয়ে খানায় পড়ে, তুই চুনের গামলায় পড়লি কী করে ?"

বুজুর-বুজুর করে ব্যান্ডেজের তলা থেকে কুশল বলে গেল, "আমার ছোটমামার একটা সাইকেল আছে। যেমন বড়, তেমন ভারী।"

"তাতে তোর কী ?"

"ছোটমামা অনেকদিন থেকে বলছিলেন, কুশল, সাইকেলটা শিখে রাখ, ব্যাটাছেলের সাইকেল-শেখা খুব দরকার। অনেক উপকারে লাগবে।" বললেন, "একমাস সাইকেলটা ধরে হাঁট। সাইকেলটা পাশে নিয়ে মাইলের পর মাইল হাঁট। সাইকেলটা তোর পাশে থাকতে-থাকতে বেশ পোষ মেনে যাবে। তারপর হঠাৎ একদিন তার ওপর চেপে বসাব।

"তা তুই হাঁটলি ?"

"সেই হাঁটতে গিয়েই তো এই কাণ্ডটা হল। ঘোষালদের দোকান চুনকাম হবে, পয়লা বৈশাখ এসে গেল। গোরুর জাবর খাওয়ার বড় গামলায় চুন ভেজানো ছিল। গামলাটা ছিল পথের পাশে। সাইকেলটা মাঝে-মাঝে আমাকে হ্যাঁচকা টান মারছিল। আমিও টান মারছিলুম। টানাটানি চলছিলই। গামলাটার কাছে এসে সাইকেলটা লগবগিয়ে শুয়ে পড়তে চাইল। আমিও মারলুম টান। সাইকেলটা আমার ঘাড়ের ওপর শুয়ে পড়ল, আমিও শুয়ে পড়লুম চুনের গামলায়। সবাই এসে যখন উদ্ধার করল তখন আমি চুনে ভিজে সপসপে হয়ে গেছি।"

সাতদিন পরে কুশল স্কুলে এল। রংটা বেশ ফরসা দেখাচ্ছে। চোখ দুটো কোনওক্রমে বেঁচে গেছে। চুন ঢুকে গেলে আর কিছু করা যেত না। নাকে ঢুকে গেলেও সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হত। কুশল বলল, "সাইকেলটার ওপর ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নোব।"

"কীভাবে নিবি ?"

"হাফ প্যাড্‌ল, ফুল প্যাড্‌লের মধ্যে যাব না। একেবারে সিটে চেপে বসব। প্যাড্‌লে পা। ব্যাপারটার মধ্যে হাতি-ঘোড়া কিছু নেই। শুধু ভোলার ব্যাপার।"

"ভোলার ব্যাপার মানে ?"

pathagar.net

"মানে ভুলতে হবে, যে আমি সাইকেল চেপে আছি। ভুলতে হবে যে আমি সাইকেল চালাতে জানি না। পৃথিবীর বড়-বড় মানুষ বড় হয়েছে কীভাবে জানিস? ভয়কে জয় করে। দুটো কথা মনে রাখবি, পারিব না, এ-কথাটি বলিও না ভাই, এটা হল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হল, আমি ভয় করব না ভয় করব না, দু'বেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না।"

"এতেই হয়ে যাবে?"

"হয় কী না দেখবি চল।"

কুশলের সঙ্গে কুশলের মামার বাড়িতে গেলুম। কুশল আমাদের ম্যাজিক দেখাবে। সাইকেল চালানো না শিখেই পাকা চালিয়ের মতো সাইকেল চালাবে। স্রেফ দুটো কথার ওপর নির্ভর করে, 'পারিব না এ কথাটি' আর 'আমি ভয় করব না'। কুশল সাইকেলটা বাড়ি থেকে রাস্তায় বের করে আনল। বেশ তাগড়া, শক্তপোক্ত একটা সাইকেল। কুশলের মেজোমামা লম্বা মানুষ, তাই সিটটা বেশ উঁচু করা। রাস্তাটা সোজা পুব থেকে পশ্চিমে চলে গেছে। পশ্চিমে গঙ্গা। রাস্তাটা গঙ্গার ঘাটে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেকালের জমিদারদের করা ঘাট। একটু ভেঙে এলেও বেশ সুন্দর। বিশাল চাতাল। ধাপে-ধাপে পইঠা নেমে গেছে জলে। রাস্তাটা নির্জন। তেমন লোক চলাচল নেই। দু'পাশে বাগানবাড়ি, প্রাচীন মন্দির। বড়-বড় গাছ। বেশ স্নিগ্ধ, শান্ত পরিবেশ।

কুশল বলল, "আজ তোদের আমি দেখাতে চাই, কী দেখাতে চাই?"

"সাইকেল চড়া।"

"না সাইকেল চড়া নয়, আজ প্রমাণ করব। মানুষের মনই সব। মনই সব করে। যে জীবনে কখনও সাইকেল চড়েনি, সে সাইকেলে চড়ে চালাতে-চালাতে চলে যাবে।"

কুশল একটা রকের কাছে সাইকেলটাকে নিয়ে এল। গম্ভীর মুখে বলল, "একটু বেআইনি হচ্ছে, মানে, রকে উঠে সিটে বসব। প্যাডেলে পা রেখে সাইকেলে চড়া, প্রথমেই পারব না। পড়ে মরব। অনেক পেকে গেলে তবেই ওভাবে চড়া যায়। আশা করি এতে তোমাদের আপত্তি হবে না।"

আমরা বললুম, "না, না, এতে আমাদের কোনও আপত্তি হবে না।"

কুশল রক থেকে বীরের মতো সাইকেলের সিটে উঠে বসল। বসে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "এইবার আমি আমার মনকে বলব, মন! তুমি কাঁচা নও, পাকা সাইকেল চালক। তুমি সাইকেলে ভূপর্যটন করে এসেছ। তুমি সাইকেল চড়ে পৃথিবীতে এসেছ, সাইকেল চড়েই স্বর্গে যাবে।"

কুশল প্যাডেল পা রেখে চাপ দিল। ডান দিকে হাতল ঘুরিয়ে লগবগ করে রাস্তায় নেমে পড়ল। আমরা ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেললুম। কুশল পড়বে, সাঙ্ঘাতিকভাবে পড়ে হাড়গোড় চুরমার করে ফেলবে। চোখ খুলে দেখি,

pathagar.net

কুশল অনেকটা দূরে চলে গেছে। সাঁই সাঁই করে গঙ্গার দিকে চলেছে। আমরা পেছন-পেছন দৌড়চ্ছি। কুশল উল্কার মতো সামনে ছুটছে। রাস্তা শেষ। কুশল ঘাটের চাতালে। আমরা চিৎকার করছি, 'নেমে পড়, নেমে পড়।' চাতাল শেষ করে কুশল সাইকেলসুদ্ধু লাফাতে-লাফাতে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে সোজা জলে নেমে গেল।

আমরা কোনওরকমে কুশলকে টেনেটুনে জল থেকে তুললুম। ডান পা-টা ভেঙে গেছে। ডান হাত চুরমার। মনে আছে আমাদের, হাসপাতালে কুশলের জন্যে আলাদা একটা বেড রাখা হয়েছিল। কারণ, কুশল মনের জোরে সবকিছু করতে চাইত। তার ফলে দেহ কাবু হয়ে পড়ত। স্কুলে, কুশলের শেষ মনের জোর যা দেখেছিলুম, তিনতলা থেকে লাফিয়ে পড়া। কুশল দেখাতে চেয়েছিল, মনের জোরে মানুষ পাখির মতো উড়তেও পারে। সেবার তিন মাস শুয়ে ছিল হাসপাতালে।

আজ, কুশল একজন বড় বিজ্ঞানী। আমেরিকায় থাকে। আমাকে আর অপূর্বকে হয়তো আর মনে নেই। এইটুকু জানি, কুশল মনের জোরেই বড় হয়েছে। অমর-স্যার হঠাৎ মারা গেলেন। কুশল নিজেকেই নিজে বড় করেছিল।

pathagar.net

Book No 410
Date 19.2005

আবিষ্কার

বড়মামা বসে আছেন তাঁর সাধের গোয়ালঘরের সামনে। ভীষণ চিন্তিত। কপালে তিনটে ভাঁজ। গোয়ালে তিনটে বিশাল আকারের জার্সি গোরু মশমশ শব্দ করে তাদের খাবার খাচ্ছে। গোরু তিনটে বেশ আদুরে-আদুরে দেখতে। যত্নে থাকে, ভাল খায়। ক্ষীরের মতো শরীর। দুধও দেয় তেমনই। দুধের বন্যা বয়ে যায়। বড়মামা দুধ বিক্রি করেন না। বিলিয়ে দেন। এক বালতি হাসপাতালে। এক বালতি আশ্রমে। এক বালতি স্কুলে বিলোবার পরও অনেকটা থেকে যায়। বড়মামার কুকুরের সংখ্যা এখন দশ। তারা দুধ খেয়ে খেয়ে এক-একটা কেঁদো বাঘ। মেজোমামা দুধ ভালবাসেন না। তাঁর জন্য পায়েস হয়। মাসিমা ভালবাসেন সন্দেশ। ছানা কাটিয়ে সন্দেশ তৈরি করেন। আর বড়মামা! দুধে অ্যালার্জি, খেলেই পেট খোলে। তিনি দুধ দেখে আনন্দ পান। বালতি-বালতি সাদা দুধ।

বড়মামার একপাশে আমি বসে আছি। আমার মুখে কোনও কথা নেই। কথা বলার ইচ্ছেও নেই আমার। কাল রাতে মশারি ফেলা নিয়ে বড়মামার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেছে। একই বিছানায় আমরা দু'জনে শুই। মশারিটা আমাকেই ফেলতে হয়। আমি একটু আগেই শুয়ে পড়ি। বড়মামার শুতে বেশ রাত হয়। ডাক্তার তো! রুগিরা ছেঁকে ধরে থাকে। চেম্বার থেকে উঠতে দেয় না। কাশি, জ্বর, পেটব্যথা, মাথা ঘোরা। মানুষের অসুখের শেষ নেই। তার ওপর বড়মামার গল্প করার বাতিক আছে। কেউ কিছু বললেই হল। শুরু হয়ে গেল যুক্তি, তর্ক, গল্প। সে চলছে তো চলছেই। আর রুগিরা নানা সুরে শব্দ করছে "ও ডাক্তারবাবু!" কে কার কথা শোনে! নেহাত খুব হাতযশ, তাই সব ছুটে আসে।

কাল বড়মামা কত রাতে ফিরেছিলেন জানি না, মাঝরাতে মশারির একপাশের দড়ি খুলে চাল ঝুলে গিয়েছিল। বড়মামার আবার ভীষণ ভূতের ভয়। তাঁর আবার একটা ভূতের ডিকশনারি আছে। মশারির চালেও নাকি ভূত থাকে। বড়মামার গোঁ গোঁ শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। চালটা ঝুলছে দেখে আমারও ভয় লেগে গেল। অন্ধকার ঘর। ভুসভুস বাতাসের শব্দ। ঘড়ির টিকটিক। বাইরে বেড়ালের ঝগড়া। কোথায় একটা বাচ্চা ওঁয়া-ওঁয়া করে কাঁদছে। ভয় তো পেতেই পারে। তবে আমি তেমন ভিতু নই। আমার

মাস্টারমশাই বলেছেন, "ভূত বলে কিছু নেই। ভূত আছে মানুষের মনে। আর কোনও-কোনও মানুষ আছে ভূতের মতো, তাদের বলে অদ্ভুত।"

শুয়ে-শুয়ে ভাবলুম অনেকক্ষণ, ব্যাপারটা কী হতে পারে! মশারির একপাশের দড়িটা ছিঁড়ে গেছে। ছিঁড়েছে বড়মামারই জন্য। খুব খারাপ শোয়া। দুড়ুম-দাড়াম হাত-পা ছোড়েন। খাটের বাইরে পা ঝুলে যায় কোনও-কোনওদিন। ধাক্কা-টাক্কা মেরে জাগাতেই ভীষণ রেগে গেলেন আমার ওপর, "তোর কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। ভগবানের সঙ্গে আমার ডায়ালগ চলছিল, দিলি তো সব বারোটা বাজিয়ে!"

আমি বললুম, "মশারির দড়িটা যে ছিঁড়ে বসে আছেন।"

বড়মামা বললেন, "এ তো তোর রোজের কেস। মশারিটাও ভাল করে খাটাতে পারিস না! অপদার্থ! তুই তা হলে তাঁবু খাটাবি কেমন করে! মশারিতেই যার এই অবস্থা!"

"তাঁবু খাটাতে যাব কেন?"

"ধর যদি কোনও দিন এভারেস্টে যাস এক্‌স্‌পিডিশানে!"

"আপনার মতো শোয়া হলে তাঁবু কেন, পাকা দেওয়ালও ধসে পড়ে যাবে। আপনি তো শুয়ে-শুয়ে ব্যালে নৃত্য করেন।"

"যে-কোনও জ্যান্ত মানুষ এইভাবেই শোয়। শোয়া মানে তো আর মরে যাওয়া নয়। তোরা যাকে শোয়া বলিস, সেটা আসলে আর-একটা প্লেনে দাঁড়ানো। প্লেন বুঝিস না, অ্যাঙ্গল বুঝিস না, ডাইমেনশান বুঝিস না। টপ থেকে একটা ছবি তুলে খাড়া করে দিলে কী দেখবি, আমি দাঁড়িয়ে আছি খাটের ব্যাকগ্রাউন্ডে।"

শেষে বললেন, "কাল থেকে আমি আমার বিছানা আলাদা করে নেব। একটু খেলিয়ে শোওয়ার স্বাধীনতা নিশ্চয় আমার আছে! আমি অমন মড়ার মতো কাঠ হয়ে শুতে পারব না। আমি কি কফিনে শুয়ে আছি! চিতায় শুয়ে আছি!"

রাত আড়াইটের ঝগড়া তিনটেয় শেষ হল। গজগজ চলল আরও কিছুক্ষণ। "শুয়ে শুয়ে ভাবতে হবে অপারেশান টেবিলে অ্যানাসথেসিয়া নিয়ে পড়ে আছি চিতপাত। এর নাম দেশ স্বাধীন হয়েছে। কাল থেকে আমি মেঝেতে শোব!"

গম্ভীর গলায় বললুম, "আপনি কেন মেঝেতে শোবেন। আমিই শোব।"

"তুই কেন শুবি! তোর তো এটা মামার বাড়ি, আমার তো আর মামার বাড়ি নয়।"

সকালবেলা ব্যাপারটা আমি ভুলেই গিয়েছিলুম। শুধু মেজোমামা একবার চা খেতে-খেতে জিজ্ঞেস করলেন, "মাঝরাতে কি শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই চলছিল! বাড়িতে আরও দুটো প্রাণী যে ঘুমোচ্ছে, সেটুকু সিভিক সেন্স তোদের এখনও

pathagar.net

হল না ? একজনের তো আর আশা নেই। পাকা বাঁশ। ও আর নুইবে না। তা ছাড়া সঙ্গদোষ। কুকুর, বেড়াল, ছাগল, গোরুর সঙ্গে মিশলে মানুষের কি আর মনুষ্যত্ব বলে কিছু থাকে ! কিন্তু তোমার ওপর আমার একটা হাই হোপ ছিল। তা তুমি তো আবার বড়মামা ছাড়া দুনিয়ায় আর কাউকে চেনো না ভাই !

মেজোমামা অধ্যাপক। অধ্যাপকের মতোই কথা। কয়েকদিন আগে বিলেত ঘুরে এসেছেন। সেখানে নাকি হর্ন থাকলেও গাড়ি হর্ন দেয় না। মানুষ কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শোনে। কেউ চিৎকার করে কাউকে ডাকে না। মেজোমামার এমনই একটু অহঙ্কার আছে, সেই অহঙ্কার আরও কয়েক ডিগ্রি চড়েছে। মেজোমামার ক্যাঁটক্যাঁট কথায় বড়মামার ওপর আমার ভালবাসা আরও বেড়ে গেল। সহজ-সরল, আত্মভোলা। সমবয়সী এক বন্ধুরা মতো।

চেম্বার থেকে ফিরে গোরুদের খেতে দিয়ে বসে আছেন। বিষণ্ণ ভীষণ ভাবনা।

•

বড়মামা অনেকক্ষণ পরে বললেন, "কী রে আমার সঙ্গে ঝগড়া ! কথা বলবি না !"

হেসে ফেললুম, "আপনার সঙ্গে কথা না বলে থাকা যায় ! ইউ আর মাই ফ্রেন্ড, বেস্ট ফ্রেন্ড।"

বড়মামার চোখে জল এসে গেল, এই সামান্য কথায়। বললেন, "তা হলে বোস আমার পাশে।"

"এত কী ভাবছেন তখন থেকে !"

"জানিস তো, আমার মাথাটাই হল উচ্চ ভাবনার বাসা। মন সব সময় গবেষণার দিকে ছুটছে। বিরাট কোনও আবিষ্কার ! যে আবিষ্কার জগৎ স্তম্ভিত হয়ে যাবে। সৃষ্টি থমকে যাবে। স্বয়ং বিধাতা নড়েচড়ে বসবেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মানুষ একসঙ্গে এমন হাততালি দেবে, মনে হবে প্রলয় এসে গেছে।"

"তা সেটা হবে কীভাবে !"

"অ্যায় ! সেই আইডিয়াটাই আমার মাথায় স্ট্রাইক করেছে, বজ্রের মতো, বিদ্যুতের মতো, গোলার মতো, স্কাড মিসাইলের মতো।"

"জিনিসটা কী ?"

"তোর মনে আছে নিউটন আপেল পড়া দেখেছিলেন।"

"মনে আছে।"

"তারপর ! তিনি আপেলটা তুলে কচকচ করে খেয়ে রুমালে মুখ মুছে বাড়ি চলে গেলে মানুষ চাঁদে যেতে পারত ! মহাকাশে পাড়ি দিতে পারত ! আবিষ্কারের আগে দর্শন, দর্শনের পর ভাবনা। আমি এখন সেই ভাবনার স্টেজে আছি।"

pathagar.net

"আপনি কী পড়তে দেখলেন ? তাল, না নারকেল ?"

"পড়াপড়ির ব্যাপার শেষ। ও-পথে আর নো হোপ।"

"তা হলে ?"

"আমি আজ ক্ষেত্রবাবুর বাড়িতে রুগি দেখতে গিয়েছিলুম। সেখানে আর একটা জিনিস দেখলুম। বললে বনসাই। একটা ছোট্ট টবে বটগাছ। বললে ছ'সাত বছর বয়স। এই এতটুকু, এক ফুটের মতো বড়। মোটা গুঁড়ি। ঝুরি নেমেছে ঠিক বটের মতো। ডালপালায় ছোট্ট একটা পাখির বাসা বসিয়েছে। ফ্যান্টাস্টিক !"

"ও-আবিষ্কার তো হয়ে গেছে বড়মামা !"

"আরে ধুর, ওইটা থেকেই তো আমার আইডিয়াটা এল। সামনে কী দেখছিস ?"

"তিনটে জবরদস্ত গোরু।"

"এক-একটা কতটা জায়গা নিয়েছে ! লম্বায় ফুট ছয়েক তো হবেই। গোল ব্যারেলের মতো পেট। হাইট পাঁচ ফুট তো হবেই। পৃথিবী কী ক্রাউডেড। মানুষেরই থাকায় জায়গা নেই। কিলবিল করছে পোকার মতো। তার মাঝখানে বিশাল-বিশাল শরীর নিয়ে ভোঁস-ভোঁস করছে। কোনও মানে হয় ! তাও যদি মানুষের মতো,গাছের মতো খাড়া ওপর দিকে উঠত তা হলে কিছু বলার থাকত না। এরা সব শুয়ে-শুয়ে পেল্লায় হচ্ছে। এ আর চলে না। অসহ্য !"

"তা এর আপনি কী করবেন ? আপনার হাতের বাইরে। ভগবান যেমন করেছেন !"

"সে তো বটগাছকেও ভগবান বিশাল বড় করেছেন। মানুষ তাকে কায়দা করে ছোট করেছে। খোদার ওপর খোদকারি। আমিও সেইরকম 'বনসাই গোরু' করব।"

বড়মামা ভাবের জগতে চলে গেলেন। নিজের মনেই বলতে লাগলেন, "এই দু'ফুট সাইজের ধবধবে সাদা গোরু আমাদের ঘরময় ঘুরে বেড়াবে। বড়-বড় চোখ। লোটা লোটা কান। কালো ঝকঝকে খুর। মাঝে-মাঝে পালিশ করে দেব।"

বড়মামার ভাব চটকে দিয়ে বললুম, "সে গোরু দুধ দেবে তো !"

"আফকোর্স ! গোরুর ধর্ম দুধ দেওয়া ! দুধ দেবেই। বালতি-বালতি দেবে না। তবে এমন কায়দা করে দেব, কল ঘোরালেই জলের মতো গেলাস ধরলেই দুধ। আর পরিমাণে কম বলে আরও ঘন, একবারে ক্ষীরের মতো। আর তেমনই মিষ্টি। এই গোরুর জন্য গোয়ালের প্রয়োজন হবে না। আমরা আমাদের বিছানায় নিয়েও শুতে পারব। সে এক বিপ্লব ! সে এক রেভলিউশান।"

"হবে না বড়মামা। এ হতে পারে না। অসম্ভব।"

pathagar.net

"দাঁড়া, দাঁড়া। তোর গলায় সন্দেহবাদীর সুর। মেজোটার সঙ্গে বুঝি খুব মিশছিস। ও তোর ফিউচার ক্র্যাক করে দেবে। শোন, নেকড়েবাঘ থেকে মানুষ তৈরি করল শেপহার্ড ডগ, অ্যালসেশিয়ান। তারপরে যেমন-যেমন প্রয়োজন হল করে নিল সেইরকম কুকুর। মানুষ পাখি মারবে গুলি করে, সেই পাখি পড়বে জলায়। উদ্ধার করে আনতে হবে। তুলে আনবে, কিন্তু খাবে না। এসে গেল গোল্ডেন রিট্রিভার। সাইবেরিয়ার তুষার প্রান্তরে রাতের অন্ধকারে বরফচাপা পড়ে আছে পথিক। পথ ভুলে গিয়েছিল, এল সেন্ট বানার্ড কুকুর। বিশাল তাগড়াই, প্রায় ঘোড়ার মতো। বরফ থেকে উদ্ধার করে আনবে মানুষকে। চার্চের ফাদার তার গলায় লণ্ঠন ঝুলিয়ে দেবেন। সাইবেরিয়ায় রাতের বেলা পাল-পাল নেকড়ে বেরোয় শিকারের সন্ধানে। ঝোড়ো বাতাস, মাইনাস তিরিশ-চল্লিশ টেম্পারেচার। অসহায় মানুষ দেখছে, লণ্ঠনের আলো দোলাতে-দোলাতে আসছে সেন্ট বার্নার্ড। নেকড়েরা থমকে গেছে। কুকুর এসে মানুষটিকে পিঠে তুলে নিল। আরও বড়-বড় কুকুর আছে, গ্রেট ডেন, পেরিয়ার মাউন্ট। আবার কোলে-কোলে থাকবে, আদর খাবে, এল ল্যাপ ডগ, পিকিনিজ, পুড্‌ল। কুকুর যদি বড়-ছোট করা যায়, গোরু কেন যাবে না! জানিস, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডে ছোট-ছোট ঘোড়া তৈরি হয়েছে। মানুষের বৈঠকখানায় খুটখুট করে ঘুরে বেড়ায়। ছোট-ছোট ছেলেরা পিঠে চেপে এ-ঘর, ও-ঘর করে। হবে না বলে কোনও শব্দ মানুষের অভিধানে নেই। এই তো সেদিন ওড়িশায় গিয়ে দেখে একজনকে জিজ্ঞেস করলুম। বললে, ভ্যাগোল। ভেড়ার ভ্যা আর ছাগলের গোল মিলিয়ে তৈরি। আমিও ওইরকম ছাগলের ছা আর গোরুর রু যোগ করে তৈরি করব ছারু। করব চুরগি।"

"চুরগিটা কী বড়মামা?"

"সে এক মজার প্রাণী। চড়াইয়ের চু আর মুরগির রগি নিয়ে চুরগি। ছোট-ছোট টেবিল, চেয়ারে ঘুরবে। ড্রয়ারে থাকবে। রোজ সকালে টেবিলের ওপর পুটপুট করে মুক্তোর মতো এক ডজন ডিম পেড়ে দেবে। সে-ডিমের সবটাই হবে হলদে, সাদা একদম থাকবে না।"

"তা কি সম্ভব বড়মামা!"

"আবার সন্দেহ! তিমির মতো বড় মাছ যেমন আছে আবার জিরের মতো ছোট মাছও আছে। হাতি যেমন আছে, ছুঁচোও তেমনই আছে। ছুঁচো হল ছোট হাতি। শোন, কল্পনা থেকেই আসে আবিষ্কার। আমি এখন কল্পনার স্তরে আছি।"

মাসিমা কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন খেয়াল করিনি আমরা। মাসিমা বেশ রাগের গলায় বললেন, "বাঃ, বেশ আছ তোমরা! বেলা তিনটে হয়ে গেল, আর কখন খাবে! আমি বসেই আছি, বসেই আছি, আর দুই পাগলে

pathagar.net

মুরগি, চুরগি হচ্ছে। দয়া করে খেয়ে নিয়ে আমাকে উদ্ধার করো।"

বড়মামা উদার গলায় হেসে বললেন, "আজ আমাদের এমন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছিস তো, পরে পস্তাবি। যখন সারা বিশ্বের মানুষ এই বাড়িতে এসে ভিড় করবে। হই হই পড়ে যাবে। ছাদে এসে নামবে হেলিকপ্টার। সেই দিন আসছে, যখন আজ আমি আমেরিকায়, তো কাল আমি ভিয়েনায়।"

মাসিমা বললেন, "সে যখন তখন হবে। তখন তোমাকে আমরা উঠতে-বসতে সেলাম করব। হ্যাঁ, শুনে রাখো, তোমার পেয়ারের পঞ্চাননের মা এসে যা-তা বলে গেছে।"

"কী যা-তা ?"

"তুমি নাকি এত দুধ পাঠাচ্ছ, সেই খেয়ে হোল ফ্যামিলির পেট ছেড়েছে। যাও, পরোপকার করো। পরসেবা, পরপ্রেম।"

বড়মামা বললেন, "আমি মহাপ্রভুর চেলা। মেরেছ কলসির কানা, তা বলে কি প্রেম দেব না! মানে দুধ দেব না। আচ্ছা, দুধ যখন সহ্য হচ্ছে না, তখন ছানা করে পাঠলে হয় না! খাঁটি দুধ অনেকেরই সহ্য হয় না।"

মাসিমা রেগে চলে গেলেন।

রাত্তির বেলা। বড়মামা আজ সকাল সকাল প্র্যাকটিস থেকে ফিরেছেন। মনে হয় অনেক রুগিকে ভাগিয়ে দিয়েছেন। টেবিলে বসে আছেন, টেবিলল্যাম্প জ্বলছে। আমি পড়ছি। বড়মামা ভীষণ চিন্তিত। হঠাৎ বললেন, "তোর কোনও আইডিয়া আছে ?"

"কী আইডিয়া ?"

"মানে কীভাবে করা যায়! বড়কে কতভাবে ছোট করা যায়! এক, ধর, কেটে করা যায়, সেটা চলবে না। মরেই যাবে। আর এক, যদি বাড়টা কোনওভাবে বন্ধ করে দেওয়া যায়! ধর বাছুর। বাছুরটাকে যদি আগাপাশতলা ব্যান্ডেজ কি প্লাস্টার করে দেওয়া হয়। কী ধর, খাপে ভরে রাখা হল।"

"খুব অবৈজ্ঞানিক হয়ে যাচ্ছে বড়মামা। মানে খুবই বোকা-বোকা। তা ছাড়া এক একটা বাছুরের সাইজ দেখেছেন। আপনি তো জিনিসটাকে ছাগলছানার সাইজে আনতে চাইছেন।"

"তা অবশ্য ঠিক।"

"তা হলে!"

"ও হবে না বড়মামা। হলে এতদিনে হয়ে যেত। বৈজ্ঞানিকরা কি এতদিন বসে থাকতেন!"

"একবার নিউজিল্যান্ড গেলে কেমন হয়। ওরা তো ঘোড়াটাকে বাগে এনেছে।"

pathagar.net

"কী দরকার বড়মামা! যে যেমন আছে সেইরকম থাক না!"

বড়মামা উঠে সারা ঘরে পায়চারি করলেন কয়েকবার, তারপর বললেন, "শোন, সমস্ত বড় আবিষ্কারই হয়েছে হঠাৎ। এক করতে গিয়ে আর-এক হয়েছে। অনেক সময় স্বপ্নেও অনেক কিছু পাওয়া যায়। চল, আমরা শুয়ে পড়ি। স্বপ্নে কিছু আসে কি না দেখা যাক।"

আমরা শুয়ে পড়লুম। মশারির দড়ি আজ আরও দুর্বল। জপের মালার মতো গাঁটের মালা। যতবার ছিঁড়েছে ততবার একটা করে গিঁট পড়েছে। মাসিমার কাছে দড়ি চেয়ে বকা ঝকা খেয়েছি, "আমার দড়ির কারখানা নেই। এইবার তোমার বড়মামাকে বলো, চেন কিনে আনতে।"

বড়মামা দু'বার এপাশ-ওপাশ করে ঘুমিয়ে পড়লেন। ফুরফুর করে নাক ডাকছে। বড়মামার নাকডাকার শব্দটা ভারি সুন্দর, যেন নাকের ফুটোয় কেউ পাতলা কাগজের পরদা ঝুলিয়ে দিয়েছে। খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। আমিও ঘুমিয়ে পড়লুম। ঘুম বললে ভুল হবে, চলে গেলুম আবিষ্কারের জগতে। স্বপ্নের ল্যাবরেটরিতে। বড়মামা আগেই চলে গেছেন সেখানে। হয়তো শুরু করে দিয়েছেন পরীক্ষা।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানি না। হঠাৎ টিপ করে একটা শব্দ হল। শব্দটা এত জোরে হল যে, ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকারে কিছুই বুঝতে পারছি না। মশারির চালটা মুখে নেমে এসেছে। মশারি আর মশারি নেই। জাল হয়ে গেছে। বড়মামার দিকটা চলে গেছে মেঝেতে। সেখানে জালে জড়ানো মাছের মতো বড়মামা। ঘুমের ঘোরে বলে চলেছেন, "ইউরেকা, ইউরেকা।"

ঘরের বাইরে থেকে মেজোমামা আর মাসিমা চিৎকার করছেন, "কী হল! কী হল! আজকের খেলাটা কী! বুড়ো খোকা!"

কোনওরকমে নিজেকে জালমুক্ত করে প্রথমে আলো জ্বাললুম। তারপর দরজা খুলতেই প্রথমে ঢুকলেন মাসিমা, পেছনে মেজোমামা। মশারি-ফসারি নিয়ে বড়মামা মেঝেতে। খাটের একটা ছতরি টিভির অ্যান্টেনার মতো হেলে গেছে একপাশে। একটা টুল ছিল, উলটে গেছে। টুলের ওপর ছিল রেডিয়ো। ছিটকে চলে গেছে ঘরের কোণে। কীভাবে, সুইচ অন্ হয়ে গিয়ে কড়াইভাজার মতো আওয়াজ করছে। আর বড়মামা নাগাড়ে বলে চলেছেন, "ইউরেকা, ইউরেকা।"

মেজমামা প্রথমেই বললেন, "এ তো আর্কিমিডিস কেস! একে এখনই তুলে বাথটবে ফেলে দাও।"

মাসিমা বড়মামাকে ভীষণ ভালবাসেন। মুখে খ্যাচম্যাচর করলে কী হবে। নীরবে জাল ছাড়িয়ে বড়মামাকে তুলে বসালেন। বড়মামা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বললেন, "আমি কোথায়?"

pathagar.net

মেজমামা বললেন, "তুমি এখন রোমে ভাই! রোমিং ইন রোম। আস্ত আছ না ভেঙে গেছ!"

বড়মামা ছেলেমানুষের মতো হেসে, "পেয়ে গেছি।"

মেজোমামা বললেন, "কী দুর্লভ জিনিস পেলে ভাই?"

বড়মামা মাসিমার হাত দুটো ধরে বললেন, "ভালবাসা! তোমাদের ভালবাসা।"

মাসিমা ঝাঁ-ঝাঁ করে বললেন, "কাল থেকে তোমাদের বিছানা হবে মেঝেতে। এই বোম্বাই খাট আমি বিদায় করে দেব বাড়ি থেকে।"

সব শান্ত হয়ে যাওয়ার পর বড়মামাকে জিজ্ঞেস করলুম, "আসল জিনিসের কী পেলেন?"

বড়মামা বললেন, "জানিস, বিদ্যাসাগর এসেছিলেন। তিনি বললেন, "এত ভাবছ কেন? সমাধান তো খুবই সহজ। গোরুটাকে বাঙালি করে দাও। তা হলে দেখবে নিজের চেষ্টাতেই ছোট হয়ে যাবে। আর কিচ্ছু করতে হবে না তোমাকে। লিখে রাখো, ছোট যদি হতে চাও বাঙালি হও তবে।"

pathagar.net

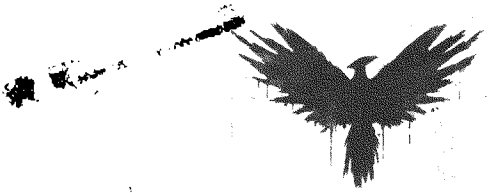

আমিই গোয়েন্দা

অনেকদিনের সাধ, ওই কলমটা কিনব, যেটা আমি মোক্তারবাবুর পকেটে দেখেছি। কী একটা কাজে গিয়েছিলুম। তিনি আমাকে দেখিয়েছিলেন। ভদ্রলোকের খুব কলমের শখ। আমারও কিছু কম নয়। তবে মোক্তারবাবুর প্রচুর পয়সা, আর আমি সামান্য কাজ করি। কলমটা নেড়েচেড়ে দেখেছিলুম লোভীর মতো। জাপানি কলম। টানলে বড় হয়। চেপে দিলে ছোট্ট এতটুকু। সোনার নিব। কোল্যাপসিব্‌ল কলম। কলমটা দেখার পর তিন রাত ঘুমোতে পারিনি। ওইরকম কলম আমার চাই। যতক্ষণ না পাচ্ছি, শান্তি নেই। লোভের মতো বিশ্রী অসুখ আর দুটো নেই।

মোক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করলুম, "কোথায় পাওয়া যায় এমন কলম?"

"এসব বিদেশি জিনিস, সহজে পাওয়া যায় না বাবা। খবর রাখতে হয়। তোমাকে আমি কয়েকটা ঠিকানা দিচ্ছি।"

তিনটে দোকানের ঠিকানা দিলেন। যা টাকা-পয়সা ছিল, সব পকেটে ভরে কলমের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লুম। কলমটা আমার চাই-ই চাই। অ্যাট এনি কস্ট। প্রয়োজন হলে হাতঘড়িটা বেচে দেব। কলমটার জন্য খেপে গেলুম। কলম ছোট হয়, কলম বড় হয়। সরু চুলের মত রেখা পড়ে। ছাই রং। স্টেনলেস স্টিলের ব্যান্ড লাগানো। কী জিনিস তৈরি করছে জাপান!

প্রথম দোকানের মালিক বললেন, "দু' পিস এসেছিল, বিক্রি হয়ে গেছে।" পরে আর আসবে কি না বলতে পারছেন না। দ্বিতীয় দোকান বললে, ওরকম কলম তাঁরা জীবনে দেখেননি। "শেফার আছে, পার্কার আছে, সবই জাতের কলম, নিতে হয় নিন। কলম ছোট হয়, কলম বড় হয়, তাতে আপনার কী! লিখবেন, না ম্যাজিক দেখাবেন!"

বেরসিক মানুষটিকে বোঝাই কী করে, সব কলমই তো লেখে, কিন্তু কোন কলম ছোট-বড় হয়! তৃতীয় দোকানের মালিক বললেন, একটা আছে, তবে তাঁর কাছে নেই, আনিয়ে দিতে পারেন। "অপেক্ষা করতে হবে। ঘণ্টাখানেক পরে কলমটা পাওয়া যেতে পারে। আপনি নেবেন তো, না দেখে ছেড়ে দেবেন।"

"আরে মশাই, আমি নেব। টাকাটা না হয় আপনি আগেই নিয়ে নিন।"

সহকারীকে কী একটা বললেন গুজরাতি ভাষায়, তিনি বেরিয়ে গেলেন। আমার অপেক্ষার পালা। সেই কলম আসছে। ছাই ছাই রং। স্টিলের ব্যান্ড।

pathagar.net

ছোট্ট, সোনার নিব। এই ছোট, তো টানলে বড়। সেই মুহূর্তে আমার মতো সুখী সারা কলকাতা শহরে আর একজনও কেউ ছিল কী! এক ঘণ্টা পরেই একটা কলমের মালিক হব আমি।

ব্যবসায়ীদের তল্লাট। কিছু দূরেই স্টক এক্সচেঞ্জ। শেয়ার মার্কেট। কলকাতার যত পয়সাঅলা লোক চারপাশে ব্যস্ত, গণ্ডারের মতো ঘুরছেন। তাঁরা টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝেন না। পাশেই চিনাবাজার। লরি, ঠেলা আর মোটরবাইকের গুঁতোগুঁতি। উত্তাল কলকাতা তিড়িংবিড়িং লাফাচ্ছে। তার মাঝে আমি এক পাগল। কলমপাগল।

সময়টা কাটাতে হবে। কী করি! রাস্তায় দাঁড়ানো যাচ্ছ না। লোকের পর লোক গুঁতিয়ে চলে যাচ্ছে। এ-পাড়ায় কলকাতার সেই বিখ্যাত শিঙাড়ার দোকান। এক একটার জামদানি চেহারা। পুরোটাই ঘিয়ে ভাজা। ভাবলুম, ওই গরম শিঙাড়া নিয়ে বসলে সহজেই অনেকটা সময় কেটে যাবে। একটু করে ভাঙব, ফুস করে গরম বাতাস বেরোবে, মুখে পুরে হু-হা করব। এ-পাড়ার সামোসা মরিচের ঝালে উগ্র। একটাকে কাবু করতেই একঘণ্টা কাবার।

দোকানটা তেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়; কিন্তু খাবার উত্তম। উঁচু জায়গায় বসে ভীমের মতো এক ভদ্রলোক শিঙাড়া ভাজছেন। বিশাল কড়া, বিশাল তাওয়া। ভাল ঘিয়ের গন্ধে বাতাস আকুল। একটা নয়, দুটো শিঙাড়ার অর্ডার দিলুম। যা ভেবেছিলুম তাই, আগুন দিয়ে তৈরি। পাতার ওপর খেলাতে-খেলাতেই সময় কেটে গেল। গরমে আর ঝালে জ্বলেপুড়ে কলমের দোকানে হাজির হলুম। কলম এসে গেছে, আমার স্বপ্নের কলম। পাতলা প্লাস্টিকের খাপে। দাম দিয়ে কলম পকেটস্থ করে কলকাতার ভিড়ে ঝাঁপ মারলুম। ব্র্যাবোর্ন রোড ধরে হাঁটছি আর ভাবছি, কেউ জানে না, আমার কত সুখ! এই কলমটা পাওয়ার জন্যই আমি যেন জন্মেছিলুম। মিনিট দশেক হাঁটার পর মনে হল, কলমটা পাশপকেটে রাখার চেয়ে বুকপকেটে আটকে রাখাই ভাল। পাশপকেট থেকে যদি পড়ে যায়! ট্রামে-বাসে উঠছি না যখন, তখন পটেমারের ভয় নেই। বুকপকেটে হৃদয়ের কাছাকাছিই থাক না। খাপ খুলে কলমটা বুকপকেটে রেখে হাঁটছি। একটু-একটু গান গাইছি। ভাবছি, প্রথম লেখাটা কী লিখব! আমার জামশেদপুরের বন্ধুকে একটা চিঠি! না একটা কবিতা!

নিজের চিন্তায় মশগুল হয়ে পথ হাঁটছি। বুকপকেটে সেই আহামারি কলম। বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে পড়লুম। যাব ভিক্টোরিয়া হাউসের দিকে। বাঁ দিকের ফুটপাত। তেমন একটা ভিড় নেই। ভিক্টোরিয়া হাউসের বাক্সে ইলেকট্রিক বিলের চেক ফেলব। গেটের কাছ বরাবর গিয়ে বুকপকেটের দিকে তাকিয়ে দেখি পেনটা নেই।

মাথা ঘুরে গেল।

pathagar.net

পাশপকেটে নেই, বুকপকেটে নেই। কোথাও নেই। মাথা ঘুরে গেল। পেন পকেটমার। বাসে-ট্রামে উঠলুম না। ফাঁকা রাস্তা দিয়ে এলুম। পকেটমার এল কোথা থেকে! এ কি ইটালিয়ান পকেটমার! শুনেছি ইটালির পকেটমাররা অসাধ্য সাধন করতে পারে। সামনে, পেছনে যত দূর দৃষ্টি যায়, তাকালুম। পকেটমারের মতো কাউকেই দেখলুম না। সব নিরীহ, শান্ত ভদ্রলোক নিজেদের কাজে আসা-যাওয়া করছেন।

চোখে জল এসে গেল। ভগবান! কলমটা তুমি দিয়েও নিয়ে নিলে! এ কোনও মানুষের কাজ নয় ভগবান, এ তোমারই খেলা। তবু মন মানতে চাইছে না। কলমটা এইভাবে ভ্যানিশ হয়ে যাবে? এইভাবে আমি বোকা বনে যাব?

অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। এতটাই বোকা আমি! পকেট থেকে পড়ে যায়নি। যেতে পারে না। ক্লিপের গ্রিপটা যথেষ্ট ভালই ছিল। আমি একবারও সামনে ঝুঁকিনি। সেই কখন থেকে খাড়া হেঁটে আসছি। অদৃশ্য কোনও হাত কলমটা তুলে নিয়েছে। আমার ধারে কাছে কেউ আসেনি। কোন ভিড় ছিল না। কেউ গা ঘেঁষাঘেঁষি করেনি। তা হলে হাতটা এল কোথা থেকে!

ভাবতে ভাবতে নিজেই একজন গোয়েন্দা হয়ে গেলুম। ফেলে আসা পথের দিকে তাকালুম। বোম্বে সুইট্স-এর দোকানটা যেখানে, সেখানে আমি একবার পকেটে হাত চেপে দেখেছিলুম পেনটা আছে। বোম্বে সুইট্স থেকে ভিক্টোরিয়া হাউস, এর মাঝেই ঘটনাটা ঘটে গেছে। যখন আসছিলুম, তখন আমার বাঁ দিকে সার-সার দোকান। পরিষ্কার ফুটপাত ধরে হাঁটছি। ডানপাশে রাস্তা। এই তো ঘটনা। আমার ত্রিসীমানায় কেউ আসেনি। বলো গোয়েন্দা, কে আমার কলম নিয়েছে! ভূতে!

ফেলে আসা ফুটপাতের মাঝামাঝি জায়গায়, একপাশে দাঁড়িয়ে একটা লোক গামছা বিক্রি করছে। একটা গামছার পাট খুলে দু' হাতে ধরে দোলাচ্ছে এ-পাশে ও-পাশে আর হাঁকছে, "গামছা, গামছা।" গামছার ঝাপটা কোনও-কোনও পথচারীর গায়ে লাগছে। এই রকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে লোকটা গামছা বিক্রি করছে কেন! আবার গামছাটা বিছিয়ে এ-পাশ, ও-পাশ দোলাচ্ছে! মাথায় একটা ঝলক খেলে গেল।

লোকটার দিকে এগিয়ে গেলুম।

ভেবেছে, খদ্দের!

ঝপ করে গামছার কোনাটা চেপে ধরলুম। তলার দুটো কোণ একসঙ্গে। শক্ত। শক্তমতো একটা কী ঝুলছে! লোকটা অবাক হয়ে বললে, "কেয়া বাবু?"

"মেরা কলম।"

"কলম?"

pathagar.net

আমি ততক্ষণে ঝুলন্ত কলমটা গামছার জালি-জালি আঁচল থেকে উদ্ধার করে ফেলেছি। আমার সেই ছাই-ছাই রঙের সুন্দর জাপানি কলম।

লোকটা হতভম্ব। বলছে, "মেরা কুছ কসুর নেহি।"

কলম পেয়ে গেছি। সেই আনন্দেই আমি বিভোর। লোকটাকে আর বলব কী! পরে এক পুলিশ-অফিসার আমাকে বলেছিলেন, ওই গামছাঅলা খুব ইনোসেন্ট ছিল না। ওটাও একটা কায়দা।

না, তা নয়, লোকটা নিরপরাধ! কারণ, লোকটাকে ধরার আগে আমি অনেকক্ষণ তাকে চোখে-চোখে রেখেছিলাম। লোকটা, আপন মনে গামছা দোলাচ্ছে। দুলিয়েই যাচ্ছে। অসৎ উদ্দেশ্য থাকলে, বঁড়শি থেকে মাছ খুলে নেওয়ার মতো গামছা থেকে পেনটা খুলে নিত। তা করেনি।

আবার এও হতে পারে, লোকটা আমাকে নজরে রেখেছিল।

কি জানি কী!

21 SEP 2005

pathagar.net

নিশির ডাক

আমরা তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। জায়গাটা কলকাতার কাছে হলেও বেশ গ্রাম-গ্রাম। পশ্চিমে গঙ্গা। সেদিকে সব মন্দির, বাগানবাড়ি, বাঁশ-বিচালির গোলা। পশ্চিম থেকে একটিমাত্র পিচ-বাঁধানো রাস্তা পুবে বাসরাস্তার দিকে চলে গেছে। বাকি সব অলি-গলি, গলির গলি তস্য গলি। পাকা বাড়ি, সাবেক কালের বাড়ি অনেক ছিল, আবার সেই সঙ্গে ছিল, টিন, টালি, খড়ের চালা। বড়-বড় গাছ। নিম, তেঁতুল, বট, অর্জুন। জংলা অবসতি, বাগান। একটা বাগান ছিল সেখানে শুধু কুলগাছ। আমরা সেখানে শীতকালে কুল চুরি করতে যেতুম। হরি মালী তাড়া করলে, মার দৌড়। ধরবে কী করে, আমরা যে ছোট ছিলুম। হরিণের মতো দৌড়তে পারতুম। কিছু না পেরে হরিদা চিৎকার করে বলত, "সরস্বতী পুজোর আগে কুল খাওয়া, দাঁড়া, মা কালীকে বলে দেব।"

সেই সময়ে একদিন আমাদের বন্ধুমহলে খবর রটে গেল, আজ রাতে নিশির ডাক বেরোবে। আজ অমাবস্যা। সেটা কী জিনিস! বিমানই এই গোপন খবরটা এসেছিল। সে সব জানে। বিমান বললে, "জমিদার অনাদি মল্লিকের এখন-তখন অবস্থা। অত বড় বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি, ঘোড়ার গাড়ি। তাঁকে তো সহজে মরতে দেওয়া যায় না। ডাক্তার-বদ্যি সব জবাব দিয়ে গেছেন। তাই এই শেষ চেষ্টা। অন্যের পরমায়ু কেড়ে নিয়ে তাঁকে বাঁচানো হবে। এক তান্ত্রিক এসেছেন পশুপতিনাথ পাহাড় থেকে। সারা গায়ে তেল-সিঁদুর মেখে তিনি রাত বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে পথে বেরোবেন। হাতে থাকবে জলসমেত মুখ খোলা একটা ডাব। তিনি পল্লীবাসী সকলের নাম ধরে ডাকতে থাকবেন একে-একে। প্রত্যেকের নাম তিনবার করে ডাকবেন। যেই কেউ সাড়া দেবে, অমনই ডাবের খোলার মুখটা টপ করে চাপা দিয়ে দেবেন। অমনই তার প্রাণ ওই ডাবের জলে আবদ্ধ হয়ে যাবে। ওই জল মল্লিকমশাইকে খাওয়ালে তিনি বেঁচে উঠবেন আর এ মারা যাবে।"

বিমান বললে, "খুব সাবধান! আজ আমরা সারা রাত জেগে থাকব। ঘুমের ঘোরে ডাক শুনে সাড়া দিয়েছিস, কি মরেছিস।"

"পশুপতিনাথের তান্ত্রিক আমাদের নাম জানবে কী করে!"

"এ-পাড়ার লোকই জানিয়ে দেবে। লিস্ট ধরিয়ে দেবে।"

pathagar.net

বাড়িতে এসে মাকে খুব চুপিচুপি কথাটা বললুম। বাবা খুব কড়া মানুষ। ভূত, প্রেত, তন্ত্র, মন্ত্র মানেন না। শুধু বলবেন, "অঙ্ক কষো, অঙ্ক। অঙ্কই জীবন, অঙ্কই ভগবান।" আর ওই অঙ্কটাই আমি পারি না। তাই বাবাকে না বলে মাকে বললুম। তা ছাড়া মায়ের চেয়েও বড় বন্ধু মানুষের আর কে আছে!

মা খুব ভয় পেলেন। মায়ের ছেলেবেলায় এইরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। মা এইসব অলৌকিক ব্যাপার খুব বিশ্বাস করেন। সিঙ্গুরে একবার ভুলভুলাইয়া ভূত মাকে সারারাত জঙ্গলে ঘুরিয়েছিল। আধমাইল দূরে মায়ের বাড়ি, মা কিন্তু কিছুতেই পৌঁছতে পারলেন না। ভুল রাস্তায় সারারাত চক্কর মারলেন।

সব শুনে মা বললেন, "আমরা তো জেগে থাকবই, তবে একজনকে নিয়েই আমার ভয়। সে তোর বাবা। যদি জানতে পারে সারারাত লাঠি হাতে রাস্তার রকে বসে থাকবে। এলেই পিটিয়ে শেষ করে দেবে, তারপর যা হয় হবে। না জানানোই ভাল। সেখানেও ভয়, ঘুমের ঘোরে ডাক শুনে উত্তর দিয়ে দিলেই হয়ে গেল।"

আমি বললুম, "বাবার পাশে আমিই তো শুই। জেগেই থাকব। যদি দেখি উত্তর দিতে যাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে মুখ চেপে ধরব।"

আমাদের রাত জাগার সব পরিকল্পনা প্রস্তুত। বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে গঙ্গার ধারের বটতলায় বসে ওই একই আলোচনা হল। সন্ধে হব-হব, বাড়ি ফিরে এলুম। চারপাশ এরই মধ্যে কেমন যেন থমথম করছে। কালীবাড়িতে অমাবস্যার রাতের পুজোর আয়োজন হচ্ছে দেখে এসেছি। অন্য অমাবস্যায় আমরা বন্ধুরা গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচি-ভোগ খাওয়ার লোভে ঠিক হাজির হয়ে যেতুম। সে রাত বারোটাই হোক, একটাই হোক। আজ আর কোনও বেরনো-টেরনো নয়। টাইট হয়ে বসে থাকো বাড়িতে।

অমাবস্যার রাত অন্ধকার হয় ঠিকই, তবে আজ যেন আলকাতরা-রাত। ঘরের জানলায় আকাশটা আটকে আছে, মনে হচ্ছে ওইখানেই শেষ। ওর পরে আর কিছু নেই, মাথা ঠুকে যাচ্ছে। তারাগুলো যেন আগুনের মতো জ্বলছে ধকধক করে। রাস্তাতেও আজ যেন তেমন লোক চলাচল নেই। রাত ন'টার আগেই সব যেন নিঝুম মেরে গেল। দোকানপাট বন্ধ। মিষ্টির দোকানের পেছন দিকের ছেঁচা বেড়ার দরজাটা খোলা। মাঠে আলো পড়েছে। মজা পুকুর। কচু গাছের ঝোপ। কালো কুকুরটা কড়ার চাঁছি খাওয়ার লোভে সামনের থাবায় মুখ রেখে বসে আছে। এই সবই আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের রান্নাঘরের জানলায় বসে।

রাত দশটার সময় মা বললেন, "দেখছিস পলাশ, আজ এরই মধ্যে ঘুমে শরীর যেন ভারী হয়ে আসছে। তোর কিছু মনে হচ্ছে না!"

pathagar.net

"মনে হচ্ছে না আবার! ইতিহাস পড়ছিলুম, এমন ঢুল ধরল, মাথাটা টাঁই করে দেওয়ালে ঠুকে গেল। তাই তো এই জানলায় এসে বসে আছি।"

"বুঝতে পারছিস ব্যাপারটা! সারা পাড়াটাকে মন্ত্রের প্রভাবে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে আস্তে-আস্তে।"

"কীভাবে করে মা?"

"আমি জানি। খুব একটা উঁচু জায়গায় উঠে বিশাল একটা ধুনুচিতে আগুন জ্বালিয়ে ধুনো দিতে থাকে। মানুষের শরীর ভারী হয়। ঘুম পায়। বেশ একটা সুখ-সুখ লাগে। এই সুখের মধ্যে থেকেই একজন চলে যায়।"

"এর হাত থেকে বাঁচার উপায়?"

"আমার জানা আছে। লঙ্কা পোড়া। দাঁড়া চাটুতে কয়েকটা লঙ্কা পোড়াই। সব প্রভাব কেটে যাবে।" কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়িসুদ্ধু সবাই হাঁচি আর কাশিতে অস্থির। আমাদের পুসিটা একপাশে থুপ্‌সি মেরে ঘুমোচ্ছিল। ফিঁচ-ফিঁচ করে হাঁচতে-হাঁচতে উঠে বসল। অবাক হয়ে গেছে। রাত দশটার সময় এ আবার কী! বাবা বাইরের ঘর থেকে ছুটে এলেন, "কী করছ কী তুমি! এরপর লোকে যে থানায় ডায়েরি করবে আমাদের নামে।"

মা শুধু গম্ভীর মুখে একটা কথাই বললেন, "যা করছি সবই জীবের মঙ্গলের জন্যে।"

"এর চেয়ে অমঙ্গল আর কী হতে পারে!" বলে, বাবা উদ্দাম কাশতে-কাশতে পালিয়ে গেলেন। মন্দিরে অমাবস্যার রাতের পুজো শুরু হয়ে গেছে। কাঁসর, ঘণ্টা, জগঝম্পের শব্দ ভেসে আসছে।

রাত এগারোটার সময় রোজ যেমন আমরা শুয়ে পড়ি, সেই রকমই শোয়া হল। আলো-টালো সব নিভে গেছে। এক বিছানায় বাবা আর আমি পাশাপাশি। আর-এক বিছানায় মা। দোতলার ঘর। ঠিক নীচেই রাস্তা। গরম কাল। জানলা-টানলা সব খোলা। বাবার শ্বাসপ্রশ্বাস যেই বড় হল, মা মশারির ভেতর থেকে ফিসফিস করে ডাকলেন, "পলাশ!"

"সব ঠিক আছে মা।"

বাবা পাশ ফিরলেন। আমরা দু'জনেই চুপ করে গেলুম। মন্দিরের আরতি শেষ। রাত নিঝুম। কোথাও একটা কুকুরও আজ ডাকছে না। শুধু দেওয়াল ঘড়ির ঠকাস-ঠকাস শব্দ। ঠাং করে একটা বাজল। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। আর বোধহয় জেগে থাকতে পারলুম না। আমাকে সাবধান করে মা নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। জোরে-জোরে নিশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি। ভীষণ ভয় করছে আমার।

রাত দেড়টা। আজ আর বোধহয় নিশি বেরোল না। সবটাই গুজব। এমনও হয় না কি! এই সব ভেবে সবে পাশ ফিরে শুয়েছি, এমন সময়

pathagar.net

দূরে কোথাও চিং করে একটা শব্দ হল। আমার কান খাড়া। বিছানায় আধশোয়া। গম্ভীর গলায় কে টেনে-টেনে সুর করে ডাকছে, "অনাথ, অনাথ।" তিনবার। পরের নাম, "দীনবন্ধু, দীনবন্ধু।" গলাটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে, ডাকতে-ডাকতে। আমাদের বাড়ির সামনে। বাবার নাম ধরে ডাকছে, "হরিশঙ্কর, হরিশঙ্কর!" আমার হাত বাবার ঠোঁটের কাছে। তেমন হলেই চেপে ধরব।

খুব ইচ্ছে করছে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি। ভীষণ উত্তেজনা হচ্ছে। বাবাকে ছেড়ে উঠতে পারছি না তাই। ডাকটা ক্রমশই গঙ্গার দিকে চলে যাচ্ছে, "কানাই, কানাই, বনমালী, বনমালী, হারাধন, হারাধন!" শেষে আর শোনা গেল না। বাতাসের শাঁ-শাঁ শব্দ। গঙ্গায় শেষ রাতের স্টিমারের ভোঁ। ডাকটা কি আবার এদিকে ঘুরে আসবে! এইসব ভাবতে-ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি!

পরের দিন বেশ বেলায় ঘুম ভাঙল। বাইরের রাস্তায় লোকজন, হইচই। রাতের অতবড় একটা ঘটনার কোনও চিহ্নই পড়ে নেই। আরও একটু বেলা বাড়তেই পবিত্রদের বাড়ি ছুটে গেলুম। ওইখানেই আমাদের আড্ডা বসে। তারপর ওইখান থেকেই কোমরে গামছা বেঁধে আমরা গঙ্গায় গিয়ে পড়ি।

সেদিন আর কোনও আলোচনা নয়। একটাই বিষয়, নিশির ডাকে কেউ কি সাড়া দিয়েছিল! না, নিশি ডেকে-ডেকে সাড়া না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিল! আমরা অনুসন্ধানে বেরোলুম। ডেকে-ডেকে জিজ্ঞেস তো করা যায় না, কে মারা গেছে। যেন কিছুই হয়নি, এই ভাবে ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে।

এ পাড়া-সে পাড়া, এ গলি-সে গলি ঘুরছি আমরা। জীবন স্বাভাবিক। কোথাও কিছু নেই। তার মানে সব বাজে। কোনও এক পাগলের কীর্তি। বিমান আবার সাহস করে দোতলার বারান্দা থেকে লুকিয়ে-লুকিয়ে নিশি দেখেছে। বেঁটেখাটো, চারচৌকো, জটাজুটধারী একটা জীব। দগদগে লাল। বেলুনের মতো রাস্তার এক হাত ওপর দিয়ে ভেসে-ভেসে চলে যাচ্ছে। শেয়ালের মতো কণ্ঠস্বর, "নিতাই, নিতাই।"

পাড়ার শেষ মাথায় রাস্তার কলে দাঁড়িয়ে দু'জন কাজের মেয়ে বলাবলি করছে, কুলবাগানের হারু কাল শেষ রাতে হঠাৎ মারা গেছে। রাতে খাটিয়া পেতে দাওয়ায় শুয়েছিল। সুস্থ-সবল একটা মানুষ। অসুখ নেই, বিসুখ নেই। সকালে দেখা গেল, বিছানায় মরে পড়ে আছে।

ছোট-ছোট। হারুদার কুলবাগান। গাছের পর গাছ। গোল-গোল পাতার ফাঁক দিয়ে নেমে আসছে প্রখর সূর্যের আলো। ছায়া আছে, তবে কেমন যেন শুকনো ছায়া। মাঝখানে একটা কুঁড়েঘর। খবর পেয়ে কিছু লোকজন

pathagar.net

এসেছে। খাটিয়ায় চিত হয়ে পড়ে আছে আমাদের হারুদা। চেহারাটা কাগজের মতো ফ্যাকফ্যাকে সাদা। সবাই বলাবলি করছে, হার্ট অ্যাটাক।

একমাত্র আমরাই জানি ব্যাপারটা কী! রাত দুটোর সময় মৃত্যুর কণ্ঠস্বর—"হারুউ হারুউ।" আধো ঘুম, আধো জাগরণে একটি উত্তর—"যাই।" খপ করে ডাবের খোলার মুখ বন্ধ।

এখন ভাবি, এমনও হয়! কিন্তু তার পরে অনাদি মল্লিক আরও অনেকদিন বেঁচে থেকে শেষে আত্মহত্যা করেছিলেন।

বই নং
তারিখ
ফোন

pathagar.net

ফেরা

অনেকদিন পরে আমি আমার ছেলেবেলার জায়গায় ফিরে এলুম। আমি এখন দূর বিদেশে থাকি। কী করব ? ভাগ্য আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে সেইখানেই তো যেতে হবে। কয়েকদিনের জন্যে এসেছি, মন ভীষণ টানল, তাই চলে এলুম। এখানে আমার আপনজন কেউ থাকে না। সবাই মারা গেছেন। আমার বাবা, মা, জ্যাঠামশাই, জেঠিমা, আমার দিদি। কেউ আর বেঁচে নেই। এক একটা পরিবার এইরকম থাকে, যে পরিবারের সবাই মারা যায়। তাদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবাই। একসঙ্গে এক জায়গায় বসে সব গল্প হবে, মুড়ি তেলেভাজা খাওয়া হবে, ঠাকুরঘরে পুজোর ঘণ্টা বাজবে, রান্নাঘর থেকে ভাল গন্ধ ভেসে আসবে। এইসব সুখ তাদের কপালে লেখা নেই। আমি সেইরকম একজন মানুষ। মৃত্যু আমার জীবন থেকে সকলকে কেড়ে নিয়ে গেছে। এই বিশাল পৃথিবীতে আমি একেবারে একা। আমার কিছুই নেই, আছে একগাদা গল্প। বাবার গল্প, মায়ের গল্প, আমার দিদির গল্প। লিখতে জানলে কত কি লেখা যেত !

ছেলেবেলার এই জায়গাটা গঙ্গার ধারে। সেই গঙ্গার ধারেই আমাদের স্কুল। খুব পুরনো স্কুল। স্কুলটা এখনো আছে ; কিন্তু এ কী অবস্থা ! বাড়িটায় কত দিন রং পড়েনি। এখন গ্রীষ্মের ছুটি চলছে। গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলুম। বাধা দেওয়ার কেউ নেই। সামনেই সেই দরোয়ানের ঘর। তালাবন্ধ। আমি যখন ছাত্র ছিলুম তখন এই ঘরে রামাধর থাকত আর থাকত তার ভাই কেশোরাম। দুজনেই ভীষণ ভাল ছিল। গরমকালে আমাদের মর্নিংস্কুল হতো। গেটের দু'দিকে দুটো চাঁপাগাছ ছিল। ভোরে তার কী সুগন্ধ ! গাছ দুটো এখন আর নেই। রামাধর, কেশোরামেরও থাকার কথা নয়। তারাও এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। গেটের পাশে রামাধর ছোলাকাবলি বিক্রি করত। বাবা রোজ আমাকে এক আনা পয়সা দিতেন। সেই এক আনায় ছোলাকাবলি হতো। কাঁচা শালপাতায় ঝালঝাল, পেঁয়াজটেঁয়াজ দেওয়া। স্বাদটা এখনো মুখে লেগে আছে। ছেলেবেলার খাওয়া তো ভোলা যায় না। এখন মর্নিংস্কুল নেই, রামাধর নেই, ছোলাকাবলি খাওয়ার ছেলেও নেই। যুগ পাল্টে গেছে। বড় শান্ত, রামভক্ত মানুষ ছিল রামাধর। কেশোরামের বয়েস কম ছিল। সে সবসময় হাসত। বন্ধ ঘরটার দিকে তাকিয়ে তাদের কথা মনে পড়ে গেল। এই ঘরটায় এখন কেউ থাকে কি !

pathagar.net

পাথর-বাঁধানো ছোট্ট পথটুকু পেরিয়ে স্কুলের গাড়িবারান্দার তলায় এসে দাঁড়ালুম। পরপর চারটে লম্বা চওড়া ধাপ। ভেঙেচুরে গেছে। অপরিষ্কার। কতদিন ঝাঁট পড়েনি। ডানপাশের দেয়ালে মার্বেল পাথরের ফলক। এই স্কুলের কৃতী ছাত্রদের নাম, পরবর্তী জীবনে যাঁরা গণ্যমান্য হয়েছেন। পঞ্চাশ সালের পর আর কারো নাম নেই। সেই ফলকটা পুরো পড়লুম। পড়ে ভেতরে ঢুকলুম। করিডর। দুপাশে বড় বড় ক্লাসরুম। খড়খড়ি পাল্লার দরজা। ভেঙেচুরে গেছে। ভেতরে সার সার বেঞ্চ, হাইবেঞ্চ। ময়লা, ক্ষতবিক্ষত। জানলার ধারে ধারে কত বছরের আবর্জনার স্তূপ।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ঘোর লেগে গেল। মনে হলো ক্লাসরুম ছেলেতে ভরে গেছে। সেকেন্ড বেঞ্চের ধারে আমি বসে আছি। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ক্লাস নিচ্ছেন কুমুদবাবু। প্রথমে রোলকল করছেন। ওয়ান, টু। যেই সেভেন বললেন, আমি অমনি দাঁড়িয়ে উঠে ইয়েস স্যার বলছি। বোর্ডে চক দিয়ে অঙ্ক লেখার খসখস শব্দ। টেবিলের ওপর ডাস্টার ঠোকার খটাস খটাস। একটা সরল কর লিখেছেন। এখনি আমার ডাক পড়বে—বোর্ডে আয়। অঙ্কটা কর। করতে পারলে দু'চোখ ভরা আনন্দ নিয়ে তাকাবেন। বলবেন, ভেরি গুড। না পারলে দু'চোখে জল—এই সামান্য অঙ্কটা পারলি না! লেখাপড়া একেবারেই করছিস না রে! তোদের ক'জনের ওপর আমার যে বড় আশা ছিল রে!

হঠাৎ চটকাটা ভেঙে গেল। কেউ কোথাও নেই। শূন্য অপরিষ্কার ক্লাসরুম। ভ্যাপসা একটা গন্ধ। ব্লাকবোর্ডটা হেলে আছে। ছুটির আগে খড়ি দিয়ে কে লিখে গেছে—পার্থ পাঁঠা। আমরাও এই সব লিখতুম। আমার সহপাঠী কিশোর ভাল কার্টুন আঁকত, শুনেছি সে এখন প্যারিসে আছে। মস্ত বড় চাকরি করে, ফরেন সার্ভিস। কে জানত কিশোর এত বড় হবে। প্রায় রোজই ক্লাসে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকত দুষ্টুমি করার অপরাধে। দুষ্টুমিতে কিশোরের মাথা খুব খেলত। মাস্টারমশাইরা মেজাজ ভাল থাকলে বলতেন—কিশোর এই মাথাটা যদি পড়ায় লাগাতে পারিস, তোকে আর আটকায় কে?

একদিনের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। কিশোরের ঠিক সামনে বসত সত্যেন। সত্যেনের স্বভাব ছিল শিক্ষকমশাই ক্লাস থেকে বেরোলেই যে কোনো একটা প্রশ্ন নিয়ে, স্যার স্যার করে তাঁর পেছন পেছন যাওয়া। দেখাতে চাইত, সে কত উৎসাহী ভাল ছাত্র! কী ভীষণ তার জানার আগ্রহ! আমরা বলতুম, সত্যেনের একস্ট্রা কারিক্যুলার অ্যাকটিভিটি। সেদিন ইতিহাসের ক্লাস শেষ হলো। দ্বিজেনবাবু ক্লাস থেকে বেরিয়ে করিডর ধরে দোতলার সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছেন, সত্যেন যথারীতি পেছনে ছুটেছে। তার প্যান্টের পেছনের বগলসে লম্বা একটা দড়ি বাঁধা, সেই দড়ির শেষে একটা খালি টিনের কৌটো। কৌটোটা ঢ্যাং ঢ্যাং, ঠ্যাং ঠ্যাং শব্দে লাট খেতে খেতে চলেছে। যেন দমকল

pathagar.net

যাচ্ছে। ক্লাসসুদ্ধ সবাই হইহই করে হাসছে। দ্বিজেনবাবু পেছনে ওই শব্দ শুনে ভয়ে সিঁড়ির দিকে দৌড়চ্ছেন। কিশোর চিৎকার করছে, ফায়ার, ফায়ার। হেডমাস্টারমশাই হন্তদন্ত হয়ে নেমে এসেছেন। সত্যেন তখনো বোঝেনি ব্যাপারটা কী। শব্দটা কেন হচ্ছে। ফায়ার, ফায়ার শুনেছে, দ্বিজেনবাবু প্রাণভয়ে দৌড়চ্ছেন দেখেছে। এইবার সত্যেন নিজেই চিৎকার শুরু করল, আগুন, আগুন। সেই সিঁড়ি দিয়ে লাফাতে লাফাতে উঠছে, আর খালি টিনের কৌটো আরো শব্দ করছে। এইবার হেডমাস্টারমশাই সত্যেনের চুলের মুঠি ধরে বেধড়ক পেটানি শুরু করলেন। সত্যেন তারস্বরে চিৎকার করছে, আর বলছে, 'আমি কী করেছি স্যার, আমাকে কেন মারছেন, আমি তো স্যারের কাছে সিপাই বিদ্রোহের ভেতরের কথাটা জানতে আসছিলুম।' 'লেজে কৌটো বেঁধে সিপাহি বিদ্রোহ! হনুমান। ছাগল।' আবার ধোলাই। রামাধর এসে সত্যেনকে বাঁচাল। পেছন থেকে দড়ি-কৌটো খুলে দিল। কিশোর তখন ভীষণ মনোযোগী ছাত্র! ব্যাকরণ খুলে শব্দরূপ পড়ছে। পরের ক্লাসেই নির্মলবাবুর বাংলা ব্যাকরণ।

সেই সত্যেন এখন কোথায়! শুনেছি কোনো এক বড় কলেজে লাইব্রেরিয়ান হয়েছে। সরকারি চাকরি। সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলুম। সিঁড়ির সেই বাঁক, যে বাঁকে দাঁড়িয়ে হেডমাস্টারমশাই সত্যেনকে পিটেছিলেন। মারটা খাওয়া উচিত ছিল কিশোরের। সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে কিশোর বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। আমি রাজসাক্ষী হলে কিশোরের সাজা হতো। সত্যেনের পাকামি চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল।

সিঁড়ির ধাপ, হাতল আর আগের মতো নেই। সর্বত্র দৈন্য আর অবহেলার ছাপ। পঞ্চাশ বছর বয়েস বেড়েছে। জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। এত ছেলে তৈরি করেছে এই স্কুল, কেউ এই বৃদ্ধের সেবা করে না। সবাই সেই অর্থে কুপুত্র। দোতলার কোনো একটা ঘর থেকে টাইপরাইটারের শব্দ শব্দ আসছে। দোতলার লবিতে শিক্ষকমশাইদের বসার সেই বিশাল টেব্‌লটা আছে। মেহগনি কাঠের। আমাদের সময় ঝকঝক করত। এখন একেবারে কালো ভূত। একগাদা চা-খাওয়া এঁটো ভাঁড় পড়ে আছে উল্টেপাল্টে। মনে হচ্ছিল, টেবিলটাকে পরিষ্কার করি। এক সময় দেশের কত নামকরা বিখ্যাত শিক্ষক এখানে বসে গেছেন। বড় বড় পণ্ডিত। যশ, খ্যাতি, পুরস্কার, সরকারি অনুগ্রহ, কোনো কিছুর তোয়াক্কা করেননি তাঁরা। তাঁরা শুধু জ্ঞান দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে ভাল ছাত্র তৈরি করতে চেয়েছিলেন। অতীতের সেই সব মহান শিক্ষকদের আমি দেখতে পাচ্ছি। ওই তো বসে আছেন প্রাণধনবাবু, বঙ্কিমবাবু, নির্মলবাবু, অনিলবাবু, ডঃ কাঞ্জিলাল, পণ্ডিত ভুজঙ্গবাবু। সবাই যেন একসঙ্গে বসে আছেন। সুপণ্ডিত নলিনীবাবু গম্ভীর মুখে আইনস্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটি নিয়ে কিছু বলছেন। সবাই গভীর আগ্রহে শুনছেন।

pathagar.net

শীর্ণকায় এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। ভূত দেখার মতো চমকে উঠে বললেন, 'কী চাই ? এখানে কী করছেন ? স্কুলের এখন ছুটি।'

'পঞ্চাশ বছর আগে এই স্কুলে আমি প্রথম ভর্তি হয়েছিলুম ; তখন কাঞ্জিলাল স্যার হেডমাস্টারমশাই ছিলেন।'

'ছিলেন ছিলেন। এখন আর তিনি এখানে থাকেন না।'

'সে আমি জানি। তিনি ভবপারে। আমি এখন বিদেশে থাকি। তিরিশ বছর পরে এসেছি, ভাবলুম পুরনো স্কুলটা একবার দেখে যাই। আপনি কি শিক্ষক ?'

'না আমি ক্লার্ক।'

'আমাদের সময় পাঁচুবাবু ছিলেন হেডক্লার্ক। ভারি সুন্দর মানুষ ছিলেন। দেশে তাঁর অনেক নারকেল গাছ ছিল। আমাদের পুজোর পর স্কুল খুললে খুব নারকেল নাড়ু খাওয়াতেন।'

'স্কুল দেখতে এসেছেন তাই তো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'হাতে করে কিছু এনেছেন, সন্দেশটন্দেশ ?'

'কই না তো !'

'কবে আক্কেল হবে ? খালি হাতে গুরুজনদের কাছে আসতে আছে ? চা, কেক খাওয়ান।'

'কোথায় পাবো ?'

'পয়সা ছাড়লেই পাওয়া যাবে। দশটা টাকা দিন।'

'সে আমি দিচ্ছি। দশ কেন পঞ্চাশ দিচ্ছি।'

'অত কাপ্তেনি ভাল নয়, রয়েসয়ে খরচ করতে হয়। দিনকাল ব্যাড, ভেরি ভেরি ব্যাড।'

'আপনার নামটা জানতে পারি ?'

'আমার নামটা মোহন মিত্তির।'

মোহন মিত্তির একটা হুঙ্কার ছাড়লেন, 'জগা।'

বুলেটের মতো তিরিশ-বত্রিশ বছরের এক ছোকরা যে-ঘরে টাইপ হচ্ছিল সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মোহনবাবু বললেন, 'যাও, চা আর খাস্তা নিমকি বিস্কুট নিয়ে এস। স্বাস্থ্যে অবহেলা কোরো না। সুযোগ পেলেই খাবে। ইনি আমাদের এক্স স্টুডেন্ট। কী নাম আপনার ?'

'প্রশান্ত চ্যাটার্জি।'

'কী করেন ?'

'আমি আমেরিকায় চাকরি করি।'

'এই স্কুলের ছেলে আমেরিকায়। তাজ্জব কি বাত !'

pathagar.net

'কেন স্কুলটা খারাপ না কি ? নিচের ওই মার্বেল ফলকের নামগুলো দেখেননি ?'

'দেখবো না কেন ? এ-দেশ হলো এক পিসের দেশ।'

'তার মানে ?'

'মানে সব ওয়ান পিস। এক পিস রবীন্দ্রনাথ, এক পিস নজরুল, এক পিস শরৎচন্দ্র, নেতাজী সুভাষ। ভাঙিয়ে যদ্দিন চলে। এ-বছর আমাদের রেজাল্ট জানেন ? সেন্ট পারসেন্ট।'

'সেন্ট পারসেন্ট পাশ !'

'আজ্ঞে না। সেন্ট পারসেন্ট ফেল। পকেটে বিলিতি সিগারেট নেই ?'

'আছে।'

'চেপে রেখেছেন কেন ভাই ? মনটাকে কখনো সঙ্কীর্ণ করবেন না। ওই জন্যেই বাঙালি তলিয়ে যাচ্ছে।'

এক প্যাকেট মার্লব্রো ছিল পকেটে, মোহন মিত্তিরকে দিতেই খুব খুশি। ঘরে গিয়ে বসেই সেই গানটা মনে পড়ল, ধূলায় ধূলায় ধূসর হব। এত ধুলো কল্পনা করা যায় না। পঞ্চাশ বছরের ধুলো। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'মোহনবাবু মাঝেসাঝে ঝাড়াঝাড়ি করলে কেমন হয় ?'

'খুব খারাপ হয়। ধুলো মানেই ইনফেকসান, জার্ম। যত ঝাড়বেন তত উড়বে। সাবধানে রেখে দিলে ক্ষতি নেই। পৃথিবীতে মশাই অনেক বড় বড় জিনিস আছে সামান্য ধুলো নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন ! বুঝেছি, বিদেশে থেকে আপনার বাতিক হয়েছে। এখানে তো থাকতে পারবেন না। এখানে ধুলো, ধোঁয়া, কাদা গর্ত, গু, গোবর এই সব নিয়েই তো থাকতে হবে।'

চা-বিস্কুট খাওয়া হলো। মোহন মিত্তিরকে বেশ লাগছে। মজার মানুষ। জগা ছেলেটিও ভাল। তবে রামাধর, কেশোরামের সঙ্গে তুলনা চলে না। তারা ছিল সাধু চরিত্রের মানুষ। অবশ্য সেই যুগটা ছিল—দেবতাদের যুগ। মোহনবাবুকে বললুম, 'একবার হেডমাস্টারমশাইয়ের ঘরটা দেখাবেন ! আমার খুব প্রিয় ঘর ছিল।'

'সে আর এমন কথা কী ! জগা ঘরটা খুলে দে।'

ঘরটা খোলামাত্রই বদ্ধ একটা বাতাস বেরিয়ে এল। শিক্ষার ডেডবডি থেকে পচা গন্ধ বেরোচ্ছে। আলমারিগুলো আছে, বই একখানাও নেই। ডানদিকের আলমারিতে ছিল এনসাইক্লোপেডিয়ার সেট। লোপাট। মোহন মিত্তিরকে জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই। কিন্তু হেডমাস্টারমশাইয়ের সেই বিখ্যাত বড় চেয়ারটা কী হলো ?

'মোহনবাবু, চেয়ারটা ?'

'সেই সুন্দর বড় চেয়ারটা ? সেটা মাস্টারমশাইরা মারামারি করে ভেঙে ফেলেছেন।'

pathagar.net

'মাস্টারমশাইরা মারামারি !'

'ও আপনি তো বিদেশে থাকেন, জানবেন কী করে ? স্কুলে যে এখন রাজনীতি ঢুকেছে। ডান আর বাঁ, দু'হাতে এখন তালি বাজছে। আর ছাত্ররা ধরে সানাইয়ের পোঁ।'

মোহন মিত্তির আবার টাইপরাইটারে বসে গেলেন আর জগা বসে গেল খাতা সেলাই করতে। সামনেই মনে হয় পরীক্ষা আসছে। আমি স্কুলের ছোট্ট খোলা মাঠে এসে দাঁড়ালুম। কতকালের প্রাচীন সেই বিশাল মেহগনি গাছটা এখনো আছে। এই গাছের তলায় আমি আর কিশোর কতদিন বসেছি। গল্প হচ্ছে তো হচ্ছেই। নলিনীবাবু আমাদের ভূগোলের নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলেন। কত দেশ, কত মানুষ, কত নদী পাহাড়, সমুদ্র। আমরা কল্পনায় সেই সব জায়গায় চলে যেতুম। ধীরে ধীরে সন্ধে নেমে আসত। বিশাল উঁচু গাছ, মাথায় টিয়ার ঝাঁক।

গাছটার তলায় বসলুম। ভীষণ একা লাগল। কিশোর নেই, সত্যেন নেই, সন্তোষ নেই তরুণ নেই। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল, দেখি তো আছে কি না ! মেহগনি গাছের ওধারে যে ধারটা পাঁচিলের দিকে, সেই ধারে একবার দোলের আগের দিন আমি আর কিশোর ছুরি দিয়ে আমাদের নাম খোদাই করেছিলুম। সেই বছরটাই ছিল আমাদের শেষ বছর। দেখি তো সেই নাম দুটো আছে কি না ! আশ্চর্য ! নাম দুটো ঠিকই আছে—কিশোর প্রশান্ত। নাম দুটো পাশাপাশি, মানুষ দুটো কত দূরে ! জীবনেও আর দেখা হবে না।

যেখান থেকে শুরু হয় সেখানে এসে আর শেষ হয় না। জীবন নদীর মতো। সেই যে একবার চলতে বেরলো, আর ফেরার নাম নেই। সামনে, আরো সামনে। সমুদ্রে গিয়ে শেষ। হয়তো আর আমার দেশে ফেরা হবে না। পকেটে একটা ছুরি ছিল। বিদেশি ছুরি। বের করলুম সেটাকে। জানি পাগলামি, তবু সেই সেদিন যেমন খোদাই করেছিলুম, সেইভাবে ধরে ধরে লিখলুম—এসেছিলুম। কিশোর যদি কোনোদিন আসে, আর যদি মনে করে দেখে, তাহলে দেখবে আমি এসেছিলুম, মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে হলেও আবার ফিরে গিয়েছিলুম আমাদের ছেলেবেলায়।

pathagar.net

গোলকিপার

আমার বন্ধু পলাশ আজ চলে যাবে। আমরা কালাচাঁদ স্কুলে একই ক্লাসে পড়ি। ক্লাস সেভেনে। সেই ক্লাস থ্রি থেকে আমরা পড়ছি। ওর সঙ্গেই আমার বেশি বন্ধুত্ব। সেই যে দু'জনে পাশাপাশি বসে আসছি, সেই যে দু'জনে দু'জনকে প্রাণের কথা মনের কথা বলে আসছি, কাল থেকে শেষ হয়ে যাবে। চিরকালের মতো। কাল থেকে ক্লাসে আমার বাঁ পাশে পলাশ আর বসবে না। টিফিনের সময় স্কুলের গাছতলায় দু'জনে পাশাপাশি গাছে হেলান দিয়ে টিফিন ভাগাভাগি করে আর খাব না। গ্রীষ্মের ছুটিতে ওদের তিনতলার ছাদের ঘরে বসে দু'জনে মিলে হোমটাস্ক করা আর হবে না। ফাইনাল পরীক্ষার আগে দু'জনে মিলে মা কালীর মন্দিরে গিয়ে আর পুজো দোব না। দুর্গাপুজোর সময় দু'জনে মিলে আর প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরব না। কখনো ফুচকা খাওয়া, কখনো শালপাতায় গরম ঘুগনি। ঝালের চোটে হু-হা। ঝাল কমাতে আইসক্রিম।

আমরা দু'জনে নৌকা চেপে বেলুড় মঠে যেতুম। সেখানে এক মহারাজ আমাদের খুব ভালবাসতেন। মঠের সমস্ত বাগান তিনি দেখাশোনা করতেন। সুন্দর ছবি আঁকতেন। অসাধারণ ভাল গান গাইতেন। আমাদের সরষের তেলমাখা মুড়ি খাওয়াতেন। গ্রামের মুড়ি, ফুলো ফুলো। সঙ্গে বাদাম। পোটাটো চিপস। আমাদের গাছের কথা বলতেন। গাছ চেনাতেন। ঠাকুর, স্বামীজির কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলতেন। আমাদের বলতেন, লেখাপড়ার সঙ্গে ব্যায়াম করবে। গাছের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে। দু-একজন ভালমানুষ বন্ধু রাখবে। অনেকের সঙ্গে হইহই না করাই ভাল। ভাল ভাল বই পড়বে। আলোচনা করবে। ভাল ভাল কবিতা মুখস্থ করবে। আর চেষ্টা করবে বড় হয়ে সংসারে না ঢুকতে। পারলে, সন্ন্যাসী হয়ে সমাজসেবা করবে। কুয়োর ব্যাঙ হয়ে জীবন নষ্ট কোরো না। তিনটে মন্ত্র শিখেছিলুম তাঁর কাছে, বি কেয়ারফুল, বি গ্রেট, বি ওয়াইজ। মাছি নয়, মৌমাছি হও। গোলেমালে মাল আছে। গোলটা ফেলে মালটা নাও। সেই ফুল মহারাজও কদিন আগে বোম্বাই চলে গেছেন। সেখানকার আশ্রমে। পলাশরাও বোম্বাই যাচ্ছে। পলাশ তাঁর সঙ্গ পাবে। আমি পাব না।

পলাশ আর আমার মধ্যে চুক্তি হয়েছিল, দু'জনে পরীক্ষায় এক নম্বর

pathagar.net

পাব। সাবজেক্টে এক-আধ নম্বর এদিক-ওদিক হলেও, টোটালে যেন এক থাকে। আর হতোও তাই। পলাশ ইংরিজিতে পাঁচ নম্বর বেশি পেলে আমি বাংলায় পাঁচ নম্বর বেশি পেয়ে যেতুম। অঙ্কে দু'জনেই সমান সমান। ইতিহাসেও সমান সমান। ফারাকটা ইংরিজি আর বাংলাতেই হতো। দু'জনে পরামর্শ করে পড়তুম। একই নোটস। পলাশ আমাকে সাহায্য করত, আমি পলাশকে। একই গৃহশিক্ষক আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে পড়াতেন।

পুজোর সময় পলাশের মা আমার জন্যে জামা-প্যান্ট কিনতেন। আমার মা পলাশের জন্যে। দু'জনেরই এক রং, এক স্টাইপ। অনেকেরই হিংসে হতো, এ আবার কী! একালে ভায়ে ভায়েই মিল থাকে না, দু'পরিবারের দুটো ছেলের মধ্যে এল মিল কিসের! রাস্তায় দু'জনকে একসঙ্গে পাশাপাশি দেখলে সব ব্যঙ্গ করে বলত, এই যে মানিকজোড় চললে কোথায়! বেশ বুঝতে পারতুম, ভেতরে জ্বালা ধরেছে। একদল লোক শুধু খারাপটাই খোঁজে। মনে মনে সব সময় জপ করে, তোদের সর্বনাশ হোক! অনেকে আবার এমনও বলত, হ্যাঁ রে! তোরা কি একসঙ্গে বাথরুমেও যাস।

পলাশ একদিন একজনকে এর উত্তরে বলেছিল, 'এতই যদি কৌতূহল, তাহলে একদিন আমাদের সঙ্গে থাকুন না। তাহলেই সব জানতে পারবেন।' ভদ্রলোক রেগে গিয়ে বলেছিলেন, 'অতিশয় ডেঁপো ছোকরা।'

কাল পলাশদের মালপত্তর সব বাঁধাছাঁদা হয়েই গেছে। পলাশ তার সব বইপত্র, খাতা আমাকে দিয়ে দিয়েছে। ওসব ওর আর কোনো কাজে লাগবে না। নতুন স্কুলে ভর্তি হবে। নতুন পাঠ্যপুস্তক। নতুন জীবন শুরু হবে। আমরা কলম বদলাবদলি করেছি। সন্ধের সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে, যে যে জায়গায় দু'জনে একসঙ্গে যেতুম, সেই সব জায়গায় গেছি। কালীমন্দিরে। খেলার মাঠে। ফাঁকা মাঠ। মাঝখানটা কাদাকাদা। ধারে ধারে কেঁচোর তোলা গুটলে গুটলে মাটি। গোলপোস্টের পেছনে ঘাস আর আগাছার ঝোপ। ব্যাঙের কট্‌কট্‌ শব্দ। দিনের আলো প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। আকাশে শরতের মেঘ-এর চালান এসে গেছে। সোঁদা-সোঁদা, ভিজে ভিজে গন্ধ। গোলপোস্টের শালকাঠ জলে ভিজে ভিজে আর রোদে পুড়ে নব্বই বছরের বৃদ্ধে মতো চেহারা ধরেছে। তার তলায় আমরা, শুধু আমরা দু'জনে দাঁড়িয়ে পলাশ সেই সময় অদ্ভুত একটা কথা বললে, পৃথিবীটা একটা খেলার মাঠ। সবাই খেলোয়াড়। কেউ গোল দেবে। কেউ গোল খাবে। আমরা সকলেই যে যার গোলপোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে আছি। গোলকিপার সব সময় একা। যেই কথাটা শেষ হলো সামনের বটগাছে সেই পেঁচাটা রাতের প্রথম প্রহরের ডাকটা ডেকে উঠল। ঠিক তিনবার, চ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ। পলাশ বলত, প্যাঁচা নয়, ওয়ার্ডেন। বলছে, আর খেলা নয়, এইবার বাড়ি যাও সব। হাত-মুখ ধুয়ে প্রার্থনা সেরে

pathagar.net

পড়তে বোসো। আমাদের খেলার মাঠের ওয়ার্নিং-বেল। কর্কশ, কিন্তু কর্তব্যপরায়ণ। রোজই খেলার পর আমরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে গল্প করতুম। ঘাম মরে যাওয়ার পর বাড়ি ঢোকা হবে। কত রকমের গল্প! অলোক রবীন্দ্রসংগীত করত। প্রণব বলত তার ভবিষ্যৎ জীবন পরিকল্পনার কথা। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে জাহাজে চাকরি নেবে, পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে ঘুরবে। এডেন, সিঙ্গাপুর, পোর্টসমাউথ, বস্টন, ভ্যাঙ্কুভার, সিডনি। অনিমেষ বায়ো-ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে মেরিল্যান্ডে। পার্থ যাবে ভাসাইতে। প্রবীর যাবে হারভার্ডে। শিবেন ভাল ভাল ইংরিজি বই পড়ে। সুন্দর গল্প বলে। তার খুব ইচ্ছে স্যাটিলাইটে চেপে মহাকাশে যাবে। নবারুণ ইজিপ্‌টোলজি পড়ার জন্য কায়রোতে পাড়ি দেবে। পিরামিডে ঢুকে ফারাওদের সমাধি খুলে পুরনো ইতিহাস বের করে আনবে। সত্যেন যাবে হিমালয়ে। এভারেস্টের মাথায় উঠবে। যার যা ইচ্ছে, সবই এই মাঠের আসরে বেরিয়ে আসে। প্রীতি কবিতা লিখতে পারে। মাঝে মাঝে আবৃত্তি করে শোনায়। আমরা অবাক হয়ে শুনি, কেমন কথা দিয়ে কথার মালা গাঁথে, ছন্দে ছন্দে। প্রীতির জীবনে খুব দুঃখ। এখানে মামার বাড়িতে মানুষ হচ্ছে। অনেক ছেলেবেলায় বাবা মারা গেছেন। সে বড় কিছু হতে চায় না। বিষ্ণুপুরে একটা নার্সারি করবে। ফুল ফোটাবে, আর কবিতা লিখবে। মাছ, মাংস, কালিয়া পোলাও, এইসব কিছুই খাবে না। দু'বেলা দু'মুঠো ডাল-ভাত হলেই হবে। সে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত দেখবে। রোদে পুড়বে, বৃষ্টিতে ভিজবে। বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর, টিনের চালের কোণ চুঁইয়ে বৃষ্টির জলের ফোঁটা পড়া দেখবে। নদী যেখানে নির্জনে দুটো পাথরের মাঝখানে নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলে, প্রীতি সেইখানে যাবে। প্রীতি গভীর রাতে রেললাইনের ধারে বসে দূর থেকে আসা ঘুমন্ত ট্রেনের শব্দ শুনবে। অন্ধ সরীসৃপ। সারা জীবন একটা মুখের সন্ধান করবে, যে মুখে শুধু দুঃখ আছে। যে-চোখে দীঘির মতো জল টলটল করে। প্রীতি একদিন সন্ধেবেলা একটা কবিতা শুনিয়েছিল,

মস্ত বড় একটা গাছ আমার বাবার মতো
মাঠের শেষে নদীর কিনারায়।
তার পাশে ছোট্ট একটা চালা
কেউ কোথাও নেই কয়েকটা শালিক।
একটা নৌকা বাঁধা আছে বহু দিন
ওপারে গিয়েছে কেউ, সে আর আসেনি।
এপারের নৌকো ওপারে যায়নি
কথা যে দিয়েছিল সে আর কথা রাখেনি।

pathagar.net

সময় সময়ের পথ ধরে সব নিয়ে গেছে।
অপেক্ষা বসে আছে এই পারে ছায়া হয়ে ॥

কবিতাটা আমরা তেমন বুঝিনি। পলাশ বুঝেছিল। বলেছিল, দেখবি, প্রীতি একদিন মস্ত বড় কবি হবে। কবিতাটা নিজের বড় ডায়েরিতে লিখে নিয়েছে পলাশ। এইসব গল্প হঠাৎ থেমে যেত, যেই প্যাঁচাটা চ্যাঁ-চ্যাঁ করে ডেকে উঠত, ছেলেরা সব বাড়ি যাও।

প্যাঁচার ডাক শুনে পলাশ বললে, 'কাল থেকে এই ডাক আর আমি শুনবো না। তোরা শুনবি।'

মাঠ থেকে আমরা গণেশদার দোকানে গেলুম। একটা লক্ষ্মীর ভাঁড়ে আমাদের টাকা জমত। সেইটা দুপুরে ভাঙা হয়েছে। একান্ন টাকা বেরিয়েছে। পলাশ রাবড়ি আর কালাকাঁদ ভালবাসে। গণেশদার দোকান এই দুটো জিনিসের জন্যে বিখ্যাত। কোণের দিকের চেয়ারে বসে চুটিয়ে খাওয়া হলো। কিছু টাকা বেঁচে গিয়েছিল। সেই টাকায় একটা বড় পাঁউরুটি আর এক ভাঁড় রসগোল্লা কিনে আমরা সুধাদির বাড়িতে দিয়ে এলুম। সুধাদির কেউ নেই। এক সময় নাচ শেখাতেন। হঠাৎ চোখের দৃষ্টি কমে এল। এখন প্রায় অন্ধ। সুধাদিকে আমরা খুব ভালবাসি, সুধাদিও আমাদের খুব ভালবাসেন। প্রীতি একটা মুখ খুঁজছে। সুধাদির মুখ, সেই মুখ। পাঁউরুটি আর রসগোল্লা পেয়ে বললেন, 'কী হলো ? আজ কি তোদের জন্মদিন ?'

পলাশ বললে, 'কাল আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি সুধাদি !'

'কোথায় রে ! সল্টলেকে বাড়ি হলো বুঝি !'

'না গো, আমরা বোম্বাই চলে যাচ্ছি। বাবার অফিস এখান থেকে বোম্বাই চলে গেল !'

'আর আসবি না !'

'যদি কখনো বেড়াতে আসি। এখানে তো আমাদের আর কিছু রইল না।' সুধাদির করুণ মুখ আরো করুণ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলেন না। আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন ঝাপসা চোখে। শেষে নিজের মনেই বললেন, 'কিছুই থাকে না, সবাই চলে যায়। ঠিক আছে, আমিই থাকি।'

পলাশ বললে, 'সুধাদি, বিভাস তো রইল।'

'তা রইল, দুটো চোখের একটা চোখ।'

সুধাদি উঠে দাঁড়ালেন। আন্দাজে, সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়াল ঘেঁষে ঘরের উল্টো দিকে যাচ্ছেন।

পলাশ বললে, 'যাচ্ছ কোথায় ?'

pathagar.net

কোনো উত্তর নেই। আমরা গিয়ে হাত ধরলুম, 'কী করতে চাইছ, বলো ?'

'আলমারিটা খুলব।'

আলমারি খোলা হলো। সুধাদি বললেন, 'ওপরের তাকে দেখ্, একটা বেশ কাজ করা গয়নার বাক্স আছে। সেটা বের কর্।'

সুন্দর একটা বাক্স। পাশের টেবিলে রাখলুম। সুধাদি সামনে ঝুঁকে পড়ে, ক্ষীণ দৃষ্টি দিয়ে এটা-ওটা দেখতে লাগলেন। নানা রকম জিনিস, ক্লিপ, চেন, সোনার সেফ্‌টি পিন, লকেট। এইসবের মধ্যে থেকে সুধাদি ডিমের মতো আকৃতির নীলচে রঙের দুটো কী বের করলেন!

'জানিস এ দুটো হলো এক ধরনের পাথর। একবার হায়দ্রাবাদে নাচতে গিয়েছিলুম। এক মহারাজা আমার নাচ দেখে খুশি হয়ে অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে এই দুটো দিয়ে বলেছিলেন, লাকি স্টোন। এর একটা তোর, আর একটা বিভাসের। সব সময় কাছে রাখবি। লাকি স্টোন। যা চাইবি তাই পাবি।'

পাথর দুটো সত্যিই অসাধারণ সুন্দর। নীলের আভা। যেন দুটো পায়রার ডিম। বিছানার চাদরে দুটোকে পাশাপাশি রেখে আমরা দেখতে লাগলুম। দুটো নীল চোখ ঝকঝক করছে। দেবীর চোখের মণি।

পলাশ হঠাৎ বললে, 'সুধাদি, এই দুটো তোমার কাছেই থাকবে, আমাদেরই জিনিস। আমরা দু'জনে যেদিন আবার এক হতে পারব, এক জায়গায়, সেইদিন আমরা এই দুটো নেবো। এর একটার নাম পলাশ আর একটার নাম বিভাস। দু'জনে একসঙ্গে আবার যেদিন তোমার সামনে আসব সেইদিন।'

আমরা এই কথা বলে চলে এলুম। রাতে আমরা একই বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করলুম। আমাদের যত গল্প ছিল। এবারের পুজোয় কী হবে! বিন্ধবাসিনী তলার মেলায় বেলুন ফাটানো। সোনালিদের বাড়িতে ঘুগনি খাওয়া। ফুটবল টুর্নামেন্ট। শীতের সকালে নৌকো চেপে বেলুড়। যত কথা ছিল। রাত শেষ হয়ে গেল, তবু কথা শেষ হলো না।

সকালে মনে হচ্ছে, কেউ বুঝি মারা গেছে। পলাশদের বাড়ির মালিক শচীনবাবু এসে গেছেন। হাতে এক থোলো চাবি। মাঝে মাঝে ঝনঝন শব্দ। পলাশরা চলে গেলেই ঘরে ঘরে তালা মারবেন। ভদ্রলোকের আনন্দ হচ্ছে, না দুঃখ বুঝতে পারছি না। নিচের বাইরের ঘরে, মোটঘাট সব সাজানো। ক্যালেন্ডার কেটে এক, দুই, তিন, চার নম্বর সাঁটা। তিন দিন আগে এক ফার্নিচারওলা এসে সবই প্রায় কিনে নিয়ে গেছে। একটু পরে এসে খাট তিনটে নিয়ে যাবে। এরই মধ্যে আমরা দু'জনে একটা স্টুডিয়োয় গিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছবি তুলিয়েছি।

pathagar.net

দুটো গাড়ি এল। দুর্গা বলে যাত্রা। কারো মুখেই কথা সরছে না। পাড়া ছেড়ে বড় রাস্তায়। একটা গাড়িতে কিছু মালপত্র, আমি আর পলাশ পেছনের সিটে পাশাপাশি। হাতে হাত ধরা। সব পরিচিত জায়গা পেছনে ছুটে পালাচ্ছে। আমরা ফ্যালফ্যাল করে দেখছি। হাওড়া স্টেশন। কত লোকের কত দিকে যাওয়া আসা। হাঁই হাঁই ছোটাছুটি। গীতাঞ্জলি দাঁড়িয়ে আছে। মালপত্তর উঠে গেল। পলাশের মা-বাবা উঠেছেন। প্রণাম করেছি। আশীর্বাদ করেছেন। সবই নীরবে। চোখে টলটল জল। সবশেষে উঠছে পলাশ। ভাল করে দেখতেই পাচ্ছি না, দু'জনে দু'জনকে। জল, অনবরত জল। মানুষের চোখে এত জল আসে কোথা থেকে! পলাশ কোনো রকমে বলতে পারল, 'চিঠি দিস, ছবিটা পাঠাস। খেলার মাঠের প্যাঁচাটাকে বলিস, সন্ধে হলেই বাড়ি ফিরব।'

ট্রেন চলছে। জানলায় পলাশের মুখ। সরে যাচ্ছে। আমি ছুটছি। পলাশ হাত নাড়ছে। একটা আঁচলের মতো আমার মন আটকে গেছে ট্রেনের জানলায়। ছাড়াতে পারছি না। আমাকে টানছে। ট্রেনের গতি বাড়ছে। মনে পড়ছে প্রীতির কবিতার একটা লাইন, 'ছুটতে ছুটতে একদিন ছোটা শেষ হবে আকাশের কাছে এসে।'

pathagar.net

সন্ধান

অনেক অনেক দিন আগে, আমি যখন খুব ছোট, স্কুলে পড়ি, আমাকে এক ফকির বলেছিলেন, এই শহরের কোথাও একটা ওক গাছ আছে। বিশাল বড়।

ছোট হলেও, এ-কথা জানতুম, ওক বিদেশি গাছ। এদেশের মাটিতে জন্মাতে পারে না।

—এই শহরে ওক গাছ কোথা থেকে আসবে পীরসাহেব ? এ তো খুব অসম্ভব কথা।

আমাদের স্কুলের পাশে একটা দরগা ছিল। পীরসাহেব সেইখানেই থাকতেন। পরনে কালো জোব্বা। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। অসম্ভব উজ্জ্বল দুটো চোখ। আমার সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল। তিনি গম্ভীর মুখে বলেছিলেন, আছে, আছে। কোথায় কী থাকে কেউ কি বলতে পারে বাবা ! আল্লার ইচ্ছায় সব হয়।

—আচ্ছা, ওক গাছটা না হয় আছে, তাতে আমারই বা কী আপনারই বা কী !

—সেখানে একটা মজা আছে, বহুত মজা।

—কী মজা ! বিশাল একটা গাছ। ডাল-পালা-পাতা। এর বেশি তো কিছু নয় !

—ওস্তাদ, সে কথাটা আমিও জানি, কিন্তু এ-গাছটায় একটা ব্যাপার আছে।

—সেইটেই তো জানতে চাইছি।

পীর সাহেব হাসতে লাগলেন। আর তিনি যতই হাসছেন, ততই আমার কৌতূহল বাড়ছে।

—বলুন না পীরসাহেব ! কেন অমন করছেন !

—গাছটা তুমি যদি খুঁজে পাও, তাহলে একটা ঝলমলে দিনে তার তলায় গিয়ে দাঁড়াবে। গাছের তলার দিকের গুঁড়িটা খুব ভালো করে দেখবে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে। দেখতে দেখতে এক জায়গায় একটা সাদা ফোঁটা দেখবে। সেই জায়গায় একটা আঙুল দিয়ে চাপ দেবে। প্লাং করে আওয়াজ হবে। সঙ্গে সঙ্গে গোল একটা চাকতি খুলে আসবে। একটা ফোকর। সাঁহস করে সেই ফোকরে হাত ঢোকাবে। দেখবে একটা সিল্কের দড়ি ঝুলছে। দড়িটা ধরে টানবে। আর ঝর ঝর করে পড়বে মণি, মুক্তো, হীরে।

Pathagar.net

পীরসাহেবের যত সব আজগুবি কথা। এমন কথা কেউ বিশ্বাস করে! এই শহরে ওকগাছ! সেই গাছের গুঁড়িতে ফোকর! গোল চাকতির মতো স্প্রিং লাগানো ঢাকনা! অসম্ভব! এ হতেই পারে না। কিন্তু কথাটা মনে ঢুকে রইল। কে বলতে পারে থাকলেও থাকতে পারে। এই পৃথিবীতে কত কী-ই তো থাকে! সমুদ্রের তলায় ডুবে যাওয়া জাহাজের সম্পদ। মাটির তলায় পুঁতে রাখা মোহরের ঘড়া। হীরের খনিতে হীরে। কথাটা একদিন আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু কৃষ্ণেন্দুকে বললুম। সে বললে, 'চল একদিন ইডেনে যাই ওখানে অনেক গাছ।'

রোদ ঝলসানো দুপুর। আমরা দুজনে ইডেনে গেছি। অনেক অনেক গাছ সবুজ মাঠ। দিঘি। নৌকা। বিশাল একটা গাছ দেখিয়ে কৃষ্ণ বললে, 'এইটা মনে হচ্ছে ওক গাছ।'

পাশ দিয়ে এক ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন। শুনে ফেলেছেন। বললেন, 'ওক গাছ এদেশে কোথায় পাবে! এটা হলো শিশু গাছ।'

গাছের নাম শিশু, অথচ কী বিশাল!

কৃষ্ণ বললে, 'একটা ওক গাছ কোথাও না কোথাও আছে।' ভদ্রলোক একটু রেগে গিয়েই বললেন, 'তাহলে আছে। খুঁজে দেখো।'

আর একটা বেশ বড়সড় গাছের তলায় গিয়ে কৃষ্ণ বললে, 'এটা ওক না হয়ে যায় না। তলাটা ভালো করে দেখো।

দুজনে গুঁড়ি মেরে দেখতে লাগলুম।

আঁতিপাতি করে। কোথায় কী! একটা গাছ। শিকড়। দু-একটা খোঁদল। অজস্র কাঠপিঁপড়ে। পচা পাতা। একটা গিরগিটির বাচ্চা। ইডেনে যত বড় বড় গাছ আছে সব দেখা হয়ে গেল। সন্ধের ঝোঁকে হতাশ হয়ে আমরা ফিরে এলুম।

পীরসাহেবকে বললুম, 'কোথায় সেই গাছ! বলুন না। কেন বলছেন না?'

তিনি রহস্যের হাসি হেসে বললেন, 'আছে আছে। কোথাও আছে। জায়গাটা খুব নির্জন। ড্যাম্প। স্যাঁতসেতে। অনেক দিন সেখানে রোদ আসেনি। ইংরেজ আমলের কোনও বাগান।'

কৃষ্ণেন্দু বললে, 'জায়গাটা কোথায়? এইটুকু আপনি বলতে পারছেন না? তার মানে আপনি জানেন না। সবটাই আপনার কল্পনা। গল্প।'

'তাই হয়তো হবে। তবে আমি জানি আছে। আমার গুরু আমাকে বলে গেছেন।'

আমরা একদিন গঙ্গা পেরিয়ে বোটানিকসে গেলুম। ইডেনের চেয়েও বড় বাগান। কৃষ্ণেন্দু বিশাল বটগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে বললে, 'এইটা ওক গাছ হলে কী ক্ষতি ছিল!'

pathagar.net

সে আর আমি কী করব ! বট বটই হয়। কোন দুঃখে ওক হবে ! প্রায় চার ঘণ্টা ধরে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সেই ওকের সন্ধান কোথাও পাওয়া গেল না। আফ্রিকার, দক্ষিণ আমেরিকার কত রকমের গাছ, সেই পাগলা পাতার গাছ, যার কোনও দুটো পাতা একরকম নয়, সবই আছে। নেই কেবল ওক। গঙ্গার ধারে বসে কৃষ্ণেন্দু বললে, 'আর যাই হোক অনেক গাছ চেনা হলো। বেশ ভালোই লাগে গাছের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে। কোনওটা বাবার মতো, কোনওটা মাস্টারমশাইয়ের মতো, কোনওটা ওই পাগলা ফকিরের মতো।'

এই শহরে যত পার্ক, যত কবরখানা ছিল সব ঘোরা হয়ে গেল। মেহগনি, অর্জুন, আকাশমণি, নাগকেশর, কৃষ্ণচূড়া কত কত গাছ, নেই কেবল একটা ওক। শেষে আমরা হাল ছেড়ে দিলুম। সব বাজে। ফকির সাহেবের গল্প।

দেখতে দেখতে আমরা বড় হয়ে গেলুম। ফকির সাহেবও মারা গেলেন। দরগাটা শ্রীহীন হয়ে গেল। কৃষ্ণেন্দু এখন গাছকে ভালোবেসে বিশাল বোটানিস্ট। তানজানিয়ার ন্যাশন্যাল ফরেস্টে চাকরি করে। সেইখান থেকে আমাকে চিঠি লিখেছে, সত্য ! তোর ফকির সাহেব, চল্লিশ বছর আগে যে কথাটা বলেছিল, তার অর্থ আমরা বুঝতে পারিনি। মানুষই গাছ। অন্তত চেষ্টা করলে, সে গাছের মতো হতে পারে। সেটাই হলো সাধনা। আকাশের দিকে ক্রমশ বেড়ে ওঠা। উঁচু আরও উঁচু। অচল, অটল, স্থির, ঝড় ঝাপটা, রোদ। কত পাখির বাসা, কত পাখির আশ্রয়, কত পথিকের ছায়ায় বসা, চলে যাওয়া সময়ের সাক্ষী, মানুষের ইতিহাসের দর্শক। আর ওই যে বলেছিলেন, চাপ দিলেই ঢাকনা খোলে, হাত ঢোকালেই মুক্তো মানিক ! সত্য। সেইটাই হলো মন। জ্ঞানের বোতামে চাপ দিলে অজ্ঞানের ঢাকনা খোলে। মনই হীরে, চুনি, পান্না, জহরত। তোর ফকির এক মহামানব। ওকগাছ খুঁজে পেয়েছি। সেই গাছ আমি, সেই গাছ তুমি।

pathagar.net

গোল

আমাদের স্কুল টিমের সঙ্গে যোগেশ্বরী বিদ্যামন্দির টিমের ফাইন্যাল খেলা। হেডমাস্টার মশাই টিফিনের সময় আমাদের ডাকলেন। আমাদের টিমের ক্যাপটেন সুশান্ত। সুশান্তর ধারণা, সে একদিন পেলে হবে। হবেই হবে। ডান পায়ে বাঁ পায়ে বল নাচানাচি করে। মাথার বল পায়ে নামায়, পায়ের বলে মাথায় তোলে। অসীম ক্ষমতা। আমাদের তাক লেগে যায়।

হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'শোনো, সুশান্ত। আমাদের স্কুলের পরীক্ষার রেজাল্ট খুবই ভাল। সব কটা ফার্স্ট ডিভিসান। একটা সেকেন্ড। সেটাও ফার্স্ট হত যদি না পকস হত। এইবার আমি চাই, ডিসট্রিক্ট ট্রফিটাও যেন আমাদের হাতে আসে। প্লে নয় পেলে হতে হবে! ট্রফিটা পেলে তোমাকে আমি পেলের সম্মান দোবো। কী পারবে?'

সুশান্ত বুক ফুলিয়ে, 'পারবো স্যার। গুনে গুনে তিনটে গোল দোবো। থ্রি নিল। প্রকাশকে সেন্টার ফরোয়ার্ডে রাখব। ওর টেরিফিক শটের জোর। গোলকিপার সমেত বল জালে জড়িয়ে দোবো। আপনি ধরে রাখুন। ট্রফি আমাদের।'

সুশান্ত বীরের মতো হাসল।

হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'এই তো চাই। আমাদের দেশে এইরকম ছেলেরই প্রায়োজন। এদের নামই তো ইতিহাসে লেখা থাকবে। কলকাতার পার্কে মূর্তি হয়ে বসবে। যাও, তোমরা আর দেরি কোরো না। প্র্যাকটিসে চলে যাও।'

স্কুলের মাঠে বল পড়ল। প্র্যাকটিস! সুশান্ত এক জায়গায় আমাদের জড় করে বললে, 'খেলার দুটো ধরন, একটা ল্যাটিন আমেরিকান, আর একটা ইওরোপিয়ান। আমি একটা নতুন ধরন বের করতে চাই।'

আমরা সবাই উত্তেজিত হয়ে বললুম, 'কী সেটা?'

'সে ভাবে কেউ কখনো খেলেনি। একেবারে নতুন স্টাইল। ঘুরতে ঘুরতে ওপরে ওঠা। যাকে বলে চরকি স্টাইল। বল নিয়ে গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে যাব বিপক্ষের গোলের দিকে।'

'সেটা কী ভাবে হবে!'

'হওয়াতে হবে। শিখতে হবে। প্রকাশকে সেইটাই আমি আজ শেখাব।

pathagar.net

খেলার জগতে আমি একটা বিপ্লব এনে দোবো। এই টেকনিকটার নাম হবে সুশান্ত টেকনিক। মারাদোনা আমার গলায় মালা পরাবেন। পেলে এসে হ্যান্ডশেক করবেন। ফিফা আমাকে ডেকে পাঠাবে।'

শুরু হল প্র্যাকটিস। সুশান্ত পাঁই পাঁই করে বল নিয়ে ঘুরছে। গোল করে ঘুরতে ঘুরতে গোল দেবে। শুরুর আগেই বলে দিয়েছে, 'গোল কথাটার মধ্যেই গোল আছে! এটা কেউ এতদিন বোঝেনি। গোল গোল করেই গোল।"

প্রকাশ গোলের দিক থেকে গোল করে চক্কর মারতে মারতে কোনো রকমে মাঝমাঠ অবধি এসেই মাথা ঘুরে উল্টে পড়ে গেল। তোল তোল, টেনে তোল। সুশান্ত গবেষণায় বসল। মাথা ঘোরার কী হবে। ঠিক আছে, বল ছাড়া তোরা সবাই মাঝেমাঠে গোল হয়ে বন বন করে ঘোর। মাথা ঘুরে গেলেই ঘাসের ওপর শুয়ে পড়। সে বেশ মজা। গোলকিপার তপন ছাড়া আমরা সবাই চরকিপাক।

ফাইনাল খেলার দিন এসে গেল। হেডমাস্টারমশাই নিজের পয়সায় দশ প্যাকেট চিউইংগাম কিনে এনেছেন। প্রথমে আমাদের একটা করে দিলেন। গোলকিপার সঞ্জয়কে বললেন, 'তোমার মন্ত্র, ডু অর ডাই। গোলে বল ঢুকতে দেবে না। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। মরে যাবে সেও ভাল, সেও ভাল তবু গোল খাবে না।'

সুশান্তকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'মাই বয়! আজকের দিন তোমার দিন। সারা দেশ তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। বিজয়মাল্য যেন তোমার গলায় দোলে। সব ঠিক আছে তো!'

সুশান্ত বললে, 'স্যার চরকিপাক খাইয়ে দোবো। সব তালগোল পাকিয়ে দোবো স্যার। আজ এই মাঠে ইতিহাস তৈরি হবে।'

গেম টিচার অধীরবাবু বললেন, 'আমরা ইতিহাস চাই না, ভূগোল চাই। গোল, গোল।'

সুশান্তর দাপট দেখে বিপক্ষের দল মাঠে জড়সড়। মনে হচ্ছে, খেলার আগেই সুশান্ত গেমটা জিতে নিয়েছে। ক্যাপটেন এইরকম হওয়া উচিত। মাঠের চারপাশ লোকে লোকারণ্য। আমগাছের ডালেও কিছু ছেলে ঝুলছে। চিৎকার, চেঁচামেচি। এমন সময় ফুরুর করে বাঁশি বাজল। খেলা শুরু। বলে শট মারার টিস্ শব্দ।

আমাদের গোলের কাছে ঝটাপটি। কোনোক্রমে বিপদ কেটে গেল। সুশান্ত গোলকিপার সঞ্জয়কে শিখিয়েছিল, গোলের কাছে জটলা দেখলেই তিড়িং বিড়িং করে এমন লাফাবি যাতে বিপক্ষ বিভ্রান্ত হয়ে গোলের বাইরে বল মেরে দেয়। তাই হল। গোল কিক। বল মাঝমাঠে।

এইবার প্রকাশের নয়া টেকনিক। লাট্টুর মতো পায়ে বল নিয়ে চরকিপাক।

pathagar.net

ঘুরছে কিন্তু ওপর দিকে উঠতে পারছে না। একই জায়গায় বাঁই বাঁই ঘুরছে। দর্শকদের মহা উল্লাস। এমন খেলা তারা জীবনে দেখেনি।

সুশান্ত চিৎকার করে বললে, 'স্ট্রাইক। দুর্গ ভেদ করো।'

সারা মাঠে আমাদের সমর্থকদের চিৎকার, 'স্ট্রাইক, স্ট্রাইক, প্রকাশ, প্রকাশ স্ট্রাইক স্ট্রাইক।"

প্রকাশ যেন পাগলা ষাঁড়। একপাক ঘুরেই ডান পায়ে বেদম এক শট। গোলার মতো বল ঢুকে গেল আমাদেরই গোলে। ওয়ার্ল্ড কাপের খেলোয়াড়দের মতো দু'হাত মাথার ওপর তুলে নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করতে করতে প্রকাশ বিপক্ষ দলের ঘাড়ে গিয়ে তাদের ক্যাপটেনকে জড়িয়ে ধরে কোলে উঠে পড়ল।

কোনো হুঁশ নেই। গোল একটা দিয়েছে বটে, কিন্তু সেটা সেমসাইড। বিপক্ষের ক্যাপটেন অঞ্জনের কোলে উঠে হুঁশ হল, এ তো সুশান্ত নয়! এটা তো বিপক্ষের দিক।

হেডমাস্টারমশাই আর গেমটিচার দু'জনেই মাঠে নেমে এলেন। একজন ধরলেন ডান কান আর একজন বাঁ কান। টানতে টানতে মাঠের বাইরে।

আমাদের গোলে আমরাই পরাজিত হয়ে যোগেশ্বরীর হাতে ট্রফিটা তুলে দিলাম।

মাঠের বাইরে এসে প্রকাশ কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'কী করব স্যার, গোল হয়ে ঘুরলে দিক বোঝা যায়? গোলের তো কোনো দিক নেই।'

অঙ্কের স্যার বললেন, 'গণিত তো সেই কথাই বলে। গোল ইজ এ গোল।'

pathagar.net

তোমার তরবারি

কাঁধের ভারি ঝোলা ব্যাগটা কোনওরকমে একপাশে নামিয়ে রেখে বাবা সেই ধুলোভর্তি রকের ওপরেই শুয়ে পড়লেন। বিশাল একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'দাঁড়া একটু জিরিয়ে নি।'

সেই ছিল তাঁর জীবনের শেষ কথা। আমি তাঁর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লুম। ভাঙাচোরা একটা মুখ। অল্প-অল্প দাড়ি। দুটো চোখ কোন গভীরে তলিয়ে আছে। সাদা মোটা কাপড়ের শার্ট। মালকোঁচা মারা ধুতি। আধময়লা। কব্জিতে কতকাল আগের পুরনো মডেলের একটা ঘড়ি।

আমি বাবার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললুম, 'তুমি একটু জল খাবে ?'

কোনও উত্তর নেই।

'বাবা, তুমি একটু জল খাবে ?'

দশ-বারো বার ওই একই কথা বলার পর, যখন কোনও উত্তর পেলুম না, তখন আমি আকাশের দিকে তাকালুম। খাঁ খাঁ করছে রোদ। একটা চিল কি কাকও উড়ছে না। বাবার হাতঘড়িতে সময় তিনটে। এ রাস্তায় ট্রাম-বাস কিছুই চলে না। দু'চারজন লোক কেবল চলছে। নিজের কাজে হনহন করে। মাঝে মধ্যে একটা-দুটো রিকশা যাচ্ছে টুং টুং করে। এলিয়ে আছে যাত্রী। পাড়াটা অফিসপাড়া নয়। এমনি পাড়া। একটু দূরেই অবশ্য ভয়ঙ্কর কলকাতা। কলকল করে ছুটছে। গর্জন করছে। একটু আগে আমরা ওই কলকাতারই একটা অফিস থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এই দিকে চলে এসেছি। রাস্তার ধারে নতুন-পুরনো বাড়ি।

যে বাড়ির রকে বাবা শুয়ে পড়েছিলেন সেই বাড়ির বাইরের ঘরের জানালা খুলে গেল। এক বৃদ্ধা মহিলা উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তোমরা ?' সুন্দর রং, সুন্দর চেহারা, চোখে পুরু চশমা। কী বলবো ? আমরা কে ? আমরা উটকো লোক। আমাকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি ফেরিওলা !'

উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে সরে গিয়ে বললুম, 'মা, আমার বাবা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন।' মা বলায় ভদ্রমহিলার মুখের চেহারা পাল্টে গেল। তিনি সদর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন। পায়ে নরম চটি। পরিষ্কার ধবধবে

pathagar.net

সাদা কাপড়। ফুরফুরে কাঁচাপাকা চুল। মুখে মনে হয় কোনও মশলা। অল্প, অল্প চিবোচ্ছেন। তাঁর পায়ের কাছে আমার বাবা চিত হয়ে পড়ে আছেন। তিনি নিচু হলেন। আরও নিচু। বসে পড়লেন বাবার মাথার সামনে। পাথর-বসানো সোনার আংটি পরা একটা আঙুল বাবার নাকের সামনে কিছুক্ষণ ধরে রেখে আমার মুখের দিকে তাকালেন। বড় বড় চোখ। তাকিয়ে আছেন। তাকিয়েই আছেন। হঠাৎ জল গড়িয়ে পড়ল। উঠে দাঁড়ালেন। আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'তোমার বাবা মারা গেছেন, বাবা!'

'মারা গেছেন?'

মাথা ঘুরে হয়তো পড়েই যেতুম। এক ফোঁটা জলও আমি বাবার মুখে দিতে পারলুম না। আমার বাবা বিলিতি বইয়ের ব্যবসা করতেন। ঝোলায় নানারকম বই নিয়ে অফিসে ঘুরতেন। ব্যাঙ্কে, খবরের কাগজের অফিসে। অন্য অফিসে। যাঁরা বড় চাকরি করেন, অনেক টাকা মাইনে পান, বেশ বড়লোক, অথচ লেখাপড়া করতে ভালবাসেন, তাঁরা সব বাবার কাছ থেকে বই নিতেন। নিজেও খুব পড়তেন। বলতে পারতেন, কোন বই ভাল, কোন বই কার পড়া উচিত। সেই কারণে বাবাকে সবাই শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসতেন। আমার বাবার চেহারার মধ্যে অদ্ভুত একটা ব্যক্তিত্ব ছিল। আগে একটা বেসরকারি অফিসে খুব ভাল চাকরি করতেন। গাড়ি ছিল। হঠাৎ একদিন চাকরি ছেড়ে দিলেন। অশিক্ষিত মালিক বাবাকে অপমান করেছিল কী একটা ব্যাপারে। পয়সার গরমে যা-তা বলেছিল। সকলকেই বলত। অন্য সবাই সহ্য করত। প্রতিবাদ করত না। সেই পয়সাঅলা লোকটা কর্মচারীদের কুত্তা ভেবে খুব আনন্দ পেত। জানত, এই বাজারে মোটা টাকার মাইনে ছেড়ে কেউ যেতে পারবে না। টাকার লোভে সবাই গালাগাল হজম করবে আর লেজ নাড়বে। বাবাকে সে চিনত না! নাকের ডগায় চাকরি ছুড়ে ফেলে দিয়ে এক কথায় চলে এসেছিলেন। রইল তোর চাকরি। আমার মা-ও খুব তেজী। মা বলেছিলেন, 'বেশ করেছ। অসম্মানের অন্নের চেয়ে সম্মানের উপোস ভাল।' বাবা আমাকে প্রায়ই বলতেন, 'উৎপল, জীবনটা এমনভাবে তৈরি করো, যাতে স্বাধীন জীবিকায় যেতে পারো। দাসত্ব যেন করতে না হয়। বড় দাস, ছোট দাস, দাসের দাস, পৃথিবীটা দাসে দাসে ভরে গেল। যে যত বড় দাস, তার ভেতরটা তত ছোট। লোকটা একেবারে কেঁচো হয়ে যায়। মাথা উঁচু করে দাঁড়াতেও ভুলে যায়। নিজে প্রতি মুহূর্তে যেমন অপমানিত হয়, অন্যকেও সেইরকম অপমান করে। ভাল খায়, ভাল পরে, গাড়ি চাপে, বিদেশ যায়; কিন্তু সর্বসময় একটা ভয়, একটা আতঙ্ক তাকে তাড়া করে ফেরে।'

ইচ্ছে করলে বাবা অন্য কোথাও চাকরি করতে পারতেন। আর আর করলেন না। করলেন বইয়ের ব্যবসা। কোনও দোকান নয়। বাড়িতেই বই, ম্যাগাজিন

pathagar.net

সব এনে জড় করতেন। তারপর বিশাল একটা কাঁধ-ব্যাগে ভরে বেরিয়ে পড়তেন রাস্তায়। ব্যাগটা কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে থাকত। তেমনি ভারি হতো বইয়ের ওজনে। সেইভাবে বাবা একপাশে একটু হেলে যেতেন। ব্যায়াম করা শরীর। বাবা কিছু গ্রাহ্য করতেন না। মা মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলতেন বাবার কষ্ট দেখে। গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা নেই, বাবা ঘুরছেন পথে পথে। গর্ব করে বলতেন, 'আমি মা সরস্বতীর ফেরিঅলা।' মায়ের চোখে জল দেখলে বলতেন, 'বোকা, সবসময় জানবে, সুখের জীবন ভোঁতা, দুঃখের জীবন ধারাল। দুঃখের যে সুখ সেটা একেবারে খাঁটি, নির্ভেজাল।' বাবা যখন চাকরিতে ছিলেন, তখন আমাদের জীবন ছিল বড়লোকদের মতো। বাড়িতে তিন-তিনজন কাজের লোক। ঝকঝকে খাবার টেবিল। ফ্রিজ। ঠাণ্ডা জলের বোতল। সকালে পুরু মাখন-লাগানো টোস্ট। ডিম, কলা। রাতে মুরগির ঝোল। পদ্মফুলের মতো ফুলকো পাঁউরুটি। সাদা একটা মটোরগাড়ি গোয়ালের গরুর মতো সর্বক্ষণ বাঁধা। কত সুখ ; অথচ সে-সুখ আমরা তেমন বুঝতে পারতাম না। বিরক্তি লাগত, একঘেয়ে লাগত, মন খারাপও হতো। রাগ হতো। আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবরা খুব আসত। অকারণে বাবার প্রশংসা করত। মাকে বলত, মা লক্ষ্মী। এমন দেবীর মতো মেয়ে তারা বইয়ে পড়েছে, দেখেনি কোনওদিন, এই প্রথম দেখছে। মাকে কোনও কাজ করতে দেখতে অন্য বউরা ছুটে এসে বলত, 'ও মা! তুমি করবে কি? আমরা কী জন্যে রয়েছি! অমন চাঁপার কলির মতো আঙুলে কেউ বাসন মাজে! ও মা! তুমি রাঁধছ কেন! রান্নার লোক আসেনি!' কত শত আদিখ্যেতা করত তারা। যেই বাবা চাকরি ছাড়লেন, টান মেরে ফেলে দিলেন জীবনের সব বিলাসিতা, তাদের কারু টিকির দেখাও পাওয়া যেত না। পথেঘাটে দেখা হয়ে গেলে বলত, 'আর একেবারেই সময় পাই না। সাত কাজে ভয়ঙ্কর ব্যস্ত।' বাবা হাসতেন, 'জগতের নিয়ম কিছু পাল্টাল না। যা ছিল তাই আছে। সুখের পায়রারা সুখের পায়রাই রয়ে গেল। দুঃখের দিনে সেই চড়াই পাখি। দিনের পর দিন লুচি-কচুরি, আম, রাজভোগ, কাটলেট, ফিশফ্রাই কত উড়িয়ে গেল! পেটে কিছুই রইল না। বেরিয়ে গেল মল হয়ে। মলত্যাগ না বলে কৃতজ্ঞতা ত্যাগ বলাই ঠিক।'

আমি বোকার মতো একই প্রশ্ন আবার করলুম, 'মারা গেলেন? মারা কেন যাবেন?'

বৃদ্ধা আমাকে তাঁর বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'এ প্রশ্নের উত্তর দেবার ক্ষমতা মানুষের নেই, বাবা।'

'এখন তাহলে কী হবে?'

'একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে।'

প্রৌঢ়া দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে একটু উঁচু গলায় ডাকলেন, 'জগন্নাথ, জগন্নাথ!'

pathagar.net

সুন্দর চেহারার এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। খাটো ধুতি পরা, গায়ে গেঞ্জি, কোমরে তোয়ালে জড়ানো, 'কী বলছ মা ?'

'শোনো, এই ভদ্রলোককে তুমি তুলে বিছানায় শুইয়ে দাও। ইনি মারা গেছেন।'

'বিছানায় শোয়াবো,মা ?'

'অবশ্যই ! আমি যখন মারা যাবো, কোথায় মরবো ? বিছানাতেই মরবো নিশ্চয় !'

বাবাকে দু'হাতে পাঁজাকোলা করে তুলে জগন্নাথবাবু বাইরের ঘরের ডিভানে শুইয়ে দিলেন। মনে মনে ভাবলুম, ইস্, এত ভাল বিছানাটা নষ্ট হয়ে গেল। প্রৌঢ়া চেয়ারে বসে বললেন, 'প্রথমে ভেবেছিলুম, সৎকার সমিতির গাড়ি আনিয়ে তোমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দোবো। তাতে মনে হয়, অসুবিধে হবে। ডাক্তারের ডেথ সার্টিফিকেট ছাড়া তারা হয়তো নিতে রাজি হবে না। আমি আমাদের ডাক্তারকে কল দিচ্ছি, তুমি আর জগন্নাথ গিয়ে মাকে ডেকে আনো। ট্যাকসিতে যাবে, ট্যাকসিতে আসবে।'

সমস্ত টাকা-পয়সা বাবার পকেটে। আমি বাবার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, ভাবছি, কী করে হাত দেবো বাবার গায়ে ! খুব কাঁদতে ইচ্ছে করছে ; কিন্তু কাঁদতে পারছি না। এখন তো কান্নার সময় নেই। সমস্যা সমাধান করতে হবে। অনেক কাজ। জানি, বাবার বুকপকেটে টাকা আছে। মৃত মানুষের পকেট থেকে টাকা নেবো কী করে, চোরের মতো !

মহিলা বললেন, 'তোমার সমস্যাটা বুঝেছি আমি। টাকার সমস্যা ! তোমাকে ভাবতে হবে না, জগন্নাথই সব করবে। জগন্নাথ, গায়ে একটা জামা চড়িয়ে এসো। যাবার পথে ডক্টর মিত্রকে বলে যাও, এখুনি একবার আসতে। কী হয়েছে, কিছু বলার দরকার নেই।'

ট্যাকসি আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়াল। সদর দরজা বন্ধ। মা, মনে হয়, ভেতরের কোনও কাজে ব্যস্ত। দু'তিন বার কড়া নাড়ার পর মা দরজা খুললেন। দেখেই মনে হলো একটু আগে বাথরুম থেকে গা ধুয়ে বেরিয়েছেন। খুব পরিষ্কার দেখাচ্ছে মাকে। চোখে চশমা। এক হাতে চিরুনি। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে চলে এসেছেন। কপালে এখনও পরা হয়নি বিকেলের সিঁদুরের টিপ। সিঁথিতেও লাগানো হয়নি। মা এইসব খুব মানেন। সামনে ট্যাকসি আর অপরিচিত জগন্নাথকে দেখে মা একটু অবাক হলেন, 'কী ব্যাপার ?'

অনেক কষ্টে নিজেকে চেপে রেখে বললুম, 'তুমি একবার চলো মা, এঁদের বাড়িতে বাবা খুব অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছেন।'

pathagar.net

'কী হয়েছে ?' মায়ের মুখটা কালো হয়ে গেল।

'তুমি চলো, শরীর খুব খারাপ লাগছিল বলে শুয়ে পড়েছেন।'

মা তাড়াতাড়ি দরজায় তালা লাগিয়ে ট্যাকসিতে উঠলেন। আমাদের বাড়ির সামনে সন্তোষদার বাড়ি, সিগারেট, ধূপ, দেশলাই-এর দোকান। আমাদের ভীষণ ভালবাসেন। বাবাকে বলেন, 'আমার দেবতা'। মা সন্তোষদাকে বাড়িটার দিকে একটু চোখ রাখতে বললেন।

ট্যাকসি থেকে নেমে আমরা যখন বাইরের ঘরে ঢুকলুম, তখন ডাক্তারবাবুর সব কাজ শেষ হয়ে গেছে। গলায় স্টেথো ঝুলিয়ে গম্ভীর মুখে বসে আছেন সোফায়। একটু দূরে বসে আছেন বৃদ্ধা। বাবার শরীরে গলা পর্যন্ত চাদর টেনে দিয়েছেন। মুখটাই কেবল জেগে আছে। মাকে দেখেই বৃদ্ধা উঠে এসে হাত ধরলেন। তিনি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, মা বললেন, 'জানি। আমি জানতুম, প্রস্তুত ছিলুম। আজ আর কাল। তবে এইখানেই হবে, তা জানতুম না।' মা বাবার পাশে গিয়ে বসলেন। মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন একদৃষ্টিতে। এতক্ষণ মায়ের চোখের জল ছিল না। এইবার জল এল। গাল বেয়ে ঝরঝর করে ঝরে পড়ল। মা বাবার বুকে হাত রেখে বললেন, 'কারোর কথা তুমি শুনলে না। কারোর কথা! এখন একলা আমি করি কী ?'

আর কোনও কথা নয়। মা উঠে দাঁড়ালেন। চোখ মুছে এগিয়ে গেলেন বৃদ্ধার দিকে, 'মা, আপনি আমার যা করলেন, এ যুগে কেউ কখনও করে না। আমি আপনাকে প্রণাম করি।'

বৃদ্ধা মাকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, 'মানুষ মাত্রেই করবে। অমানুষ হলে করবে না। তোমার মতো এমন সংযত মহিলা আমি দেখিনি, মা। অন্য কেউ হলে কেঁদেকেঁটে অস্থির হয়ে যেত। তুমি সাধিকা। ঠিক যেন আনন্দময়ী মা।'

ডাক্তারবাবু ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছেন। জগন্নাথবাবু চলে গেছেন সৎকার সমিতির গাড়ি আনতে। বাবার বইভর্তি ঝোলা-ব্যাগটা রক থেকে তুলে এনে সোফার ওপর রাখা হয়েছে। বৃদ্ধা মাকে জিজ্ঞেস করলেন, টাকার প্রয়োজন আছে ?'

আমি মাকে বললুম, 'বাবার বুকপকেটে অনেক টাকা আছে।'

মা এগিয়ে গিয়ে বাবা যেন বেঁচে আছেন, এইভাবেই বললেন, 'তোমার পকেটে একবার হাত দিচ্ছি, কিছু মনে কোরো না!' বলেই মা চোখের জল চাপবার জন্যে মুখ নিচু করলেন।

ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই মহিলার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। যত খারাপই হোক, এঁর ভাল হবে। নারীশক্তি চিরকাল শুনেই আসছি, এই প্রথম দেখার সৌভাগ্য হলো।'

pathagar.net

বাবার বুকপকেট থেকে প্রচুর কাগজপত্রের সঙ্গে টাকাও বেরলো। মা বললেন, 'খোকা, গুনে দেখ্।' টাকাগুলো আমার হাতে দিলেন। চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। কেমন করে গুনবো। এই সময় টাকাপয়সার কথা ভাবা যায়!

তবু টাকা কি জিনিস! শেষের সময়েও টাকা!

অনেক কষ্টে গুনে বললুম, 'মা, সাড়ে তিন-হাজার।'

'দিদিকে এক হাজার দিয়ে দাও।'

বৃদ্ধা বললেন, 'আমাকে? আমি টাকা নিয়ে কী করবো?'

'এই গদিটা যে পাল্টাতে হবে দিদি।'

বৃদ্ধা যেন ধমকে উঠলেন, 'সেটা আমার ভাবনা। তুমি খুবই শক্ত। তবে একটু বেশি শক্ত। গদির ভাবনাটা এখন না-ভাবলেও চলে। তুমি ফুলের ভাবনা ভাবো।'

এই ধমকটা প্রয়োজন ছিল। মা সেই স্বর্গীয় বৃদ্ধার বুকে মাথা রেখে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠলেন। বৃদ্ধার হাত মায়ের পিঠে। হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'যতটা পারিস, কেঁদে নে, বোন। সব দুঃখ-কষ্ট ধুয়ে যাক।'

সৎকার সমিতির গাড়ি এসে গেল। জগন্নাথবাবু নিজেই বুদ্ধি করে ফুল কিনে এনেছেন। বাবাকে নিয়ে প্রথমে আমার বাড়িতে এলুম। আমরা মাথাটা শূন্য হয়ে গেছে। যে যা বলছেন, 'তাই করে যাচ্ছি যন্ত্রের মতো। সন্তোষদার দোকান বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেল রাজেনবাবুর চায়ের দোকান। বাবা যাঁদের ভালবাসতেন, যাঁদের সত্যিকারের মানুষ ভাবতেন, তাঁরা সবাই এসে গেছেন। ফুলে ফুলে বাবা ঢাকা পড়ে গেছেন। সকলেই বলতে লাগলেন, 'একজন মানুষের মত মানুষ চলে গেলেন।'

কত বড় একটা মিছিল তৈরি হলো। বড় মানুষের মৃত্যু-মিছিল যেরকম হয়। বড় রাস্তার গাড়ি-ঘোড়া সব বন্ধ হয়ে গেল। সকলেই ভাবছেন, কে যাচ্ছে! ওই দুঃখেও আমার কি গর্ব! আমার বাবা যাচ্ছেন। আর কোনওদিন ফিরবেন না।

॥ ২ ॥

আমি আর আমার মা আর একটা বাড়ি আর অনেক বই, আর পাঁচ হাজার টাকা, এই নিয়ে শুরু হলো আমাদের জীবন। নতুন জীবন। মা বললেন, 'খোকা, আমাদের এখন খুব কষ্ট করতে হবে। পাঁচ হাজারে পাঁচ মাস চলবে। তারপর? বিরাট এক প্রশ্ন। জানালার বাইরে শহর কলকাতা তালগোল পাকিয়ে সারাটা দিন ছুটছে। টাকায় ছোটাচ্ছে। টাকা ধরার জন্যে ছুটছে মানুষ। সেই রাত বারোটার পর একটু শান্ত হয়। আবার ভোর না হতেই শুরু হয়ে যায়।

মা বাবার হিসেবের খাতাটা খুলে বসলেন। এখন বাইরের বাতাস থাকলে

pathagar.net

আমরা পাখা খুলি না। পাখায় খুব বিদ্যুৎ খরচ হয়। আলোও আমরা হিসেব করে জ্বালি। যেখাতে যতটুকু কাজ সেইখানে ততটুকু আলো। সব দিক থেকে খরচ কমিয়ে আনা হচ্ছে। সরু চালের বদলে, বাজার থেকে মোটা চাল কিনে এনেছি। অল্প খেলেই অনেকক্ষণ পেট ভরে থাকে। ডাল, ভাত, পাতিলেবু, আর শাকপাতার একটা ঘ্যাঁট। মা আমার অসম্ভব ভালো রান্না করতে পারেন। কোথায় লাগে অমৃত। এক টিন ছাতু কিনে রাখা হয়েছে। পেট খালি হলেই ছাতুর একটা ছোটমতো তাল ঢুকিয়ে দি, সব ঠাণ্ডা। আমরা যখন খুব বড়লোক ছিলুম, তখন আমাদের অনেক ভাল ভাল কাপ, ডিশ, স্যুপ খাবার বাটি, ডিনার প্লেট, সাইডডিশ, সব কেনা হয়েছিল, ঝকঝকে কাঁটা-চামচ। খাবার ঘরের আলমারিতে সব সাজানো আছে। দেখি আর হাসি। ওসবে কি হয়! না থাকলেই বা কিসের অসুবিধে! আমরা বাবা যে আদর্শ রেখে গেছেন, তা সোনার চমচের চেয়েও দামী। মুরগির ঠ্যাং-এর চেয়ে গাছের ডাঁটা অনেক সুস্বাদু। বাবার একটা কথা সবসময় আমার কানে বাজে, 'খোকা, হেরে যেও না। পৃথিবী সব সময় তোমাকে হারিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। তুমি এগোতে চাইলে পেছন থেকে টেনে ধরবে। মনের জোরে এগিয়ে যাবে। কেবল বলবে, আমি হারবো না। হারবো না আমি কিছুতেই। খুব কম মানুষই তোমাকে সাহায্য করবে। মানুষের ওপর নির্ভর করবে না। একলা চলো রে।'

হিসেবের খাতায় দেখা গেল, অনেকের কাছেই বাবার টাকা পাওনা আছে। যোগ করে দেখলুম, প্রায় তিরিশ হাজার টাকা তো হবেই। বাবার আগে অফিসে এক পশুপতি বোস মেয়ের বিয়ের জন্যে দশ হাজার টাকা নিয়েছিলেন। মা বললেন, 'তুই কালই একবার বাবার পুরনো অফিসে যা। গিয়ে খোঁজ কর তো। এতগুলো টাকা, এই দুঃসময়ে পেলে কাজে লাগবে।' মনে মনে ভাবলুম, বাবা বলতেন, 'টাকা যখন ধার দেবে, মনে করবে একেবারে দিয়ে দিলুম। খুব কম মানুষই ধার শোধ করতে চায় বা পারে।'

পরের দিন, বারোটা-একটার সময় বাবার পুরনো অফিসে গেলুম। লিফ্‌টের সামনে দাঁড়িয়ে মন যেন আর চাইছিল না, ছোটলোকের ওই অফিসে ঢুকতে। বাবা সেই-যে একবার বেরিয়ে এসেছিলেন, আর কোনওদিন ঢোকেননি। সেই শেষ। গুড বাই চাকরি। মনকে অনেক বুঝিয়ে-টুঝিয়ে সাততলায় নিজেকে টেনে তুললুম। ঝকঝকে অফিস। কোম্পানির অবস্থা বেশ ভালই যাচ্ছে। দু'নম্বরি পয়সায় খুব বোলবোলা। আসার সময় পার্কিং-এ দেখলুম ঝকঝকে সব মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সামনেই রিসেপশন। সেজেগুজে এক মহিলা বসে আছেন। নানা রঙের টেলিফোন। সামনে দাঁড়াতেই খুব স্টাইলে, ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী চাই?' ভেবেছিলেন, ইংরেজি শুনে আমি ঘাবড়ে যাবো। আমার পরনে একটা কম দামের ট্রাউজার, একটা

pathagar.net

টি-শার্ট। বাবার শ্রাদ্ধের পর মাথায় এখনও পুরো চুল গজায়নি। একটা আনস্মার্ট মধ্যবিত্ত বাঙালি ঘরের ছেলে। আমার বাবা বলতেন, 'বাইরেটা ঢেকে রাখবি, বুঝতে দিবি না তোর ভেতরে কি আছে।' আমিও চোস্ত ইংরেজিতে বললুম, আমি কি চাই! মহিলা একটু ঘাবড়ে গেলেন। এতটা আশা করেননি। ভদ্রমহিলা তখন আমাকে বসতে বললেন। ইংরেজি ছেড়ে বাঙলা ধরলেন। বললেন, 'আমি তো বেশিদিন আসিনি। পুরনো কারোকে তেমন চিনি না।' একটু দূরে একটা টুলে মাঝবয়সী একজন বেয়ারা বসেছিলেন। তিনি বললেন, 'পশুপতিবাবুর চাকরি শেষ হয়ে গেছে। তা প্রায় তিন বছর তো হলো।' ভদ্রলোক আমাকে ঠিকানা এনে দিলেন ভেতর থেকে।

সেই মুরারিপুকুরের একেবারে শেষ প্রান্তে পশুপতিবাবুর বাড়ি। সদর দরজা খোলাই ছিল। বনেদী বাড়ি, ভাগভাগি হয়ে গেছে। অনেকটা ভেতরে পশুপতিবাবুর অংশ। তাঁর স্ত্রী বেরিয়ে এসে বললেন, 'কী চাই বাবা!'

''আমি পশুপতিবাবুর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।'

'এসো।'

মহিলা আমাকে ভেতরের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। দেয়ালে রঙ নেই। মেঝেতে পালিশ নেই। ভদ্রলোক সাবেক আমলের একটা খাটো পাথরের মতো। পড়ে আছেন। ফুটফুটে একটা বাচ্চা মেয়ে আপন মনে কবিতা পড়ে যাচ্ছে। এক বছর হলো পশুপতিবাবু এইভাবে শুয়ে আছেন। পক্ষাঘাত হয়ে গেছে। ভদ্রমহিলা বারে বারে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, 'কেন আমি এসেছি! কে আমি!' বাবার নাম বলতেই চিনতে পারলেন। পশুপতিবাবুর মুখ দিয়ে অব্যক্ত একটা আওয়াজ বেরলো। কিছু বলতে চাইলেন। ভাষা নেই, শুধু শব্দ। মহিলা বললেন, 'তুমি বসো বাবা। তোমাকে কত ছোট দেখেছি। কত বড় হয়ে গেছো! বাবা কেমন আছেন?'

যেই শুনলেন, বাবা আর নেই, মুখটা কেমন করুণ হয়ে গেল। পশুপতিবাবু আবার একটা শব্দ করলেন। বাচ্চা মেয়েটি বিরক্ত হয়ে বললে, 'তুমি চুপ করো না, দাদু। আমি তোমাকে ছড়া শোনাচ্ছি না? কথা বলতে পারে না, খালি খালি কথা বলছে।'

ফিরে এসে মাকে সব বললুম। একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, ধারদেনা করে। ঘটা করে। সেই মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। রেখে গেছে একটি মেয়ে। পশুপতিবাবুর প্যারালিসিস। মা বললেন, 'ছেড়ে দে। ওই টাকার আশা আর করিসনি। উপায় থাকলে আরও কিছু টাকা দিয়ে আসা যেত।'

বাকি যাঁদের কাছে টাকা পাওনা ছিল, তাঁরা সব বাবার বইয়ের খদ্দের। মা আমাকে একটা লিস্ট তৈরি করে দিলেন। প্রায় জন কুড়ি-পঁচিশের নাম।

pathagar.net

কলকাতার বিভিন্ন অফিসে। বেরোচ্ছিই যখন, বাবার ঝোলাটা কাঁধে নি, যদি কেউ কিছু বই নেন। প্রথমেই গেলুম প্রশান্ত মিত্রের অফিসে। প্রায় আড়াই হাজার টাকার মতো পাওনা। প্রশান্ত মিত্র কলকাতার একজন বড় অ্যাটর্নি। তাঁর বড়বাবু প্রায় একঘণ্টা বসিয়ে রাখলেন অকারণে। ক্ষমতা দেখালেন। অবশেষে প্রশান্তবাবুর কামরায় ঢোকার অনুমতি পেলুম। ভদ্রলোক একটা তালশাঁসে কামড় মারতে মারতে বললেন, 'অ, তোমার বাবা মারা গেছেন ? ভেরি স্যাড, ভেরি স্যাড। তা অল্প বয়সেই বাবাকে হারালে ! এতে তোমার ভালও হতে পারে, খারাপও হতে পারে। হয় মানুষ হবে, না হয় বখে যাবে। মানুষ হবারই চেষ্টা করো। কী জন্যে এসেছ ? সাহায্যের জন্যে ?'

তারিয়ে তারিয়ে সন্দেশ খাচ্ছেন। একবার বসতেও বললেন না। এই হলো বড়লোকদের ধরন। গা জ্বলে যাচ্ছিল।

'আজ্ঞে না, সাহায্যের জন্যে আসিনি ! বাবা আপনার কাছে আড়াই হাজার টাকা পেতেন। আপনি বই নিয়েছিলেন।'

'ইজ ইট ? তাই নাকি ? তুমি সেই টাকাটা নিতে এসেছ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'একটু অসুবিধে আছে। আমার দেওয়ায় নয়, তোমার নেওয়ায়।'

'টাকা নেওয়ায় কিসের অসুবিধে ?'

'অনেক অসুবিধে। তোমার বাবার নামে কোম্পানি। তোমাকে আগে সাকসেসান সার্টিফিকেট নিতে হবে। আগে আইনমোতাবেক উত্তরাধিকারী হও, তারপর দেনাপাওনা। ধরো, তোমাকে আমি টাকাটা দিলুম, তারপর কেউ যদি এসে বলে, আমিই হলুম উত্তরাধিকারী তাহলে কী হবে ? বেআইনি কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হয় ?'

'আমি বসতে পারি ?'

'বসে কী হবে ? ওভাবে টাকা আমি দোবো না। তুমি আগে আইনের জট ছাড়িয়ে এসো।'

আমি চেয়ার টেনে বসলুম। ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছেন। ঝোলা থেকে একটুকরো কাগজ বের করে লিখলুম, শ্রীপ্রশান্ত মিত্রকে সন্দেশ খাওয়ার জন্যে আড়াই হাজার টাকা দান করলুম। উৎপল চট্টোপাধ্যায়। পিতা প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়। কাগজটা ভদ্রলোকের সামনে ফেলে দিয়ে আমি দরজার দিকে এগোচ্ছি, ভদ্রলোক হুঙ্কার ছাড়লেন, 'শোনো ছোকরা, ঔদ্ধত্যের একটা সীমা আছে।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে বললুম, 'ছোটলোকমিরও একটা সীমা আছে।'

ভদ্রলোক জোরে ঘণ্টা বাজালেন। বেয়ারা দিয়ে আমাকে বের করে দেবেন। হঠাৎ, আমার ভেতরে বসে কে যেন বললেন, 'বল্, আপনার খুব দুঃসময় আসছে।' আমি বললুম, 'আপনি যত পারেন ঘণ্টা বাজান, তবে শুনে রাখুন,

pathagar.net

খুব বড় রকমের একটা বিপদ আসছে আপনার। সাবধান।'

ভদ্রলোক দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'গেট আউট। গেট আউট আই সে।'

আশ্চর্য ব্যাপার, আমি শুধু অবাক নয়, বেশ ভয়ও পেয়ে গেলুম। ভদ্রলোক একটু আগে সন্দেশ খাচ্ছিলেন। সেই সন্দেশই বোধহয় মুখে ছিল। জোরে গেট আউট বলায় গলায় আটকাল। কাশতে শুরু করলেন। সাঙ্ঘাতিক কাশি। কাশতে কাশতে দম আটকে যাবার মতো হলো। এদিকে ঘণ্টি শুনে বেয়ারা ছুটে এসেছে। আমি জানি, বড়লোকরা বাইরে খুব গোলগাল দেখতে হলেও, ভেতরে ফোঁপরা। তাদের দুটো হার্টই থাকে না। যে হার্ট ধুকপুক করে সেটাও অকেজো, আর যে হৃদয় থাকলেও মানুষের দুঃখকষ্ট বোঝা যায়, সেটাও থাকে না। আমার আর দেখার দরকার নেই। সোজা রাস্তায়। কৌতূহল হলো, শেষটা কী হয় দেখার। হাইকোর্টের তলায় অজস্র মানুষের ভিড়ে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। আধঘণ্টার মতো হয়েছে, ওঁয়া ওঁয়া করে একটা অ্যাম্বুলেন্স আসছে। হাইকোর্টের রাস্তায় ঢুকে নীরব হয়ে গেল। এখানে শব্দ চলবে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই অ্যাম্বুলেন্সে শুয়ে প্রশান্ত মিত্র হাসপাতালের দিকে, কি নার্সিংহোমের দিকে চলে গেলেন। আমার আর তখন আনন্দ নয়, বেশ ভয় করছে। হাত-পা প্রায় ঠাণ্ডা। ভাবছি, আমার ওপর প্রেতাত্মার ভর হলো নাকি!

রাতে মাকে ঘটনাটা বললুম। মা বললেন, 'ও কিছু নয়। ঝড়ে কাক মরে ফকিরের কদর বাড়ে। একে বলে কাকতালীয়।'

সেই বৃদ্ধা মহিলা একদিন এলেন, সঙ্গে সেই জগন্নাথদা।

ভদ্রমহিলার নামটা ভীষণ সুন্দর, শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা মাসি। মাসিতে ওনার আপত্তি।

'তুই আমাকে মা বলবি। কেউ আমাকে মা বললে ভীষণ ভাল লাগে।'

মা বললেন, 'আমি আপনাকে মা বলব। আপনাকে দেখলে মনে হয় আপনি শুধু আমার মা নয়, জগতের মা।'

আমাদের বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখে বললেন, 'ভীষণ সুন্দর করে রেখেছ। ঠিক এইভাবে রাখার চেষ্টা করো। কোনওভাবে দারিদ্র্যকে ঢুকতে দিও না।'

মা বললেন, 'সেইটাই তো ভয়। ঠেকাবো কেমন করে! কোনও তো রোজগার নেই। ছেলেটা তো ছাত্র! কবে পাস করবে, চাকরি করবে, রোজগার করবে, কিছুই জানি না। অতদিন টানবো কী করে?'

'দারিদ্র্যকে ঠেকাতে হবে কর্ম দিয়ে। ওর বাবার ব্যবসাটাকে বড় করা যায় না?' অনেকক্ষণ আলোচনা হলো। সন্ধে গড়িয়ে রাত হলো। আমরা চারজন একের পর এক পরিকল্পনা করে চলেছি। আমদের শত্রু হলো সময়। এক-একটা দিন যাবে আমাদের টাকা কমবে। টাকার চৌবাচ্চায় টাকা ঢালতে

pathagar.net

হবে। এমনি করে আরও দশটা বছর কাটাতে হবে। তিন হাজার ছশো দিন।

শ্রদ্ধা মা বললেন, 'ভাবিসনি বেশি। তাহলে একটা গল্প শোন্। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একটা উড়োজাহাজ সাহারা মরুভূমির ওপর ভেঙে পড়ল। একজন মাত্র পাইলট। তিনি অক্ষত অবস্থায় প্যারাস্যুট নিয়ে লাফিয়ে পড়ে বেঁচে গেলেন। বাঁচলে কী হবে! দিগ্‌দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি। ম্যাপ নেই। কম্পাস নেই। কোনও রসদ নেই। কেবল তিনি আছেন আর আছে মরুভূমি। লোকালয় কোথায়, কত দূরে কিছুই জানা নেই। মাথার ওপর সাহারার সূর্য। পায়ের তলায় উত্তপ্ত বালি। জল নেই, খাবার নেই, কোনও সঙ্গী নেই। অবস্থাটা একবার ভাবো। সেই মানুষটির মাথা ঘুরে গেল। তিনি ভাবলেন, বিমান দুর্ঘটনা থেকে বাঁচলেও, রোদে পুড়ে, অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে কেউ তাঁকে বাঁচাতে আসবে না। মৃত্যু নিশ্চিত। চারপাশে বালি আর বালি, আগুনের মতো জ্বলছে। পরের পর, পরের পর, ঢেউ খেলে পড়ে আছে বালিয়াড়ি। উটের পিঠের মতো বালির পাহাড়। এত উঁচু যে আকাশ ঢাকা পড়ে গেছে। বাতাসে বালির ঘূর্ণি। কথায় বলে, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। লোকটি যে-কোনও একদিকে হাঁটা শুরু করলেন। মাথার ওপর সূর্য। বোঝার উপায় নেই যাচ্ছেন কোনদিকে! তবু হাঁটছেন সেই বিমানচালক। কর্মই ধর্ম, ধর্মই কর্ম। হয়তো গীতার কথাই ঠিক—কর্মে তোমার অধিকার, কর্মফলে নয়। হাঁটা যাক, তারপর দেখা যাক কী হয়, কিন্তু কত দূর হাঁটবেন! চারপাশে অসীম বালির সমুদ্র। আচ্ছা! প্রথমে ওই বালিয়াড়িটা পর্যন্ত যাওয়া যাক। লোকটি হাঁটতে হাঁটতে প্রথম বালিয়াড়ি পর্যন্ত গেলেন। সেখান থেকে দ্বিতীয়। দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়। তৃতীয় থেকে চতুর্থ। চতুর্থ থেকে পঞ্চম। দু'মাস পরে মানুষটি লোকালয়ের দরজায় এসে জ্ঞান হারালেন। শুকনো এক কঙ্কাল। রোদে পুড়ে কালো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে তিন মাস লাগল তাঁর সম্পূর্ণ সুস্থ হতে। এরপরে তিনি একটি বই লিখলেন, ভারি সুন্দর। সেই লেখায় তিনি বললেন, জীবনের পথ অতি দীর্ঘ, ওই মরুভূমির পথের মতোই। চলার সময় গোটা পথের কথা চিন্তা করলে, ভয় পেয়ে যাবে, আর হাঁটতেই পারবে না। কৌশলটা হলো, প্রথম ল্যাম্পপোস্টটির কথা চিন্তা করো। দূরে প্রথম যে ল্যাম্পপোস্টটি চোখে পড়ছে, মনে করো, তুমি সেই পর্যন্তই যেতে চাও। সেই অবধি গিয়ে পরেরটার কথা ভাবো। এইভাবে প্রথম থেকে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়, দেখবে একদিন তুমি পৌঁছে গেছ পথের শেষে। যেমন আমি মরুভূমি পাড়ি দিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলুম লোকালয়ে। তাঁর বইটার নাম থিঙ্ক অফ দি নেক্সট ল্যাম্পপোস্ট। পরের বাতিস্তম্ভের কথা ভাবো। পুরো পথটা ভেবো না। তোকে এই গল্পটা কেন বললুম জানিস, তুই শুধু কালকের কথা ভাব। কাল গেলে আবার কাল। কাল কাল করতে করতে পৌঁছে যাবি

pathagar.net

মহাকালে। আর, একটা বিশ্বাস, একটা আদর্শকে ধরে থাক। সেইটাই হলো চলার শক্তি। আর, আমাকে দেখ, কেউ কোথাও নেই আমার, আমি কিন্তু মরে যাইনি, বেশ ভালই বেঁচে আছি। আমি নিজেই রোজগার করি---আমার একটা ছোট ছাপাখানা আছে। সেখানে তিনজন মহিলা আর এই জগন্নাথ কাজ করে। ডাল, ভাত, একটা তরকারি আর বছরে চার-পাঁচখানা কাপড়, এই তো আমাদের জীবনের প্রয়োজন। তোমার বাবা আমাকেও তোমাদের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে গেছেন, তোমাদের ভয় কিসের! সবই ঠিক হয়ে যাবে!

শ্রদ্ধা মা চলে গেলেন। একটা শক্তি দিয়ে গেলেন মনে। সত্যিই তো, কেউ কি সহজে মরতে চায়? বাবার বইয়ের ব্যবসাটাকেই ধরে থাকি। সারাদিন ঘুরবো, রাতে পড়ব। তিন-চার ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট। ঘুম একটা অভ্যাস। বাবা কোথা থেকে বই তুলতেন আমি জানি। কাদের বই দিতেন, তাও আমি জানি।

কলকাতার সবচেয়ে বড় ইংরেজি বইয়ের ব্যবসায়ী একজন অবাঙালি। গোলগাল সুন্দর চেহারা। পাকা পেয়ারার মতো গায়ের রঙ। এমনি দেখলে মনে হবে ভীষণ গম্ভীর। একটু কথা বললেই হাসবেন। আর হাসলে তাঁর ওই গম্ভীর চেহারা থেকে বেরিয়ে আসবে সুন্দর এক বন্ধু। ভদ্রলোকের নাম, ঘনশ্যাম যোশী। যোশীজি আমার নাম জানেন। 'বসো উৎপল।' একটু ব্যস্ত ছিলেন। কাজ শেষ হবার পর বাবার কথা জিজ্ঞেস করলেন।

'বাবা নেই।'

ভদ্রলোক চমকে উঠলেন। মুখে একটা বেদনার ছায়া নেমে এল।

'তুমি কি চালাবে ব্যবসাটা!'

'তা ছাড়া তো আমাদের সংসার চলবে না!'

'তোমাকে আমি সাহায্য করবো। বাইরের সমস্ত পাবলিশার্সের আমি এজেন্ট, এমন কোনও ভাল বই নেই, যা আমার কাছে আসে না। তোমার বাবার কাছে আমার কিছু টাকা পাওনা আছে। সে টাকা তোমাকে এখন দিতে হবে না। এক বছর তোমাকে নতুন বইয়ের জন্যে কোনও টাকা দিতে হবে না। ওই টাকাটা তুমি ব্যবসায় রোল করাও।'

'বাবার মতো তো আমার জ্ঞান নেই। কী বই বেরোচ্ছে? কোন বই খুব ভাল। কোন বই লোকে চাইবে?'

'তোমাকে আমি জ্ঞানও ধার দোবো। ইংরেজি কেমন জানো?'

'কাকু, ওইটা বাবা আমাকে ভালই শিখিয়েছেন।'

যোশীজিকে কাকু বলায় ভীষণ খুশি হলেন। বড় বড় চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'ইউ আর মাই সান। তোমাকে আমি তৈরি করে দেবো। ইংরাজি যখন জান, তোমার সমস্যা তো অনেক কমে গেল। তুমি এখানে আসবে। এই ঘরে, ওই চেয়ারে বসবে। তোমাকে আমি টাইমস লিটারারি

pathagar.net

সাপ্লিমেন্ট, লিটারারি ওয়ার্ল্ড, পাবলিশার্সদের লিটারেচার, সব দিয়ে দেবো। বসে বসে পড়বে। যত পড়বে, ততই তুমি জানতে পারবে বুক ওয়ার্ল্ডের খবর। আজকে তোমাকে আমি কুড়িখানা বই দিচ্ছি। একেবারে বাছাই করা। তুমি বসে বসে সব কটা বইয়ের মলাটের পেছন দিকটা পড়ে ফেল। জানতে পারবে কোন বইয়ে কী আছে। আমাদের দেশের মানুষ এই সব লেখকের বই খুব পছন্দ করেন।

চকচকে মলাটের কুড়িখানা বই নিয়ে আমি বসে গেলুম কোণের একটা টেবিলে। ছোট্ট একটা খাতা বের করে নোট নিতে শুরু করলুম। কত রকম বিষয়ে বই, রাজনীতি, ভ্রমণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, নভেল, থ্রিলার, জীবনী। একসময় যোশীজি আমার কাছে একটা খাবারের বাক্স পাঠিয়ে দিলেন।

সন্ধের মুখে রাস্তায় নেমে এলুম। ঝোলা বেশ ভারি। কুড়িখানা বই ঢুকেছে। কাল আমাকে সকালেই বেরোতেই হবে। একদিনে কুড়িখানা বই যদি কেটে যায় আমার খুব ভালো লাগবে। নিজের ওপর একটা বিশ্বাস এসে যাবে।

খিচির মিচির কলকাতা। বাসে-ট্রামে অফিস ভাঙা ভিড়। এমনিই চিঁড়ে চ্যাপ্টা করে দেয়, কাঁধে অত বড় একটা ঝোলাব্যাগ। বাবা বলেছিলেন, ফেরিওয়ালার পা দুটোই ভরসা। হাঁটছি তো হাঁটছিই। পথ আর ফুরোয় না। বাবার সঙ্গে যখন হাঁটতুম, তখন পথ কখন ফুরিয়ে যেত, টেরও পেতুম না। কত গল্প, কত মজার মজার ঘটনা। পথ চলতে চলতে ইংরেজি শেখাতেন। ইংরেজিতে কথা হতো আমাদের দুজনের। ইতিহাস আলোচনা হতো। দুজনে দুজনের জেনারেল নলেজ পরীক্ষা করতুম। বাবা নেই, আজ আমি একা। মাথা খুলে গেল। বাবা শরীরে নেই ঠিকই কিন্তু যতদিন আমি পৃথিবীতে আছি ততদিন আমার বাবাকেও থাকতে হবে, আমাকে ঘিরে আমার ভেতরে সেই অদৃশ্য বাবার সঙ্গে গল্প করতে করতে ভবিষ্যতের প্ল্যান করতে করতে কখন বাড়ি পৌঁছে গেলুম বুঝতে পারলুম না। ঠনঠনের কাছাকাছি এসে বাবা আমাকে বললেন, চলো, প্রণাম করে আসি। আজ খুব ভাল দিন। যোশী তোমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবেন।

কাঁধে অত বড় একটা বোঝা নিয়ে সেই কোথা থেকে হাঁটছি। বাড়িতে এসেই ঠাণ্ডা মেঝেতে উল্টে পড়লুম। আজকাল তো সবেতেই গোলমাল সামান্য আলো কি একটা পাখা থাকলেও চালাবার উপায় নেই। বিদ্যুৎ এই আছে তো এই নেই। মা একটা হাতপাখা এনে মাথার কাছে বসলেন। মায়ের মন তো, আমার এই কষ্ট আমি সহ্য করতে পারলেও মা সহ্য করতে পারছেন না। একসময় আমি ইংরেজি স্কুলে পড়তুম। ডিম, মাখন, আইসক্রিম ছিল আমার খাদ্য। এক মাইলও হাঁটতে হতো না। সব সময় গাড়ি।

মা বললেন, এই কাজ তোর শরীর নেবে না, খোকা।

Pathagar.net

নেবে মা। জানোই তো কথায় আছে শরীরের নাম মহাশয়, না সওয়াবে তাই সয়। অত আদুরে করে রাখলে কেউ খাওয়াবে না, মা। বাবার কথা চিন্তা করো। কী ছিলেন, কী হয়েছিলেন। একজন অত বড় অফিসার থেকে ফেরিওলা। শেষে এই বইয়ের ঝোলা কাঁধে নিয়ে পথের ধারে মৃত্যু। এই ঝোলা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বাবার কাঁধে ছিল। এই ব্যবসাটা আমার কাছে ব্যবসা নয়, ব্রত। এ আমি ছাড়তে পারবো না, মা।

মা আমার কপালে হাত রাখলেন। নরম। ঠাণ্ডা। ঘুম এসে গেল। আমার ঘুমোতেও লজ্জা করে আজকাল। দিন যদি চব্বিশ ঘণ্টার চেয়েও লম্বা হতো আমার পক্ষে ভাল হতো। লেখাপড়া তো আর ছাড়তে পারবো না। বাবা বলেছিলেন, হেরে যেও না। শিক্ষিত বড়লোক, অশিক্ষিত বড়লোক, যারা আমার বাবাকে অপমান করেছিল, মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল, বলা চলে খুনই করেছিল, তাদের দেখিয়ে দিতে হবে তোমাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। একটা পরিবারকে তোমরা ভিখিরি করতে চেয়েছিল, প্রায় করেও এনেছিলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলে না।

রাত দেড়টার সময় আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম। প্রাইভেটেই পরীক্ষা দেবো। এছাড়া আমার কোনও উপায় নেই। ইতিহাস আমার ভীষণ ভালো লাগে। রাত যত বাড়তে থাকে, আমি ক্রমশই সরে যেতে থাকি সময়ের দূর অধ্যায়ে। কত দিন ধরে মানুষ পথ হাঁটছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে আজ এই বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে। এ চলার শেষ নেই। সভ্যতার উত্থান পতন। এক রাজা যায় তো আর এক রাজা আসে। সিংহাসন খালি থাকে না। এই মানুষের অতীত থেকে বর্তমান হেঁটে আসার কাহিনী পড়তে আমার রোমাঞ্চ হয়। আমার স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক দ্বিজেনবাবু আমাকে বলেছিলেন, তোমার লাইন ইতিহাস। আমি হয়তো থাকব না। তুমি চালিয়ে যেও। মডার্ন হিস্ট্রি নেবে। রিসার্চ করবে। স্কলারশিপ নিয়ে চলে যাবে আমেরিকা। পেনিসিলভ্যানিয়া। বিদেশে গবেষণার অনেক সুযোগ, অধ্যাপনারও অনেক সুখ। আমি শুয়ে শুয়ে আমার ঈশ্বর, আমার পিতাকে ডাকি—জীবনের সমস্ত নোংরামি আর তুচ্ছতা থেকে আমাকে বেরোবার পথ করে দিন। বাবা আমাকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন।

মনু হতে মহাভারত সকল শাস্ত্রে কয়
সহজ তো নয় ধর্মপথে হাঁটা।
এ তো কেবল হৃদয় নিয়ে নয়কো কাঁদাকাটা।
যে করে ভয় দুঃখ নিতে দুঃখ দিতে,
সে কাপুরুষ কেনই আসে পৃথিবীতে ?

pathagar.net

বাবা আমাকে সাধু সেন্ট লরেন্সের কথা বলতেন। সর্বদাই যিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকতেন। জীবনের প্রথম ভাগে বড়লোকের চাকর ছিলেন। মার খেতেন কাজে ভুল করার জন্যে। পরে তিনি রাঁধুনির কাজ করেছেন। হঠাৎ একদিন তাঁর জীবনে অদ্ভুত এক পরিবর্তন এল। তিনি ছিলেন ফ্রান্সের অধিবাসী। প্রচণ্ড শীত। বরফে সব ঢেকে গেছে। সেন্ট লরেন্স বলতেন, ঈশ্বর আমি জানি, তুমি আমাকে অনেক দুঃখকষ্টে ফেলবে। সেইটাই আমার কর্মফল। কিন্তু এও জানি, তুমি আমাকে সহ্য করার শক্তিও দেবে।

সেন্ট লরেন্সের মতো আমিও বলি, ভগবান তুমি আমাকে আরও দুঃখ দাও : কিন্তু সহ্য করার শক্তিও দিও। তা না হলে ভেসে যাবো। এই সব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়লুম।

॥ ৩ ॥

সকাল সাড়ে আটটা-নটার সময় অদ্ভুত চেহারার এক ভদ্রলোক এল। দেখেই মনে হলো লোকটা সুবিধের নয়। ভাগ্য ভাল, সেই সময় আমার শ্রদ্ধা মা ছিলেন। আমাদের বাইরের ঘরে বসে এদিক ওদিক চাইছে চোরের মতো। বললে, 'খুব গোপনীয় কথা আছে তোমার মায়ের সঙ্গে।'

শ্রদ্ধা মা মাকে বললেন, 'তোমাকে যেতে হবে না। আমি দেখছি।'

লোকটি শ্রদ্ধা মাকে বললে, 'খুব একটা সুখবর আছে, ম্যাডাম।'

'কী সুখবর, স্যার ?'

শ্রদ্ধা মায়ের কাটা-কাটা প্রশ্ন শুনে লোকটা একটু চুপসে গেল। তবু নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, 'চার থেকে সাড়ে চার লাখ টাকা।'

'এই বাজারে সাড়ে চার লাখ নস্যি।'

'তিন কাঠা জমি আর এই বাড়ি বড়জোর পাঁচ লাখ তাও বেশি হয়ে যায়।'

'চিমনলাল ষাট লাখ বলে গেছেন। আর একটু চাপাচাপি করলে সত্তরে উঠবে।'

'ও চিমনলাল এরই মধ্যে এসে গেছে। ওর একেবারে বেড়ালের নাক। আমরা সবে কাল খবরটা পেলুম।'

'কী খবর ? যে এই বাড়িটা বিক্রি হবে ?'

'উঁহু, আমরা তো ওই খবরে কাজ করি না। আমাদের খবর হলো, বাড়ির কর্তা মারা গেছে। পড়ে আছে এক বিধবা আর এক নাবালক ছেলে। তার মানে এক বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবার পথে বসতে চলেছে। ভীষণ বিপদে পড়েছে। তখনই আমরা সাহায্য করতে ছুটে আসি।'

'ও এটা হলো সাহায্য ?'

pathagar.net

'সাহায্যই তো। এই বাড়ি আপনাকে কী দিচ্ছে ? কিছুই না। বাড়ি হলো বাঙালির ব্যামো। বাড়ি করবো, বাড়ি করবো। একগাদা টাকা বাড়িতে ব্লক হয়ে গেল। আচ্ছা সাড়ে চার নয়, ঢনঢনিয়াকে বলে কয়ে আমি পাঁচই করে দিলুম। ও আমার কথা শুনবে। সেই পাঁচ ব্যাঙ্কে ফিক্সড করে দিলে মাসে মাসে সুদের টাকায় তোফা সংসার চলে যাবে। যারা বুদ্ধিমান, তারা সব ভাড়া-বাড়িতে থাকে, আর নগদ টাকা সুদে খাটায়। বাড়ি রাখতে বাড়ির পেছনে মাসে মাসে কত টাকা যায়, সে হিসেব রেখেছেন। এই রকম একটা জায়গা ধরে রাখাটাও অপরাধ। এখানে একটা বহুতল বাড়ি হতে কত লোক আশ্রয় পাবে। আচ্ছা যাক, ঢনঢনিয়াকে বলে বিনা পয়সায় আপনাদের একটা ফ্ল্যাটও পাইয়ে দোবো। সব মিলিয়ে তাহলে দশ লাখ হলো। পাঁচ লাখ ক্যাশ, পাঁচ লাখ ফ্ল্যাট। চিমনলাল লোক ভাল নয়, মা। ঢনঢনিয়া দেবতা। মানুষের মতো দেখতে হলেও একেবারে তুলসীপাতা। কাছে গেলে মনে হয় মন্দির। ফুল বেলপাতা একসঙ্গে চটকে দিলে যে রকম গন্ধ বেরোয়, সেইরকম গন্ধ।'

'সব শুনলুম। আর ভালো লাগছে না। এই বাড়ি বিক্রি হবে না। কোনও মতেই না।'

'এই বার তাহলে বলি। শেষ কথা। প্রেমসে কোনও কাজ না হলে জোরসে আমরা সেই কাজ করি। ঢনঢনিয়া বলেন চিল আমাদের দেওতা। চিল যখন ছোঁ মারে, তখন কিছু যদি না-ও পায় তো কুটো নিয়ে ওড়ে। তা এখানে তো মাল আছে। আমরা এখন করব কী ? আমাদের পার্টিকে লেলিয়ে দোবো লুঃ লুঃ। মাসখানেক তাদের লাগবে। তারপর আপনারা নিজেরাই বাপ বাপ বলে উঠে পালাবেন।'

শ্রদ্ধা মা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আচ্ছা আপনি তাহলে আসুন।'

'হ্যাঁ, আসবোই তো। আবার আসবো। এসে দাঁড়াবো—একতলায় দোতলায়, তিনতলায়, পাঁচতলায়, শেষ সাততলায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়বো, গুডবাই, গুডবাই। আমাদের ব্রত, কলকাতায় একটাও বাঙালি ছারপোকা যেন না থাকে। মচ্ছিখোর, গন্ধী বাঙালি।'

'আপনাদের ব্রত সফল হোক, এই কামনা করি। আপনি তো বাঙালি ?

'বাঙালি হয়ে জন্মেছিলুম, এখন বাঙালিকে ঘেন্না করতে করতে অবাঙালি হয়ে গেছি।'

'বাঃ, আপনার সাধনা সফল হোক।'

'আমি আমার হাতের তাস ফেলে গেলুম ম্যাডাম, নিজের হাত এখন সামলান।'

লোকটা অসভ্য অঙ্গভঙ্গি করতে করতে বেরিয়ে গেল। খুব ইচ্ছে করছিল,

pathagar.net

পেছন থেকে এক গোঁত্তা মারি। বাবা বলতেন, রাগবে না। সব সময় শান্ত থাকবে। রাগলে বুদ্ধির বিপর্যয় হয়। বাবা আমাকে গীতা মুখস্থ করাতেন। গীতায় আছে,

ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ
স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ
প্রণশ্যতি ॥

ক্রোধ মানে রেগে গেলে মানুষের ভুল ধারণা হয়, ভুল পথে ছোটে। ভুল পথে ছুটলে ধর্মশাস্ত্রের বিধান সম্বন্ধেও ভুল ধারণা হয়। অবিশ্বাস জন্মায়, মানুষের স্মৃতিভ্রংশ হয়। স্মৃতিভ্রংশ থেকে বুদ্ধিনাশ। বুদ্ধিনাশ মানে সব তালগোল পাকিয়ে ধ্বংস।

দাঁতে দাঁত চেপে আমি লোকটার চলে যাওয়া দেখলুম। অবিকল কাতলা মাছের মতো চেহারা। ব্যাঙের মতো চোখ। গা থেকে ভরভর করে সিগারেটের গন্ধ বেরোচ্ছে। ঢনঢনিয়ার দালাল।

'শ্রদ্ধা মা, লোকটাকে তুমি এই সব কী বললে ? চিমনলাল কে গো ?'

কেউ নয়। কলকাতায় একটা চক্র কাজ করছে। যেখানে যত পড়তি বাঙালি বড়লোকের বাড়ি আছে, কায়দা করে সব কিনে নিয়ে বড় বড় বাড়ি তৈরি করে ফ্ল্যাট বিক্রি। তলায় বাজার। আলোর চারপাশে শ্যামাপোকার মতো কলকাতায় টাকা উড়ছে। টাকা, টাকা, টাকা। লোকটা খুব গোলমেলে, ভোগাবে।'

'কী করে ভোগাবে ? আমরা বাড়ি বিক্রি করবো না।'

'দুনিয়াটা আর অত সোজা নেইরে, খোকা। পাপে ছেয়ে গেছে। লোভ। ভোগ আরও ভোগ। খুন, জখম, রাহাজানি। দেখিস না, মানুষ আজকাল হাসতে হাসতে মানুষ মারে। দেখা যাক, কী হয়। আমিও তৈরি আছি। প্রয়োজন হলে আমি রোজই একবার করে আসবো। তোরা কারোকে কিছু বলবি না। কেউ কিছু বলতে এলে বলবি, আমরা জানি না। আমার বড়মা জানে।

দু-তিন দিনের মাথায় বোঝা গেল পরিকল্পনাটা কী ! রাত আটটা সাড়ে আটটার সময় একদল ছেলে এসে বাড়ির সামনে জটলা শুরু করল। যেমন তাদের গলা, সেইরকম তাদের ভাষা। খিস্তি-খেউড়ের ফোয়ারা ছুটল। একটা দল সন্তোষদার দোকানের সামনে আর একটা দল রাজেনবাবুর চায়ের দোকানের বেঞ্চে। মাঝে মাঝে শেয়ালের মতো চিৎকার। অকারণে। আজ কোনও খেলা ছিল না। কেউ মারা যায়নি। সামনে নির্বাচন নেই।

'মা এর তো প্রতিবাদ করা উচিত। এই রকম চিৎকার আর খিস্তি হলে লেখাপড়া করবো কী করে ?'

pathagar.net

'ওই বোকামি কোরো না। ওরা দলে আছে, তুমি একা। দলছাড়া প্রতিবাদ সম্ভব নয়। ওরা এখন এই রকমই করবে। আমাদের উত্ত্যক্ত করাই ওদের উদ্দেশ্য। আমরা ওদিকে যত কান দোবো, তত পেয়ে বসবে। উপেক্ষা করতে শেখো। সব ব্যাপারে কান দিও না। তোর বাবা বলতেন, হাটে বসেও ধ্যান করা যায়। অভ্যাস। সংযম। কান দোবো না তো দোবো না। রাস্তার দিকের জানালা সব বন্ধ করে দাও। নিজের পড়ার মধ্যে ডুবে যাও।'

খুব রাগ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, গায়ে গরম ফেন ঢেলে দি। অ্যাসিড ছিটিয়ে দি। কোনও ভাবে গোটা চারেক বোমা এনে সব কটাকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দি। আবার নিজেকে সংযত করলুম। একা পারবো না। যতই মনের জোর থাক, দেহের জোরের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে দলের।

পড়তে বসে গেলুম। সামনেই বাবার ছবি। বাবা ঠাকুর রামকৃষ্ণের গল্প বলতেন—অবধূতের চব্বিশটি উপগুরু ছিল। তার মধ্যে একজন হলেন ব্যাধ। একদিন মাঠের ওপর দিয়ে যেতে যেতে অবধূত দেখতে পেল সামনে ঢালঢোল বাজাতে বাজাতে খুব জাঁকজমক করে একটি বর আসছে আর একদিকে এক ব্যাধ একমনে আপনার লক্ষ্যের দিকে চেয়ে আছে, এত জাঁক করে যে বর আসছে, সেদিকে একবারও চেয়ে দেখছে না। অবধূত সেই ব্যাধকে নমস্কার করে বললে, তুমি আমার গুরু। যখন আমি ভগবানের ধ্যানে বসবো, তখন যেন তাঁর প্রতি এইরূপ লক্ষ্য থাকে।

আবার একজন মাছ ধরছে, অবধূত তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ভাই অমুক জায়জায় কোন পথ দিয়ে যাব ? সে ব্যক্তির ফাতনায় তখন মাছ খাচ্ছে। সে তার কথার কোনও উত্তর না দিয়ে একমনে ফাতনার দিকে তাকিয়ে রইল। মাছ গেঁথে তখন পেছন ফিরে বললে, আপনি কী বলছেন ? অবধূত প্রণাম করে বললে, আপনি আমার গুরু, আমি যখন আপনার ইষ্টের ধ্যানে বসবো, তখন যেন ঐরূপ কাজ শেষ না করে অন্যদিকে মন না দিই।

ঠাকুর এই উপদেশ দিয়েছিলেন ভক্তমণ্ডলীকে। মনে হওয়া মাত্রই আমার মনে একটা একাগ্রতা এসে গেল। সামনের রাস্তার হল্লা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে এল।

খুব ভোরে সন্তোষদা এসে বললেন, 'এ পাড়ায় এমন উৎপাত আগে আসেনি। সবাই মনে হলো বেপাড়ার ছেলে। আপনাদের বাড়ির দিকেই লক্ষ্য। কী ব্যাপার, বলুন তো ?'

মা সব খুলে বললেন।

সন্তোষদা বললেন, 'এই ব্যাপার। তাহলে তো একটা ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে।'

মা বললেন, মারামারির মধ্যে খবরদার যেও না। ওরা বড়। যে-কোনও কাজই ওদের পক্ষে করা সম্ভব। তোমার ওপর ছোরাছুরি চালিয়ে দিতে পারে।'

pathagar.net

'আমি ও পথে যাবোই না। আমার প্ল্যান আলাদা।'

সেইদিন সন্ধের বেশ কিছু আগে মাঝারি ধরনের একটা মিছিল এসে দাঁড়াল আমাদের বাড়ির সামনে। খোল করতাল, ঘণ্টা ঢোল সব একসঙ্গে বাজাতে বাজাতে মিছিল এসে হাজির। উদ্দাম নাম সংকীর্তন—হরে কৃষ্ণ, হরে রাম। জয় নিতাই বলে সন্তোষদা দোকান ছেড়ে নেমে এলেন। মূল গায়েনের পাশে দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে খানিক নেচে নিলেন। সেই বাজে ছেলেগুলো যথারীতি গুলতানি করছিল একটু আগে। আজ আবার রবারের একটা বল এনে ছোড়াছুড়ি করছিল। ইচ্ছে করে আমাদের দরজায় জানালায় মারছিল। ভাগ্য ভাল, আমাদের কাচ ভাঙেনি। ওরা একটা ছেলেকে আমার বাবার নাম ধরে ডাকছিল। ডাকার আগে নামের সঙ্গে এক-একটা বিশ্রী গালাগাল যোগ করছিল। সহ্য করা খুব কঠিন বলেই মনে হচ্ছিল। যে কোনও মুহূর্তে লেগে যেতে পারত। মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে ইয়ার্কির মারামারি করতে করতে আমাদের বন্ধ সদর দরজার ওপর পড়ছিল। মনে হচ্ছিল, দরজাটা বুঝি ভেঙেই যায়।

প্রায় জনা-কুড়ি লোকের সেই উদ্দাম কীর্তনে আর রাস্তা জুড়ে নৃত্যে ছেলেগুলো হকচকিয়ে গেল। কীর্তনীয়াদের একজনের বুকের কাছে ধরা আছে মহাপ্রভুর বাঁধানো ছবি। জনা-কুড়ি ভক্তের প্রত্যেকেরই চেহারা সাঙ্ঘাতিক ভাল। দেখলেই মনে হয় ব্যায়াম-করা শরীর। তিন-চারজনের হাতে মোটা লাঠি। তার ডগায় একটা করে লাল পতাকা। প্রয়োজনে উল্টো দিকটা বেশ ভালই ব্যবহার করা যাবে।

দরজা খুলে দিতেই কীর্তনীয়ারা ঘর ভরে নিলেন। এখন বুঝলুম, কেন সন্তোষদা দুপুরবেলাই একজন লোককে দিয়ে মাইক লাগিয়ে গিয়েছিলেন, ছাদের ওপর থেকে রাস্তার দিকে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন একটা স্পিকার। সন্তোষদা বলেছিলেন, এখন আমি কিছু বলব না, তখন দেখবেন। অধর্মকে ধর্ম দিয়ে তাড়াব। চেয়ার টেবিল সরিয়ে ফরাস পাতা হয়েছিল। বাইরের ঘরটা খুব একটা ছোট নয়। ঘেঁষাঘেষি করে সকলেরই জায়গা হয়ে গেল। শুরু হল নাম-সংকীর্তন। পাড়া একেবারে ফেটে গেল। নে, এইবার কত খিস্তি খেউড় করতে পারিস কর।

আমাদের পাড়ায় বিদুঘুটে একটা লোক মোড়ের মাথায় বিশাল একটা সাবেক বাড়িতে থাকেন। সেই বাড়ির দরজা-জানালা সারাদিনই বন্ধ থাকে। ভদ্রলোক ভূতের মতো যাওয়া-আসা করেন।

ছোট্ট একটা গাড়ি আছে ভদ্রলোকের। মজার-মজার পোশাক পরেন। চকরবকর জামা। জিনের প্যান্ট। ঢ্যাপপোল জুতো। এদিকে যখন নামগান চলেছে, ভদ্রলোক তখন থানায় ফোন করেছেন। ধর্মীয় অত্যাচারে পাড়ায় তিষ্ঠনো যাচ্ছে না। থানার অফিসার-ইন-চার্জ এসে হাজির।

pathagar.net

মাইক চালাবার অনুমতি নিয়েছিলেন ? আপনাদের নামে কমপ্লেন আছে। বন্ধ করুন চিৎকার। অফিসার-ইন-চার্জের পাশে সেই চকরাবকরা লোকটা। শ্রদ্ধা মা এসেছিলেন। তিনি ভেতরে ছিলেন। গোলমাল শুনে বেরিয়ে এলেন, 'কী হয়েছে অফিসার ?'

মায়ের টকটকে চেহারা দেখে অফিসার থতমত খেয়ে গেলেন।

পাড়ায় কোন মাইক আপনাদের অনুমতিতে চলে ? বিয়ে পইতে পুজো। ধর্মীয় ব্যাপারে বাধা দেবার অধিকার আপনার নেই। সংবিধান পড়া আছে ? দশটা পর্যন্ত আমরা মাইক চালাবো।

'এই ভদ্রলোক যখন আপত্তি তুলেছেন, তখন আমাদের কিছু করার নেই ?'

'কে এই ভদ্রলোক ?'

'এই পাড়ার বিশিষ্ট মানুষ। বিশ্বম্ভর চৌধুরী।'

শ্রদ্ধা মা চৌধুরী মশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কোথায় ছিলেন আপনি ?'

ভদ্রলোক থতমত খেয়ে বললেন, 'আমি আমার বাড়িতে ছিলুম।'

'ওই ছেলেগুলো কাল থেকে অসভ্যতার চরমে চলে গেছে। বাড়িতে টিকতে দিচ্ছে না। আপনি শুনতে পাননি ?'

'যৌবনের ধর্ম। সবকালেই যুবক ছেলেরা একটু হইহল্লা করে থাকে। প্রাণপ্রাচুর্যে। দেশ স্বাধীন হয়েছে, এইটুকু স্বাধীনতা তাদের দিতেই হবে।'

'প্রাণপ্রাচুর্যে যুবকরা যদি অষ্টপ্রহর খিস্তি করতে পারে, তাহলে বুড়োরাও আত্মরক্ষার জন্যে অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন করতে পারে। আগে ওদের পেটাতে পেটাতে পাড়াছাড়া করুন, তারপর ভাবা যাবে কীর্তন বন্ধ করা যায় কি না।'

অফিসার বললেন, 'আপনারা কমপ্লেন করেননি কেন ?'

'কারণ কোনও কাজ হবে না, উল্টে ওরা আমাদের কারোর লাশ ফেলে দেবে। ওরা তো নাচের পুতুল। সুতো তো অন্য লোকের হাতে। আবার সেই হাত ধরে আছে আপনাদের চুলের মুঠি, নেতাদের চুলের মুঠি।'

'আপনার তো ভীষণ চ্যাটাং চ্যাটাং কথা।'

'আগে ছিল না, এখন হয়েছে।'

'তাহলে কী হবে ?'

'কীর্তন চলবে। আরও জোরে চলবে। একদিন, দুদিন, একমাস, দুমাস, একবছর। না থেমে সারা দিন রাত।'

হঠাৎ সাদা রঙের একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। গাড়ির মাথায় লাল আলো। অফিসার চনমন করে উঠলেন। দরজা খুলে নেমে এলেন জাঁদরেল চেহারার এক ভদ্রমহিলা। সমীহ করার মতো ব্যক্তিত্ব।

মহিলা বাড়ির দিকে আসতে আসতে প্রশ্ন করলেন, কী হলো, শ্রদ্ধাদি পুলিস কেন ?'

pathagar.net

অফিসার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্যালুট করে বললেন, 'ম্যাডাম আপনি ?'

'ভূত দেখলেন নাকি ?'

শ্রদ্ধা মা বললেন, 'অনেকটা তাই। আমাকে অ্যারেস্ট করতে এসেছেন।'

'অ্যারেস্ট ? অপরাধ ?'

'এই যে হরিনাম সংকীর্তন হচ্ছে। সেই অপরাধে।'

'আচ্ছা আজকাল বুঝি এইরকম হয়েছে। ধর্ম করলে জেলে যেতে হবে, অধর্ম করলে স্বর্গে।'

অফিসার বললেন, 'না না ব্যাপারটা একটু অন্যরকম, এর মধ্যে কোথায় একটা গণ্ডগোল আছে।'

শ্রদ্ধা মা বললেন, 'একটা চক্রান্ত। এক ঢনঢনিয়া এই বাড়িটা কিনে ফ্ল্যাট তৈরি করবে। আমরা বিক্রি করবো না। তখন ঢনঢনিয়া গ্রুপ পাঠিয়ে দিলে খিস্তি পার্টি। ওই যে সব ছড়িয়ে-ছড়িয়ে আছে। সারাদিন বাড়ির সামনে ভূতের নৃত্য। আমাদের অতিষ্ঠ করে তোলবার প্ল্যান। আর এই যে দেখছ, এর নাম বিশ্বম্ভরবাবু, মনে হয় ঢনঢনিয়ার এজেন্ট। হরিনাম করে আমরা ওই অসভ্যতাকে ঠেলতে চেয়েছিলুম। বিশ্বম্ভরবাবু পুলিস ডেকে এনেছেন।'

ভদ্রমহিলা অফিসারকে বললেন, 'এসব আপনি জানতেন না ?'

'এর আমি কিছুই জানি না। বিশ্বাস করুন।'

'ওরা যে টাকা ছড়াচ্ছে, সেই টাকা তাহলে আপনাদের দিকে যায়নি।'

'এসব আপনি কী বলছেন ?'

'তাহলে দেখবেন, ব্যাপারটা কেমন ম্যাজিকের মতো ঘুরে যাবে ? বিশ্বম্ভর, তুমি বলো।'

আমরা সবাই মুহূর্তে হতভম্ব। বিশ্বম্ভর হাসতে হাসতে বললেন, 'ওই চক্রান্ত যে হবে, আমি জানতুম। ক্যাপিট্যালিস্টরা এইভাবেই এগোয়। পুলিস মাস্তান, এজেন্ট-এদের পে রোল আছে। মাসকাবারি ব্যবস্থা। এই ছেলেগুলো যখন পাড়ায় ঢুকে চরম অসভ্যতা করছিল, আমি ফোন করেছিলুম। থানা আমাকে যা বলেছিল, আমি আমার মাকে ঠিক সেই কথাগুলোই বলেছি। এরপর আমি যখন বিশ্বম্ভর চৌধুরী নামে ফোন করলুম সঙ্গে সঙ্গে কাজ হলো। এই নামটা আমি জানতুম। চক্রান্তের এজেন্ট। সঙ্গে সঙ্গে কাজ হলো। জিপ বেরিয়ে পড়ল। আইন নেমে এল। হইচই শুরু হয়ে গেল। দেশের এখন এই অবস্থা। উমাদি, আপনারা মন্ত্রী হয়ে দপ্তরে বসে আছেন। ফাইল ধরে টানাটানি করছেন। ভাবছেন, দেশ চালাচ্ছেন আপনারা ? দেশ চালাচ্ছে অদৃশ্য এক শক্তি।'

শ্রদ্ধা মা বললেন, 'অনাথ, তোমাকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আমার উমাকে। সে যে সব কাজ ছেড়ে ঠিক সময়ে আসতে পেরেছে, না এলে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যেত।'

pathagar.net

সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী উমা রায় বললেন, 'অফিসার, আপনি যে ধরা পড়ে গেলেন। এইবার কী হবে?'

'আপনি ভালই জানেন, আমার হাত-পা বাঁধা। আমি এখুনি ওই জানোয়ারদের পেটাতে পেটাতে নিয়ে গিয়ে লক আপে ভরে দিতে পারি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা ফোন। ছেড়ে দিতে হবে। যাবার সময় কলা দেখিয়ে যাবে। ছেড়ে না দিলে সুন্দরবনে ট্র্যানস্ফার। আপনি সব জানেন।'

'এর সমাধান?'

সমাধান সকলের চাকরি। চাকরির অভ্যাস যতই চলে যাবে, সর্বনাশ আরও ঘনিয়ে আসবে। পরে চাকরি দিলেও আর চাকরি করতে চাইবে না। কারণ দমকা টাকার লোভ। এক-একটা এই ধরনের কাজ করবে দশ-বিশ হাজার পেয়ে যাবে। কে করে দশটা-পাঁচটা? আর তাতে মাইনেই বা কত! আপাতত আমি এদের খেদিয়ে দিচ্ছি। তবে আপনাদেরও সাবধানে থাকতে হবে। কাঁচা টাকার লোভে ওরা সবকিছু করতে পারে।

বুঝেছি, আমরা আমাদের ছেলেদের খবর দিচ্ছি।

দিতে পারেন। পেটাপিটি হোক, তারপর কী করা যায় দেখি। কালো টাকা যত দিন না দেশ থেকে যাচ্ছে, তত দিন এদেশের ভাল হবার কোনও আশা নেই।

অফিসারের চেহারা হঠাৎ পাল্টে গেল। রুদ্রমূর্তিতে ছেলেগুলোকে তাড়া করলেন। সঙ্গে দুজন কনস্টেবল ছিল, তারাও তেড়ে গেল। ছেলেগুলোর সঙ্গে বোমাও ছিল। একটা ছুড়ল আমাদের বাড়ির দিকে আর একটা সোজা সন্তোষদার দোকানে। আমাদেরটা বাড়ির দেয়ালে লেগে ছিটকে চলে গেল। ফাটল না। ফাটলে আমাদের কজন থাকত, কজন যেত—বলা শক্ত। সন্তোষদার দোকানটা বিকট শব্দে চুরমার হয়ে গেল।

আমি 'মা' বলে শ্রদ্ধা মাকে জড়িয়ে ধরলুম। বেশ জানি, সন্তোষদার বাঁচার কোনও আশা নেই। ছোট্ট দোকান। শক্তিশালী বোমা। কীর্তনীয়ার দল খোল কত্তাল ফেলে পতাকার ডাণ্ডা উঁচিয়ে হে রে হে রে করে তাড়া করল। একটু আগে করলে সন্তোষদা হয়তো বেঁচে যেতেন। আমরা হেরেই গেলুম। যুদ্ধের প্রথম দিনে আমাদের পরাজয় হলো। যে ভাবেই হোক আমরা এত হরিনাম করলুম—নামের কি কোনও শক্তি নেই একালে?

আমাদের আর-এক বন্ধু চলে গেলেন। আমার আর-এক ভালোবাসার মানুষ সন্তোষদা। আমাদের সাহায্য করতে এসে আমাদের ভালোবেসেই জীবনটা দিলেন। সন্তোষদা একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিলেন। কথায় কথায় যারা মানুষের জীবন নেয়, তাদের আমি ক্ষমা করবো না। ওরা যখন পুলিসের তাড়া খেয়ে পালাচ্ছিল, তখনই আমার মন বলেছিল, ওরা বোমা মারবে।

pathagar.net

প্রথম মারবে সন্তোষদাকে। মনের কথা তখন বিশ্বাস করিনি। ঘটনাটা ঘটে যাবার পর আর একবার ভয় পেলুম। আমার মন আগে থেকেই কী ঘটবে, জানতে পারছে। এতো খুব সাংঘাতিক ব্যাপার। এটা কী ধরনের ক্ষমতা। আমি হঠাৎ যা বলে ফেলছি, তা মিলে যাচ্ছে। আমার এই শক্তি কোথা থেকে এল। এটা কি কোনও শক্তি না বিচার-বুদ্ধি। হঠাৎ মনে হলো আমার শ্রদ্ধা মাকে ওরা চেষ্টা করবে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ও মহাত্মা গান্ধী রোডের মোড়ে গাড়ি চাপা দিয়ে মারার।

শ্রদ্ধা মাকে আমি চুপি চুপি সেই কথা বললুম।

'তোর হঠাৎ এমন মনে হলো ?'

'বড়মা, আমার কেন জানি না, আজকাল যা মনে হয়, তাই ঘটে যায়। প্লিজ, আপনি একটু সাবধান হবেন। একদম রাস্তায় বেরোবেন না।'

'উৎপল, আমি যে কখনও ভয় পাইনি। আর আজ ভয় পেয়ে গর্তে লুকবো ?'

'এ তো গর্তে লুকনো নয়, সাবধান হওয়া। আমার বাবা বলতেন, সাবধানের মার নেই। আবার এও বলেন, শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।'

'তুই বেশ বলিস। তোর কথা শুনলে মনে হয় তোর মধ্যে কত বড় একজন জ্ঞানী মানুষ যেন বসে আছেন। ঠিক আছে, বলছিস যখন সাবধান হব। একবার তো একটুর জন্যে প্রাণে বেঁচে গেলুম। বোমাটা ফাটলে কী হতো !'

'বোমাটা যে ফাটবে না আমি জানতুম। কারণ ওই জায়গায় আমি ছিলুম। আমার যারা ক্ষতি করতে চাইবে, তাদেরই ক্ষতি হবে।'

'এটা তোমার বিশ্বাস না কোনও মহাপুরুষের দেওয়া ক্ষমতা।'

'তা জানি না মা। তবে অদ্ভুত একটি ব্যাপার হয়েছে। আমার গলার স্বরটা হঠাৎ পালটে গেছে। অবিকল বাবার গলার মতো হয়ে গেছে। নিজের নাম ধরে যখন নিজেকে ডাকি, নিজেই চমকে উঠি। যেন বাবাই ডাকছেন। বাবাই আমাকে চালাচ্ছেন।'

'তুমি তো বাবাকে ভীষণ ভালোবাসতে, তাই হয়তো এইরকম মনে হচ্ছে।'

'আরও কিছুদিন দেখি মা, তারপর সঠিক বলতে পারবো।'

এই গোলযোগের মধ্যেই ভীষণ মনের জোর নিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে গেলুম। তেমন কোনও প্রস্তুতিই ছিল না। তবু মনে হলো পারবো আমি।

নিশ্চয় পারবো। বাবার সঙ্গে কলকাতার পথেঘাটে ঘুরতে ঘুরতে আর পড়ার আলোচনা করতে করতে আমার একটি জমি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। অঙ্ক আর ইংরেজিতে তো কেউ আমাকে মারতে পারবে না।

পরীক্ষায় বসে ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম আরও। কে যেন আমার পাশে বসে কানে কানে উত্তর বলে দিচ্ছে। যেন তৃতীয় কোনও শক্তি পরীক্ষা দিচ্ছেন।

pathagar.net

আর সেই কণ্ঠস্বর হলো আমার বাবার। যিনি কেবলই আমাকে বলতেন, হেরে যেও না খোকা। হেরে যেও না। পৃথিবীতে দু'ধরনের লড়াই চলছে শক্তির আর বুদ্ধির। শক্তি দেহ-নির্ভর, বুদ্ধি মন-নির্ভর। মনই সব। মন সাহায্য না করলে দেহ অচল। মন হুকুম করে, দেহ পালন করে। মনের চাকর হলো দেহ। বাবা আমাকে উপনিষদ আবৃত্তি করে শোনাতেন! কি সুন্দর!

অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান্ আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।

আত্মা অতি সূক্ষ্ম আবার বিশালের চেয়েও বিশাল। সেই আত্মা বসে আছেন তোমার হৃদয়-গুহায়। তার সন্ধান করো। তাকে ধরতে পারলেই তুমি সর্বশক্তিমান। অপরাজেয়, বিশাল। সেই শক্তির ধ্যান করো। একটু একটু করে সাবধানে এগোবার চেষ্টা করো। তোমার মধ্যেই আছে অ্যাটম বম্ব। পরীক্ষা বেশ ভালই দিলুম। এত ভাল যে, মনের আনন্দে একটু মোটাও হয়ে গেলুম। মাথায় একমাথা চুল, সামান্য কোঁকড়ানো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হলো হিরো হয়ে গেছি।

হঠাৎ দুটি নির্দেশ এল মনে। স্পষ্ট আমার বাবার কণ্ঠস্বর। সন্তোষ তোমাদের জন্যে প্রাণ দিল। তোমরা তার স্মৃতিতে কী করলে? একমাত্র উপার্জনের পথ, তার দোকানটা তছনছ হয়ে গেল। তার পরিবার আজ পথে বসেছে। তোমরা তার কী করলে? আমার ছবিতে মালা ঝোলালেই হবে? নিজেদের সংসার সামলালেই চলবে? এই শিক্ষাই কি তোমাকে দিতে চেয়েছিলুম? পরের জন্যে বাঁচতে শেখো। তাহলেই বাঁচার পুরো মজাটা পাবে। সকলকে নিয়ে বাঁচো। যে বাড়ির জন্যে এত কাণ্ড, সেই বাড়িটার নাম দাও 'সন্তোষ স্মৃতি সদন।' শুধু নাম দিলে হবে না, তোমার শ্রদ্ধা মা আর মাননীয় মন্ত্রীকে বলে এখানে একটা কেন্দ্র করো সমাজের দুঃস্থ মহিলাদের জন্যে। এখানে একটা কর্মকেন্দ্র করো। পরিবারের মেয়েরা কাজের অবসরে দুপুরবেলা এসে হাতের কাজ করবে। সামান্য যা উপার্জন হবে, সংসারের আয় বাড়াবে। সারাদিন যারা খাটে, এইরকম কিশোরদের জন্যে রাতের দিকে একটা স্কুল খোলো। এই কাজের জন্যে টাকা কোথা থেকে আসবে জানো? সেই লোকটির কাছ থেকে, যে এই বাড়িটাকে গ্রাস করতে চেয়েছিল। সেই ঢনঢনিয়া। তুমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই তা হবে। তোমার ভেতর থেকে ভয় জিনিসটাকে তো আমি দূর করে দিয়েছি। স্বয়ং প্রেসিডেন্টের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস তোমার আছে। ঠিকানা তোমাকে কে দেবে জানো—সেই প্রশান্ত মিত্র, অ্যাটর্নি। মানুষটা খারাপ নয়, কেবল একটু বিষয়ী। কোনও মানুষই নির্ভেজাল খারাপ বা নির্ভেজাল ভাল হয় না। ভাল আর মন্দ মিশিয়ে থাকে। ভাল দিকটাকে সেলফ থেকে যে ভাবে বই টেনে বের করে, সেইভাবেই টেনে বের করে আনতে হয়। তোমার জীবনে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটবে। যারা খারাপ বদলোক, তারাই

pathagar.net

তোমাকে ভীষণ সাহায্য করবে। তাদের কাছ থেকেই তুমি পাবে জীবনের সবচেয়ে বড় বড় উপকার।

গভীর রাতের এই কণ্ঠস্বরে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম। কিছুক্ষণ। যেন এইমাত্র রেডিওর কোনও দূর স্টেশন ভেসে এল। বিশ্বাস করতে পারছিলুম না। একটা মৃদু ধমক শুনলুম, এখনও তোমার অবিশ্বাস গেল না।

পরের দিন বেলা এগারোটার সময় টেম্পল স্ট্রিটের সেই অ্যাটর্নির অফিসে গেলুম। হেড ক্লার্ক চিনতে পারলেন না। না-পারারই কথা। অনেকদিন পর আসছি। আমার চেহারারও যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। মাথায় অনেকটা বেড়েছি। শরীর বলিষ্ঠ হয়েছে। বাবা বলতেন, মরো বাঁচো, ব্যায়াম ছেড়ো না। রোজ এমন কিছু করবে যাতে খুব ঘাম বেরোয়। যাতে বেশ কিছুক্ষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ো। মেহনতটা ছেড়ো না কোনওদিন। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। কেন জানি না, আমি একটু তাড়াতাড়িই যুবক হয়ে গেলুম। সেইটাই বোধহয় প্রয়োজন ছিল।

হেড ক্লার্ক বললেন, 'স্লিপ দিন।'

স্লিপ ভেতরে গেল। সেদিনকার মতো দীর্ঘক্ষণ বসতে হলো না। সঙ্গে সঙ্গে ডাক এল। প্রশান্তবাবু হঠাৎ যেন বেশি বুড়ো হয়ে গেছেন। শরীরের জন্যেই। সেই আমার সামনেই অসুস্থ হয়ে নার্সিংহোমে গেলেন। পরে এসে আমি বেয়ারার কাছে খবর নিয়েছিলুম, বাবু কেমন আছেন।

প্রশান্ত মিত্র অসাধারণ ভাল ব্যবহার করলেন। এমনকি ক্ষমাও চাইলেন সেদিনের ব্যবহারের জন্যে। বললেন, 'তোমার বাবা, আমি হিসেব করে দেখলুম, ছ'হাজার পঁচিশ টাকা পাবেন। এই দেখো, তোমার জন্যে খামে ভরে রেখে দিয়েছি। কবে আসো, কবে আসো করে এই এতদিন হয়ে গেলো। তুমি আমাকে সেদিন ভুল বুঝেছিলে। আমি বুঝতে পারি, আমার বাইরের ভদ্রতাটা একটু কম। গাঁইয়া মতো। আমার ভেতরটা মনে হয় ততটা খারাপ নয়। তুমি টাকাটা নাও বাবা।

'টাকাটা আমি আর নিতে পারবো না, জ্যাঠামশাই। বাবা আমাকে বলেছিলেন, কখনও সত্যভ্রষ্ট হবে না। আমিও ক্ষমা চাইছি আমার সেদিনের ব্যবহারের জন্যে।'

'তুমি তাহলে বলো, টাকাটা আমি কাকে দেবো ? আমিও তো ঋণী থাকতে পারি না।'

'আপনি টাকাটা রাখুন। এই টাকাটা একটি পরিবারের খুব প্রয়োজনে লাগবে। আমি তাদের কারোকে পাঠিয়ে দেবো। আপনার তো আবার হিসেবের ব্যাপার। ইনকাম ট্যাকসের ঝামেলা আছে। আপনি টাকাটা ডোনেশান হিসেবে দেখিয়ে দেবেন।'

'সে যা হয়, হবে। তুমি এখন কী জন্যে এসেছ, বলো।'

pathagar.net

'আমি এসেছি এক ঢনঢনিয়ার ঠিকানার জন্যে।'

'বাড়ির ব্যবসায়ী।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'সে তো আমার ক্লায়েন্ট। তুমি জানলে কী করে?'

'হঠাৎ আমার মনে হলো।'

ভদ্রলোক ঠিকানাটা আমাকে দিলেন। চলে আসার সময় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'জানো তো, আমার বুকে পেসমেকার বসিয়ে দিয়েছে। শরীরে আর আগের তেজ নেই। তোমাকে একটা কথা বলি, আমার ছেলেপুলে কেউ নেই, তুমি তাড়াতাড়ি ল'টা পাস করে নাও। তোমাকে আমার ফার্মের পার্টনার করে নি। তোমার মতো একটা ছেলে পাশে থাকলে মনে বেশ বল পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে এসো না। আমাকে একটু সাহায্য করবে। আজকাল একটুতেই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ি।'

আমি 'আসবো' বলে রাস্তায় নেমে এলুম।

পরের দিন সকালবেলায় গেলুম ঢনঢনিয়ার বাড়িতে। কলকাতার সবচেয়ে বড়লোকের এলাকা আলিপুরে ঢনঢনিয়ার প্রাসাদের মতো বাড়ি। প্রথমেই ধাক্কা খেলুম। গেটে। বন্দুকধারী দারোয়ান কিছুতেই ঢুকতে দেবে না। বললুম, 'তোমার বাবুকে গিয়ে বলো, অ্যাটর্নি প্রশান্ত মিত্রের কাছ থেকে লোক এসেছে জরুরি খবর নিয়ে।'

ম্যাজিকের মতো কাজ হলো। ভেতরের লনে গার্ডেন চেয়ারে বসেছিলেন ভদ্রলোক পাজামা-পাঞ্জাবি পরে। নমস্কার করে বসলুম। চেহারা ও গাম্ভীর্য দেখে আমার ভয় পাওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু কোনও ভয়ই এল না মনে। 'বাবা বলতেন, ধনী, ক্ষমতাশালী লোকের সামনে এসে যদি তোমার ভয় করে সঙ্গে সঙ্গে মনের চোখে একটা দৃশ্য দেখবে, শ্মশান-চিতা জ্বলছে, রাজা, প্রজা, আমীর, ফকির, ডিকটেটার, সোস্যালিস্ট, নায়ক, দর্শক, সবাই ওই একই চিতায় পুড়ে ছাই হবে। ধনজন ঐশ্বর্য সবই তখন কিছুই না। অপ্রয়োজনীয় আর্বজনা। তুমি সেই লোকটির চলে যাওয়ার দৃশ্যটা ভাববে। এক টুকরো সুতো কি এক কণা ধুলোও তার সঙ্গে যাবে না।

ঢনঢনিয়াকে দেখে প্রথমে আমার একটু অস্বস্তিই হয়েছিল। লোকটা তো আসলে খুনী, জোচ্চর। বসে মনের চোখে যেই দেখলুম লোকটাকে চিতায় তোলা হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ভয় চলে গেল। রাজার পোশাক ছাড়িয়ে নিলে রাজা প্রজায় কোনও তফাত নেই।

ঢনঢনিয়ার গলাটা ভীষণ গম্ভীর। মেঘের মতো। সকালের নরম রোদও অসহ্য, তাই হাল্কা রঙের গগলস চোখে। জিজ্ঞেস করলেন, 'বিশেষ কোনও খবর আছে কী?'

pathagar.net

'আপনি ধনী। আপনার প্রচুর আছে। তবু আপনার লোভ গেল না। আর তো মাত্র দশ বছর আছেন, তখন কে এইসব ভোগ করবে?'

আমি ভেবেছিলুম ঢনঢনিয়া আমাকে এক চড় বা লাথি লাগাবেন। কিছুই করলেন না। শীতল গলায় বললেন, 'কী বলতে চাও। তাড়াতাড়ি বলে ফেল, সময় খুব কম আমার।'

'আমার নাম উৎপল চট্টোপাধ্যায়। আপনি আমাদের বাড়িটা কিনতে চেয়েছিলেন। পাঁচ লাখ টাকায়।'

'কোন বাড়ি? আমার প্ল্যান আছে কলকাতার আমি থ্রি ফোর্থ কিনে ফেলবো।'

'কী হবে?'

'সে তুমি বুঝবে না। টাকা আমাদের রক্তে আছে। উইপোকার যেমন বই, শোঁয়াপোকার যেমন গাছের পাতা, মাছির যেমন মধু, আমাদের সেইরকম টাকা। কী হবে আমাদের ভাবি না। আমরা একভাবে টাকা কামাই, আবার দান ধ্যান ধর্ম করি। তোমরা আমাদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে পারবে না।'

'আপনার জন্যে এক গরিব পরিবার আজ পথে বসেছে।'

'কে তোমরা?'

'আমার হলে আপনার কাছে ভিক্ষে করতে আসতুম না। আপনার ছেলেরা আমাদের বাড়িছাড়া করতে গিয়ে বোমা মেরে আমাদের বাড়ির সামনের এক দোকানদারকে মেরে ফেলেছে।'

'খবর রাখি না। তা আমাকে কী করতে হবে?'

'প্রায়শ্চিত্ত।'

'ওরকম কত মরে, কত মরবে।'

'এ আপনার মনের কথা নয়, মুখের কথা।'

'কী করে বুঝলে?'

'মানুষ যখন একদিকে বড় হয় তখন তার মনটাও বড় হয়ে যায়।'

'তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগছে। আমি এতক্ষণ কারোর সঙ্গে কথা বলি না। তোমার বয়স কম। কিন্তু কথা বলছ বেশ জ্ঞানীলোকের মতো। কী করে তা সম্ভব, আমি জানি না।'

'আপনার সঙ্গে আমি কথা বলছি না। বলছেন আমার বাবা।'

'কে তোমার বাবা?'

'আমার বাবার নাম ছিল প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়। বইয়ের ব্যবসা করতেন। ফরেন বুকস।'

'প্রকাশ? প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়। সেন্ট জেভিয়ার্স!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

pathagar.net

'আমি তাকে চিনি। আমার সহপাঠী ছিল। অসম্ভব ভালো ছেলে ছিল। সন্ন্যাসীর মতো। প্রকাশ চলে গেছে!'

'হ্যাঁ, মারা গেছেন পথের ধারে। কাঁধে বইয়ের ব্যাগ। আর হাঁটতে পারলেন না। একবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গিয়েছিল। একজনদের রকে শুয়ে পড়লেন, আর উঠলেন না।'

'বীরের মৃত্যু। খুব বড় চাকরি করত। সেই সময় একবার আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল প্লেনে। অত বড় চাকরি ছাড়ল কেন!'

'মালিক ওঁরই সামনে ওঁর এক সহকর্মীকে শুয়োরের বাচ্চা বলেছিলেন। বাবা প্রতিবাদ করায় বাবাকে বলেছিলেন বাঙালি কুত্তা।'

'পয়সা হলে মানুষ ছোটলোক হয়ে যায়। তুমি আমাকে কী করতে বলছ? বিশ-তিরিশ হাজার টাকা ওই লোকটির পরিবারকে দিয়ে দেবো।'

'না,আপনি আমাদের বাড়িটা কিনতে চেয়েছিলেন।'

'আমি জানতুম না, ওটা প্রকাশের বাড়ি। আমার এজেন্ট অতসব আমাকে বলেনি।'

'ওই যে লোকটি আমাদের জন্যে প্রাণ দিল, তার নামে আমাদের বাড়িটাকে একটা স্মৃতিসদন করতে চাই।'

'তোমাদের পরিকল্পনা নিয়ে এসো। দেখি, আমি কী করতে পারি। তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। তোমার মতো আমার একটা ছেলে থাকলে আমার গর্ব হতো।'

হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল 'আমার বাবা নেই।'

ভদ্রলোকের শরীর খুব ফিট। গার্ডেন চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে সোজা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমার কোনও ঘৃণা এলো না। ভদ্রলোকের স্পর্শ আমার ভালো লাগল। জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ইউ আর মাই সান।'

আমার মনে হলো না, কোনও সিনেমা হচ্ছে। চোর জোচ্চর গুণ্ডা বদমাশদের নিয়ে রাজত্ব করতে করতে ভেতরটা মরুভূমি হয়ে গেছে। সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়া একটা শিক্ষিত লোক, তারও তো একটা মন আছে। আমি সেদিন ফিরে এলুম। যে কণ্ঠস্বর গভীর রাতে শুনেছিলুম তা মিথ্যে নয়, মনের ভুল নয়। মৃত্যুর পরেও মানুষের আত্মা থাকে প্রিয়জনকে ঘিরে। তাকে পরিচালনা করে। বোঝার চেষ্টা করলেই বোঝা যায়।

সন্তোষদার স্ত্রীকে বললুম, 'শোকে মনমরা হয়ে বসে থাকলে চলবে? কতদিন বসে থাকবেন! মৃত্যু পৃথিবীকে অচল করতে পারেনি, পারবেও না। পারলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এত মানুষ মরেছিল যে, তারপর পৃথিবীর আর বেঁচে থাকার কথা নয়। এই-যে নদী, যে নদী পার হয়ে আপনি বেলুড়ে যান, পালা-পার্বণে স্নান করে আসেন, যে নদীর জল পরিশ্রুত হয়ে আপনার কলসিতে

pathagar.net

আসে, পানীয় জল হয় সেই নদী বর্ষায় দু'কূল ছাপিয়ে বন্যা হয়ে তেড়ে আসে। তখন আর তার নাম জীবন নয়, মৃত্যু। কিন্তু সে আর কদিন। আবার শান্ত হয়, আবার ফসল ফলায়, আবার তৃষ্ণা মেটায়, আবার চাঁদের আলোয় গান গেয়ে বয়ে চলে। শোক ঝেড়ে ফেলুন।'

কাকিমা আমার বক্তৃতার কী বুঝলেন জানি না, শুধু বললেন, 'কী করে কী হবে বাবা! ছেলেটাকে বলেছি সাইকেল রিকশা চালাতে।'

'আপনাদের ওই এক আছে, মেয়েছেলে হলে ঝিগিরি। আর ছেলে হলে সাইকেল রিকশা। এই চিঠিটা নিয়ে এই ঠিকানায় যান। কালই যাবেন, ছেলেকে নিয়ে। অনেক টাকা পাবেন।'

'কত?'

'ছ' সাত হাজার।'

মহিলা করুণ হাসলেন। হেসে বললেন, তুমি এখন খুব ছেলেমানুষ বাবা, দুনিয়াটাকে চেনো না। এই বাজারে দুটো পয়সা কেউ দিতে চায় না, 'ছ হাজার দেবে। এই সব সিনেমায় হয়।'

আজকাল আমার খুব রাগ বেড়েছে। ইচ্ছে করে রাগি। না রাগলে কাজে গতি আসে না; যেমন তরকারিতে ঝাল না দিলে স্বাদ বাড়ে না। খুব রেগে গিয়ে বললুম, 'যা বলছি, তাই করুন। নিজের জ্ঞান ফলাতে যাবেন না।'

শ্রদ্ধা মা বললেন, 'তুই তো বিশাল এক পরিকল্পনার কথা বলছিস। ভাবতে ভালো লাগে। সত্যিই কি টাকা দেবে? ব্যবসায়ী লোক। দিলেও কত টাকা দেবে? দশ বারো কুড়ি। তাতে কিছু হবে না, বাবা।'

'তুমি উমাদির সঙ্গে বসে একটা বড় পরিকল্পনা করো না। আমি উৎপল চট্টোপাধ্যায় বলছি, হবে হবে, হবেই হবে।'

'তোকে আজকাল আমার ভয় লাগে। ক্রমশই যেন আগুনের মতো হয়ে উঠেছিস।'

শ্রদ্ধা মা, উমাদি, অনাথবাবু, মা সবাই মিলে একটা পরিকল্পনা তৈরি করে ফেললেন। বড় পরিকল্পনা। উমাদি আর শ্রদ্ধা মায়ের তো খুব জ্ঞান। কী করলে কী হয়, ভালই জানেন। নারী কল্যাণ সমিতি হবে। বিভিন্ন তার বিভাগ হবে। মেয়েরা কাজ শিখবে। উৎপাদন হবে। বিক্রি হবে। হেলথ সেন্টার হবে। একটা শিশুসদন হবে। ছাপাখানা হবে। বই ছাপা, শাড়ি ছাপা। দোতলায় একটা বোটিক হবে। পয়সাঅলা মেয়েরা এসে কেনাকাটা করবে। নিচের তলায় একটা ফ্যাশন পারলার হবে।

পরের মিটিং-এ ঢনঢনিয়া এসে সকলকে অবাক করে দিলেন। আমরা মিস্টার ঢনঢনিয়া বলে সম্বোধন করেছিলুম। বললেন, 'আমার একটা ভাল নাম আছে, গুড নেম, বিক্রম। বিক্রমদা বললে কেমন হয়!'

pathagar.net

আমি বললুম, 'আমি তো দাদা বলতে পারবো না।'

'ইউ আর মাই সান। তুমি আমার ছেলে। তুমি আমাকে ফাদার বলবে।' পরিকল্পনা তাঁর খুব পছন্দ হলো। বললেন, 'কাজের কাজ হলো। অনেকের উপকার হবে।'

অনেকক্ষণ থেকে অনেক কথা বললেন। নিজের ছেলেবেলার গল্প। সব বড়রাই ছেলেবেলার জন্যে দুঃখ করেন। আর তো ফিরে আসবে না ছেলেবেলা। আবার জন্মাতে হবে। বিক্রমবাবু চলে যাবার আগে আমাকে কাছে ডাকলেন, 'শোনো উৎপল, এইবার তোমার জন্যে একটা পরিকল্পনা করছি, তোমাকে আমি দু'মাসের মধ্যে আমেরিকা পাঠাবো। এখানে যত ভালই লেখাপড়া করো, কিছু হবে না। ওখানে হার্ভার্ড থেকে তুমি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট করে দেশে ফিরবে। তোমাকে আমার কনসার্নে বসিয়ে দিয়ে আমি বিদায় নেবো।'

হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'পাপের পয়সা।'

বিক্রমবাবু ঠাস্ করে আমার গালে একটা চড় মারলেন। আমি সত্যিই কি রকম হয়ে গেলুম। কোনও প্রতিবাদ করতে পারলুম না। বিক্রমবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। সকলেই চুপ। কারোর মুখে কোনও প্রতিবাদ নেই। বিক্রমবাবু বললেন, 'ফুল। সেন্টিমেন্টাল ফুল। অনেক বই পড়েছ, সব বদহজম হয়েছে। পয়সা মানেই পাপ। তুমি কী ভাবো, পৃথিবীর সবাই সন্ন্যাসী হয়ে লেংটি পরে হিমালয়ে চলে যাবে। চোর, জোচ্চর, বদমাশ, গুণ্ডা, বাটপাড়, আবার সাধু-সজ্জন, সবাই এই পৃথিবীতে, ঈশ্বরের এই পৃথিবীতে পাশাপাশি থাকবে। অদৃশ্য একটা ছাঁকনি আছে। যার নাম জীবন। সেই ছাঁকনি গলে একজন, দু'জন মহাপুরুষ হয়। মহামানব হয়। সন্ন্যাসী হয়। সৎপথ বলতে তুমি কি বোঝ হে ছোকরা! বুদ্ধি আর পরিশ্রম মিলিয়ে যে কর্মপথ তৈরি হয় তারই নাম সৎপথ। জীবন একটা যুদ্ধ। ছলে-বলে কৌশলে তোমাকে জিততে হবে। যে হেরে যায়, যে পরাজিত হয়, তার কোনও আদর্শ নেই। তার মুখে বড় বড় জ্ঞানের কথা শোভা পায় না। আর জানবে পৃথিবীর দুটো দিক—একদিকে ত্যাগ, সন্ন্যাস, আর একদিকে ভোগ আর অর্থ। সেইজন্যে সন্ন্যাসীও মহারাজ, সিংহাসনে যিনি তিনিও মহারাজ। এর মাঝে যা তা হলো দরিদ্রের জগৎ, আর যত পাপ সেইখানেই। এই দুটো জগৎ নিয়েই আমার কারবার। তোমরা যাদের ঘৃণা করো, আমি তাদের ঘৃণা করি না। আমি তাদের কাজে লাগাই। পাপের সংজ্ঞা জানো। কাকাতুয়ার মতো জ্ঞান কপচিয়ো না। যাদের কোনও কিছুই করার ক্ষমতা নেই, তারাই পাপ আর পুণ্যের বিচারে ব্যস্ত। হয় পাপ করো, আর না হয় পুণ্য করো। মাঝখানে অলস হয়ে বসে থেকো না। হয় সন্ন্যাসী হয়ে আজই বেরিয়ে যাও, এই মুহূর্তে। আর তা না হলে, আমি তোমাকে গড়বো। কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না। তোমার

Pathagar.net

মধ্যে ম্যানেজার হবার সমস্ত গুণ আছে। আমার জীবনে এই প্রথম, একটা ছেলেকে নিজের ছেলে বলে মনে হচ্ছে। তোমার জীবন, তোমার সময় বাজে আদর্শে খরচ করতে তোমাকে আমি দেবো না। কেন, আমার এই আগ্রহ ? একটাই কারণ, তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। আই লাভ ইউ। যাও, নিজেকে প্রস্তুত করো। তোমার বাবাকে তুমি ভীষণ ভালোবাসো। তোমার বাবার সবচেয়ে বড় স্মৃতি তুমি। সেই স্মৃতিসৌধের কথা ভাবো। টাকা থাকলে বিশাল বড় বাড়ি হবে। হাসপাতাল হবে। কারখানা হবে। কর্মকেন্দ্র হবে ; কিন্তু গুণ আর শিক্ষা না থাকলে মানুষ বনমানুষ হয়।'

বিক্রমবাবু আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও পূর্বজন্মের একটা সম্পর্ক থাকে। চিনে নিতে হয়।'

বিক্রমবাবু সকলের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর গাড়ি চলে যাবার শব্দ পেলুম। সবাই বসে রইলুম স্তম্ভিত হয়ে। মা বললেন, 'কিরকম যেন স্বপ্নের মতো লাগছে।'

শ্রদ্ধা মা বললেন, 'সবই তো স্বপ্ন। এতদিন বেঁচে আছি, এই জগৎ এক দীর্ঘ স্বপ্ন। সেই স্বপ্নেই কত কাহিনী।'

উমাদি বললেন, 'যে-কোনও কারণেই হোক, উৎপলকে ভদ্রলোকের ভালো লেগেছে। আমি বুঝি কার্য-কারণ, বুঝি কর্ম আর কর্মফল। আর বুঝি, সুযোগ আরো সুযোগের ব্যবহার। উৎপলের উচিত এই সুযোগ গ্রহণ করা। ভদ্রলোকের কথা শুনে মনে হলো, এর পেছনে আবেগ আর ভালোবাসা ছাড়া আর অন্য কিছু নেই।

আমার সামনে তিনটে পথ খুলে গেল—প্রশান্ত মিত্র আমাকে তাঁর ফার্মের অংশীদার করবেন,যদি আমি আইন পাস করতে পারি। যোশীজি আমাকে বইয়ের ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চান আর ফাদার বিক্রম আমাকে দু'মাসের মধ্যে আমেরিকা পাঠাবেন। আমি কী করবো ?

গভীর রাতে, আমার বাবার ঘরে, আমার বাবার খাটের সামনে, বাবার ছবির সামনে চুপ করে বসলুম। 'বাবা বলুন, আমি কী করব ? তিনজনেই বড়লোক।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই দূরের স্টেশন ভেসে এল—বাবার কণ্ঠস্বর।

'মানুষের মন দেখবে, উৎপল। দেহের সিংহাসনে মনই সম্রাট। যে পরকে আপন করতে জানে, সে হলো মহারাজ। প্রশান্ত অসুস্থ, অপুত্রক, সে তোমাকে লাঠির মতো ব্যবহার করতে চায়। ক্রাচের মতো। সে আগের মতো সুস্থ থাকলে তোমাকে পাত্তাই দিত না। প্রশান্ত হিসেবি খেলোয়াড়। যোশী তোমাকে একজন দক্ষ কর্মচারী ছাড়া আর কিছুই ভাববে না।

pathagar.net

'বিক্রমবাবুর এটা বড়লোকি খেয়াল নয় তো ! বিদেশে গিয়ে বিপদে পড়ে যাবো না তো !'

'বিক্রম খেয়ালি বড়লোক জমিদার। খেয়ালি মানুষ জীবনে বড় হতে পারে না। বড় ডাকাত আর বড় সাধু যে যার এলাকায় সমান সৎ। পাপ আর পুণ্য আপেক্ষিক শব্দ। পৃথিবীতে পাপও নেই, পুণ্যও নেই। আছে কর্ম আর কর্মফল। আছে লক্ষ্য আর লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা।'

'বিক্রম যদি আমাকে গিলে ফেলেন !'

'হজম করতে পারবে না। যাও, বেরিয়ে পড়ো বিশাল জগতে। ছোট হয়ে বেঁচো না। বড় হয়ে বাঁচো।'

'আপনি আমার সঙ্গে আছেন তো !'

'বোকা, আমিই তো সব করাচ্ছি। এখনও অবিশ্বাস !'

হঠাৎ আমার মন খুঁজে পেল, রবীন্দ্রনাথের কবিতার সেই লাইন :

আজ হতে মোর সকল কাজে
তোমার হবে জয়
আমি ছাড়ব সকল ভয়।
মরণকে মোর দোসর করে
রেখে গেছ আমার ঘরে
আমি তারে বরণ করে
রাখব পরানময়।
তোমার তরবারি আমার
করবে বাঁধন ক্ষয়
আমি ছাড়ব সকল ভয়।

সন্তোষদার দোকানটা আবার খুলে গেছে। পেছনে ঝুলছে সন্তোষদার একটা ছবি। সেই সদাহাস্যময় সুন্দর এক মুখ। দোকানে বসেছে তাঁর ছেলে। প্রশান্ত মিত্র এক কথায় দশ হাজার টাকা দিয়েছেন। বিক্রম ফাদার দিয়েছেন আরও দশ হাজার। আমাদের বাড়িটায় ভাঙচুর, অদলবদল শুরু হয়েছে। একজন অবিশ্বাসী আমাকে বোঝাতে এসেছিলেন—তুমি একটা বোকা ইমোশোনাল বাঙালি। লোভী ! বিক্রমের ফাঁদে পা দিয়েছ। ও এইভাবে তোমাদের ভেতর ঢুকে গেল। তোমাকে কায়দা করে পাঠিয়ে দিল দূর বিদেশে। বাঙালির লোভ। কপ্ করে টোপটা গিলে নিলে। এরপর ওইখানে ওর এজেন্ট দিয়ে তোমাকে ছারপোকার মতো টিপে মারবে। তুমি হারিয়ে যাবে চিরতরে।

প্লেনের সিঁড়ি দিয়ে উঠছি। টার্মিনাল বিল্ডিং এর মাথায়, এই এতটুকু,

pathagar.net

এতটুকু ফাদার বিক্রম, আমার দুই মা। রুমাল নাড়ছেন। একবার মনে হলো ফিরে যাই। ফাদার বিক্রমকে চ্যালেঞ্জ করি—'সত্যি করে বলো তোমার উদ্দেশ্যটা কী, শয়তান!'

আমার কাঁধে আলতো একটা হাত পড়ল। চমকে ফিরে তাকালুম। কেউ নেই। কানের কাছে স্পষ্ট আমার পিতার কণ্ঠস্বর—'নীচ মধ্যবিত্ত সন্দেহপরায়ণ বাঙালি বড় কিছু ভাবতে পারে না। সে অন্যকেও বিশ্বাস করে না। নিজেকেও বিশ্বাস করে না।'

দিদির মতো সুন্দরী বিমানসেবিকা নিচু হয়ে বললেন, 'ফাস্‌ন ইওর সিটবেল্ট।' প্লেন একলাফে উঠলো আকাশে। চোখে একটু জল এল। আকাশ কি বিশাল!

Book No

pathagar.net

জয় পরাজয়

॥ ১ ॥

তোমাদের এই ফোয়ারায় আর জল বেরোয় না কেন?" সুকু অবাক হয়ে ফোয়ারার মাঝখানে এঁকেবেঁকে দাঁড়িয়ে থাকা পরীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

শেলি দুঃখু-দুঃখু মুখ করে বলল, "সে অনেক দিন আগে বেরোত। মা মারা যাবার পর সব শুকিয়ে গেছে।"

শেলির সোনালি চুল ফুরফুর বাতাসে উড়ছে। ফুল ফুল সুন্দর ফ্রকে যেন প্রজাপতি। মোমের মতো তেলা মুখ। ফর্সা, সুন্দর। বড় বড় চোখ। উঁচু নাক। সুকুর হঠাৎ মনে হল, ওই পাথরের পরীটার চেয়ে শেলি অনেক সুন্দর।

মোরামের একটা ছোট টুকরো তুলে নিয়ে খটখটে শুকনো ফোয়ারার দিকে ছুড়ে দিল সুকু। পাথরটা বারকতক লাফালাফি করে শান্ত হয়ে পড়ে রইল একপাশে।

সুকু বলললে, "কী করলে আবার জল উঠবে?"

"কে জানে! বাবা বলেছে, ও আর হবে না। আমরাও শুকিয়ে গেছি, ফোয়ারাও শুকিয়ে গেছে।"

শেলি আর খুকু যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেইখান থেকে দেখা যাচ্ছে, দূরে বাংলার বারান্দায়, ভেতরে গোল চোয়ারে শেলির বাবা বসে আছেন। বৃদ্ধ। দুর্ঘটনায় একটা পা বাদ চলে গেছে। চেয়ারের পাশে দেয়ালে ঠেসানো ঝকঝকে একজোড়া অ্যালুমিনিয়ামের ক্রাচ।

শেলি বললে, "দেখছ না, বাগানটার কী অবস্থা হয়েছে। একেবারে জঙ্গল।"

"আবার করলে হয় না?"

"কী হবে, বলো? আমরা তো আর থাকব না।"

"কেন? তোমরা কোথায় যাবে?"

"কোথাও চলে যাব। আমাদের বাংলোটা তো নিয়ে নেবে।"

"কে নেবে?"

"ওই যে কাঠকলের কৈলাসবাবু। অনেক টাকা ধার আছে তো! বাবা তোর আর শোধ করতে পারবে না।"

pathagar.net

"কেন ?"

"ও মা, বাবার একটা পা নেই। চাকরি নেই। পয়সা নেই। কিচ্ছু নেই। কী করে শোধ করবে বলো ? কৈলাসবাবু কোর্টে কেস করেছেন। শুনেছি, জিতেও যাবেন। আর তো কটা দিন। তারপর আমরা চলেই যাব। কোথায় যে যাব ছাই ? জানো সুকু, আমাদের কেউ নেই। কোথাও কেউ নেই। বাবা বলে, ওই যে মাথার ওপর গড আর নীচে আমরা। এই নাকি আমাদের জীবনের গল্প। কী মজা !"

শেলি হাসতে লাগল। সুকু তাকিয়ে রইল তার সুন্দর মুখের দিকে। হাসলে কী হবে, চোখ দুটো ছল ছল করছে।

সুকু বললে, "এই এত বড় সুন্দর বাগান, অমন সুন্দর বাড়ি, সব ছেড়ে তোমরা চলে যাবে ?" শেলি কোনও উত্তর দিল না। দুজন হাঁটতে হাঁটতে বাগানের পশ্চিম দিকে চলল। সূর্য প্রায় ডুবুডুবু। আকাশ আঙরার মতো লাল। কালো কালো রেখার মতো কাক আর অন্য কী সব পাখি লেগে আছে লালের গায়ে।

বাঁ পাশে গোলাপের বেড। যত্ন নেই। তবু কী সুন্দর একটা গোলাপ ফুটে আছে হালকা হলুদ রঙের। শেলি নিচু হয়ে ফুলটা দেখতে দেখতে বললে, 'জানো আমার মা গোলাপ খুব ভালোবাসত। এক সময় আমাদের তিনজন মালি ছিল। তাদের দিয়েই মা সব করাত।'

শেলির মাকে সুকু দেখেছে। এখনও মনে আছে তাঁর চেহারা। সে যেন রানীর মতো। সব সময় সুন্দর সেজেগুজে থাকতেন। গা থেকে হালকা মিষ্টি একটা গন্ধ বেরোত। কথা বলতেন কত আস্তে। যেন গানের মতো।

"তোমাদের অর্গ্যানটা এখনও আছে, শেলি ?"

"না গো, সে সব কবে বিক্রি হয়ে গেছে।"

21 SEP 2005

"কাকে বিক্রি করলে ?"

"চার্চকে। ফাদার ডিসুজা একদিন এসে নিয়ে গেলেন।"

"ইশ্ অর্গ্যানটাকে তোমরা রাখলে পারতে। তুমি এত ভাল গান গাও।"

"ও মা ! তুমি জানো না। আমাদের সবই তো বিক্রি হয়ে গেছে। বিশাল বড় একটা ঘড়ি ছিল। তোমার চেয়েও বড়। সেই ঘড়িটাও চলে গেছে। যাক গে ! কিছু কি আর চিরকাল থাকে।"

শেলি হঠাৎ ছুটতে ছুটতে একেবারে পাঁচিলের কাছে চলে গেল। সেখান থেকে ডাকল, "সুকু।" সন্ধের আকাশে সেই ডাক ভেসে গেল। দূর পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে তিরে এল।

"সুকু, শিগগির দেখবে এসো। শিগগির এসো।"

সুকু ছুটল। শুকনো পাতা আর মোরামের ওপর শব্দে চমকে উঠে একটা গিরগিটি ন্যাজ খাড়া করে ঝোপের দিকে ছুটে গেল।

pathagar.net

পাঁচিলের পাশে সার-সার পিচফলের গাছ। আলতো আলতো ডাল ঝুলে আছে। ছোট ছোট পিচে গাছ ভরে গেছে। সবুজ ভেলভেটের মতো গা।

"দেখেছ সুকু, এবার কত পিচ হয়েছে। গাছ ভরে গেছে। মা মারা যাবার পর এই প্রথম এত ফল ধরল। কী সুন্দর! একটা ফলের গায়ে হাত দাও। ঠিক যেন ভেলভেট।"

সুকু সাবধানে আঙুল ঠেকাল। সারা দিনের রোদে গরম হয়ে আছে। কী ভাল! ঠিক যেন মায়ের গালের মতো।

"কবে পাকবে শেলি?"

"ও বাবা, এখনও ধরো তিন মাস। তারপর থেকে লাল টুকটুকে হবে। এই জায়গাটা এই যে দ্যাখো, এই জায়গাটা ঠিক হয়ে যাবে মানুষের ঠোঁটের মতো। যাক, কৈলাসবাবুর ছেলেমেয়েরা পাড়বে আর খাবে।"

"তোমরা তার আগেই চলে যাবে?"

"হ্যাঁ গো, আমরা তো হেরেই গেছি। আমরা না গেলে কোর্টের লোক এসে আমাদের টেনে বের করে দেবে।"

বাংলোর বারান্দায় বসে বৃদ্ধ গোমেজ বাগানের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ছেলেটা আর মেয়েটা ছুটতে ছুটতে পশ্চিমের দিকে গেল। আঁধার নামছে। গরম কাল। এই সময় করেত সাপের খুব উপদ্রব হয়। ভীষণ বিষাক্ত। ছোট ছোট সাপ। একেবারে সাক্ষাৎ মৃত্যু। ডেডলি। গোমেজ ভারী গলায় ডাকলেন, "সুকু! সুকু! মাই ফ্রেন্ড! শেলি!"

সুকু চমকে উঠল, "এই আংকল ডাকছেন।"

শেলি বলল, "রান।" বলেই ছুটতে শুরু করল।

শেলি ছুটছে। সুকু ছুটছে। পথের মোরামে অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। গাছের পাতায় পাতায় বাতাসের সিপসিপ শ্বাস। বাংলোর ছাদের কোটর থেকে দুটো প্যাঁচা একসঙ্গে ডেকে উঠল। চার্চে ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং করে। রাত নামল।

॥ ২ ॥

রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ। রুকু আধশোয়া। বই পড়ছে। সুকু চেষ্টা করছে পড়ার। মন বসছে না। কিছুতেই মন বসছে না। গোমেজ সায়েবের বাংলো। শেলি। শেলির সোনালি চুল। ডালে-ডালে সবুজ ভেলভেটের মতো পাথরের পরী। সুকুর মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। শেলির সুরেলা ডাক—সুকু, সুকু। বৃদ্ধ গোমেজের গং-এর মতো গলা : সুকু, মাই ফ্রেন্ড!

"দাদা!"

"বল।"

"তোর কত টাকা জমেছে রে?"

pathagar.net

"টাকা ?"

"হ্যাঁ রে, টাকা।"

"দ্যাখ্ না। ওই তো জুতোর বাক্সর মধ্যে আছে। জানিস তো তুই ! গুনে দ্যাখ না।"

"কেন জিজ্ঞেস করছি, বল তো ?"

"বনভোজন। আমি জানি। বৈশাখী-পূর্ণিমা এসে গেল। গতবার যেমন করেছিলিস।"

"না রে, দাদা। বনভোজন নয়। খুব সিরিয়াস। ভীষণ সিরিয়াস ব্যাপার।"

"বুঝেছি। অসুখ করেছে কারুর।"

"ধ্যার্। অসুখ, নো প্রবলেম। বাবা আছে না ! বললেই, হাসপাতাল। ফ্রি চিকিৎসা, ফ্রি ওষুধ।"

"তবে কী ? আর আমার মাথায় আসছে না। তোর তো একশো আট রকম ব্যাপার আছে।"

সুকু জুতোর বাক্সটাকে বিছানায় এনে ফেলল। বুকু ভীষণ একটা বই পড়ছে। কথা বাড়াবার উপায় নেই। সুকু দাদার পায়ের কাছে বসে একে একে নোট, খুচরো সব গুনে ফেলল। মোট পঁয়ত্রিশ টাকা।

"দাদা। এই দাদা।"

"বল না, আমি শুনছি তো।"

"তোর চেয়ে আমি বড়লোক রে দাদা। তোর মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা জমেছে। আর আমার কত হয়েছে জানিস, পঞ্চান্ন।"

"হতেই পারে। তুই যে হাড়-কিপ্‌টে। ওয়ান পাইস ফাদার-মাদার। সাধে বাবা বলে, এবার সংসার সুকুর হাতে ছেড়ে দোব। আর মা বলে, তা হলেই হয়েছে, হোল ফ্যামিললিকে উপোস করে শুকিয়ে মরতে হবে।"

"দাদা, তুই অন্তত আমাকে কিপটে বলিসনি। আমার কত খরচ বল ? চিড়িয়াখানার জন্যে মাসে কত খরচ হয় বল ?"

সে বাবা, তুমি মায়ের আঁচল থেকে ম্যানেজ করো।"

"ওই কথাটি বোলো না। সুকু চোর নয়। আমার বিজনেস আছে রে, দাদা।"

"তোর বিজনেস ?"

"ইয়েস। আমার বদরিপাখির ছটা বাচ্চা তিরিশ টাকায় বিক্রি করেছি। জানো কি তা ?"

"তুই এবার বাঘ পোষ।"

"আমাকে আর-একটু বড় হতে দাও, দাদুর মতো টানজানিয়া চলে যাব। সেখান থেকে সিংহ কিনে আনব।"

pathagar.net

"তার আগে বাঘ দিয়ে হাত পাকা।"

"আচ্ছা দাদা, একটা বাংলোর কত দাম হতে পারে?"

"কী রকম বাংলো?"

"ধর, গোমেজ সায়েবের বাংলোটা।"

"উঃ, ও তো এ-ক্লাস রে। ছবি, ছবি। অনেক দাম হবে। ষাট, সত্তর হাজার।"

"বাবা! ষাট সত্তর। একটা বদরি পাঁচ টাকা। ষাট হাজার টাকায় কটা বদরি হবে রে!"

"পৃথিবীতে অত বদরি নেই রে, সুকু। তুই শুয়ে পড়। বইটা শেষ করে আমি আলো নিভিয়ে দোব।"

মশারি না ফেলেই সুকু চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। মাথার তলায় দু'হাত রেখে। হুঁ হুঁ....সুর ভাজল কিছুক্ষণ। এক সময় নীরব। অন্য দিন শুতে-না-শুতেই ঘুম এসে যায়। আর আর আসছে না। শেলির কথা মনে পড়ছে। শুকনো ফোয়ারা। পিচগাছে ফল ঝুলছে। বৃদ্ধ গোমেজ। দুটো ক্রাচ।

"দাদা।"

"আবার কী হল?"

"গোমেজসাহেবের পা কাটল কী করে?"

"কলকাতায় গিয়েছিলেন। ট্রাম থেকে পড়ে গিয়ে।"

সুকু আবার চুপচাপ ভীষণ ভাবনা। কোথায় যাবেন তিনি, মেয়ের হাত ধরে, বয়েস হয়েছে। এত বড় পৃথিবী! দিনের বেলা তবু একরকম। রাতে ভয়ঙ্কর।

"দাদা।"

"উঃ, তোর 'দাদা'র জ্বালায় পাগল হয়ে যাব।"

"কী পড়ছিস?"

"ট্রেজার আইল্যান্ড। কাল ফেরত দিতে হবে।"

"শোন না।"

"বল না।"

"আমরা বড়লোক না গরিব রে?"

"আমরা মধ্যবিত্ত।"

"যাঃ, বাবা তো ডাক্তার। ডাক্তাররা বড়লোক হয়।"

"তা হলে আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন, তুই যখন জানিস!"

"কৈলাসবাবু বড়লোক?"

"কোন কৈলাস?"

"কাঠ-কৈলাস।"

pathagar.net

"উঃ, সাংঘাতিক বড়লোক। কোটিপতি।"

সুকু আবার চুপচাপ। বাবা এত বড় ডাক্তার আর অশিক্ষিত কৈলাসবাবু কাঠের কারবার করে গাড়ির পর গাড়ি কিনছেন। বাড়ির পর বাড়ি বানাচ্ছেন। তাও লোভ। বৃদ্ধ মাস্টারমশাই গোমেজসায়েবের বাড়িটা কেড়ে নিয়ে, বাবা আর মেয়েকে রাস্তায় নামিয়ে দেবেন।

সুকু বড় করে হাই তুলল। ঘুম আসছে। ঠিক আছে, আমিও একদিন বড়লোক হব। আর তখন আমি বিরাট একটা বাড়ি বানাব। যাদের কেউ নেই, তাদের এক-একটা ঘরে রাখব। ফ্রি থাকা, খাওয়া, চিকিৎসা। একটা স্কুল করব। দাদা হবে হেডমাস্টার।

সুকু ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ ৩ ॥

আকাশের টঙে চাঁদ চড়েছে। চারপাশ ঝিমঝিম করছে চাঁদের আলোয়। গোমেজসায়েব বাংলোর বারান্দায় বসে আছেন। শেলি ঘুমিয়ে পড়েছে। বৃদ্ধের চোখে ঘুম নেই। ঘুম আর আসে না। মেয়ের হাত ধরে ওই গেট পেরিয়ে এই বাড়ি থেকে একদিন বেরিয়ে যেতে হবে। কোথাও যেতে হবে। কিন্তু কোথায়!

শরীরে এখনও শক্তি আছে। সকাল বিকেল ছেলেমেয়ে পড়িয়ে রোজগার হয়। দু'জনের সংসার চলে যায়। অ্যালবার্ট একটা পোড়োবাড়ি ভাড়ায় ঠিক করে দেবে বলেছে। শহরের ও-মাথায়। কম ভাড়ায়। জায়গাটা ভারি নির্জন। তা হোক। এ-দিকে রোজই ডাকাতি হচ্ছে। তা হোক। যার কিছুই নেই, ডাকাত তার কী করবে!

কষ্টে আর কষ্ট নেই। শুধু দুঃখ, এমন সুন্দর একটা বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে!

বাবা ছিলেন ইংরেজ আমলের জেলাশাসক। দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল। ওই আস্তাবলে থাকত দুটো ঘোড়া। সাদা আর কালো। একটার নাম ছিল টিউলিপ, আর একটার নাম ছিল ডিউক। কী সুন্দর একটা ফিটন-গাড়ি ছিল, রুপোর কাজ করা!

গোমেজ ক্রাচে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে এলেন, মোরাম বিছানো বাগানের পথে। চাঁদের আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে। খই-সাদা ফুল ফুটে আছে গাছে-গাছে। গোমেজ হাঁটতে-হাঁটতে চলে গেলেন বাগানের উত্তরে। শেষ মাথায় সেই আস্তাবল। হাহা করছে। বাতাসে উড়ে এসেছে গাছের শুকনো পাতা। বাইরের চাঁদের আলোয় অস্পষ্ট সবই দেখা যাচ্ছে। ভাঙা ফিটনের কঙ্কাল। দেয়ালে ঠেসানো দুটো চাকা।

pathagar.net

গোমেজ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। অতীতের সব কিছু যেন দেখতে পাচ্ছেন। শুনতে পাচ্ছেন ঘোড়া দুটোর পা ঠোকার শব্দ। নিশ্বাসের ফোঁস-ফোঁস। দূরে বাংলোটার দিকে ফিরে তাকালেন। অন্ধকার হয়ে আছে। এক সময় ঘরে-ঘরে আলো জ্বলত। এ-বাড়িতে আগে কখনও রাত নামত না। ফুটফুটে হয়ে ফুটে থাকত। গরম বাতাস বেরিয়ে যাবার চিমনিতে পাশাপাশি বসে আছে একজোড়া প্যাঁচা।

এই সেই আউটহাউস। দরজা জানলা ভেঙে-ভেঙে, খুলে-খুলে পড়ে গেছে। এখানে থাকত দরোয়ান, বাবুর্চি, আরও অনেকে। বিরাট এক দলবল। গরমকালে এই বাইরেটায় খাটিয়া পেতে সব শুয়ে থাকত।

বিশাল কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় একটা পাথর পড়ে আছে চৌকোমতো। গোমেজ তার ওপর বসে ক্রাচটাকে পাশে শুইয়ে রাখলেন। বেশ শীত-শীত একটা বাতাস আসছে পাহাড়ের দিক থেকে। জ্যাকেটের কলার দুটো উঁচু করে দিয়ে, গাছের তলায়, আলো-আঁধারে চুপ করে বসে রইলেন গোমেজ। কোথাও কেউ যেন ককিয়ে কেঁদে উঠল। অন্য কেউ হলে ভয় পেয়ে যেত। গোমেজ জানেন, এ হল এক ধরনের পাখির ছানা। থেকে থেকে কেঁদে ওঠে।

গোমেজ ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছেন, এই বাংলোর চৌহদ্দির মধ্যে, কোনও এক জায়গায় পূর্বপুরুষের আমলের অনেক ধনরত্ন পোঁতা আছে। কেউ বিশ্বাস করতেন, কেউ করতেন না। কোনওদিন কেউ অনুসন্ধান করেননি। পূর্বপুরুষেরা সব বড়লোক ছিলেন। প্রথম জীবনে গোমেজও কখনও গুপ্তধন নিয়ে মাথা ঘামাননি। এখন মাঝে-মাঝে ভাবেন। খুঁজে পেলে এই সময়ে খুব কাজে লেগে যেত। কোথায় থাকতে পারে! যে পাথরটার ওপর বসে আছেন, তার তলায়? পাথরটা বহুদিন একইভাবে একই জায়গায় পড়ে আছে। কত কী নড়েচড়ে গেল, পাথরটা কেন নড়ল না? বিশাল পাথর। গোমেজের একার ক্ষমতায় নড়ানো যাবে না। আর কোথায় থাকতে পারে সেই গুপ্তধন! আস্তাবলের মেঝের তলায়? আউট হাউসের পেছনে? কোথায়, কোথায়?

উত্তেজিত গোমেজ আবার উঠে পড়লেন। ক্রাচে ভর দিয়ে সারা বাগানে ঘুরতে লাগলেন ভূতের মতো। একে আর বাগান বলা যায় না। সবুজ ঘাসে ঢাকা অত যত্নের লন নষ্ট হয়ে গেছে। ছোটখাটো বাহারি ফুলগাছ আর নেই বললেই চলে।

ঘুরতে-ঘুরতে গোমেজ শুকনো ফোয়ারার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আকাশে নিটোল চাঁদ। আলোর ঝরনাধারায় পাথরের পরী যেন জীবন্ত হয়ে উঠতে চাইছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে গোমেজের গা ছমছম করে উঠল। মাথার ওপর উপুড় হয়ে আছে বিশাল আকাশ। এখানে-ওখানে নিশ্চল

pathagar.net

তারার ফোঁটা-ফোঁটা চোখ। দূরে ধোঁয়া-ধোঁয়া পাহাড়। গাছের পাতায়-পাতায় মাঝরাতের বাতাসের ভুতুড়ে নিশ্বাস।

গোমেজ বাংলোর বারান্দার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। কে যেন দাঁড়িয়ে। বাতাসে সোনালি চুল উড়ছে। গাউনের প্রান্ত ফুলে-ফুলে উঠছে। কে ? শেলি ? না তো ! দীর্ঘ লম্বা চেহারা গোমেজ ভাল করে তাকালেন। না, কেউ নেই। চোখের ভুল।

তবু ভয় পেলেন। তারপর নিজের মনেই হাসলেন, ছেলেমানুষ নাকি যে ভূতের ভয় পাবেন। পরীর দিকে তাকালেন। নড়ছে নাকি ? নেমে আসবে এখুনি !

লোহার বেঞ্চে বসে পড়লেন। এক পায়ে দাঁড়ানো যায় না বেশিক্ষণ। রাতের বাতাসে লোহা শীতল। বেশ লাগছে। বসে থাকতে থাকতে গোমেজের মনে হয়, ফোয়ারার তলায় সেই গুপ্তধন নেই তো ! কোথাও না কোথাও আছে নিশ্চয়। এতকালের বিশ্বাস ! কিন্তু কোথায় ! পেলে বড় ভালো হত। টাকার ভীষণ প্রয়োজন। এই বাংলোতেই তিনি মরতে চান।

কর্কশ স্বরে প্যাঁচা ডেকে উঠল বারকতক।

গোমেজের চোখ জড়িয়ে আসছে ক্রমশ। শেষ রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে মাথা ঝুলে আসছে বুকের দিকে। গোমেজ ঘুমিয়ে পড়লেন। আর কোনও খেয়াল নেই, কী হচ্ছে চারপাশে। চাঁদ পশ্চিমে হেলছে। রাত ক্রমশই ভোরের দিকে এগোচ্ছে।

সাদা গাউন-পরা সে নারীমূর্তি গোমেজের সামনে। মুখ দেখা যাচ্ছে না স্পষ্ট। ধোঁয়াটে ওড়নায় মুখ ঢাকা। চিকচিক করছে অভ্র।

"কে তুমি ? মুখ দেখাও।"

মূর্তি ইশারায় গোমেজকে পেছন-পেছন আসতে বললে।

গোমেজ তড়াক করে লোহার বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কিছু দূর আসার পর গোমেজ অবাক হয়ে গেলেন। ক্রাচ ছাড়াই হাঁটছেন। কী করে ? আরে, দুটো পা'ই তো রয়েছে তাঁর। কী আশ্চর্য ! পা তাহলে বাদ যায়নি ! ভীষণ আনন্দ হল তাঁর।

মূর্তি যেন ভেসে ভেসে এগিয়ে চলেছে আস্তাবলের দিকে। গোমেজ যত জোরেই হাঁটুন, দু'হাত দূরত্ব আর কিছুতেই কমছে না। আস্তাবলের অন্ধকারে ঢুকে গেল সেই গাউন-পরা নারী। অন্ধকার ঘরের সামনে থেমে পড়েছেন গোমেজ। ভাবছেন, ঢুকছেন কি ঢুকবেন না। ওপাশের দেয়ালের কাঁছে দাঁড়িয়ে মূর্তি ইশারায় জানাল, "চলো এসো।"

গোমেজ ভেতরে ঢুকলেন। এক সময় কাঠের সে বিশাল পাত্রে ঘোড়া দানা খেত, মূর্তি ইশারায় সেই পাত্রটা দেখাল।

pathagar.net

গোমেজ প্রশ্ন করলেন, "কী আছে এখানে,?"

মূর্তি এবার পাত্রের মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।

গোমেজ জোরে বললেন, "কী আছে ভেতরে ?"

মূর্তি নিঃশব্দে হাসল। মুখ দেখা যাচ্ছে না। ওড়নার আড়ালে একসার দাঁত ঝিলিক মেরে উঠল।

গোমেজ আবার প্রশ্ন করলেন, "কী আছে ওখানে ?"

মূর্তি ক্রমশ ধোঁয়াটে হতে লাগল। সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলিতে পাত্র কানায়-কানায় পরিপূর্ণ। টলটল করছে জলের মতো। সুতোর মতো উড়ছে চারপাশে।

গোমেজ ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। ঘুম ভেঙে গেল। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল বুঝতে, তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু এ কি! শুয়ে আছেন আস্তাবলের ঠাণ্ডা কোদলানো মেঝেতে। তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন। ক্রাচ দুটো পাশে নেই। তা হলে ? ভয়ে ভয়ে তাকালেন পায়ের দিকে। সত্যিই কি তা হলে কাটা পা'টা ফিরে এল।

ভীষণ ধাক্কা খেলেন। মেঝের ওপর পড়ে আছে সেই একটা পা। আর একটা পা হাঁটুর কাছে এসে শেষ হয়ে গেছে। বাকিটা নেই। একটা পা চলে যাবার বেদনা প্রায় ভুলেই এসেছিলেন। আজ সেই দুঃখ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

বাইরে গোলাপি ভোর। অজস্র পাখি ডাকছে। গোমেজ কেঁদে ফেললেন। আজ যদি দুটো পা থাকত, তা হলে একবার দেখে নিতেন। দুঃখের সঙ্গে লড়াই কাকে বলে। দূর থেকে শেলির ডাক ভেসে আসছে....

"বাবা, তুমি কোথায় গেলে। বাবা!"

গোমেজ একটা পায়ে ভর রেখে, দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়ালেন। এক পায়ে লাফাতে লাফাতে কোনও রকমে এগিয়ে গেলেন দরজার কাছে। চিৎকার করে বললেন, "আমি এইখানে। শেলি, আমার ক্রাচ দুটো নিয়ে আয়।"

শেলি ক্রাচ দুটো নিয়ে ছুটতে ছুটতে এল। খুব জোরে ছুটছে। হাঁপাচ্ছে। "তুমি এখানে কী করে এলে, বাবা ?"

"কী করে ?"

গোমেজ বোকার মতো তাকিয়ে রইলেন মেয়ের মুখের দিকে। জানেন না। এলেন কী করে। স্পষ্ট স্বপ্ন। দু'পায়ে জোরে জোরে হেঁটেছেন। নিশ্চয় হেঁটেছেন, তা না হলে এলেন কী করে ? কোথায় ফোয়ারার সামনে লোহার বেঞ্চ, আর কোথায় এই আস্তাবল! দূরত্ব তো কম নয়! বড় গোলমেলে ব্যাপার। পরে ভেবে দেখবেন। মেয়েকে বললেন, "দেখে আয় তো মা, ওই ডাব্বাটার ভেতর কী আছে।"

শেলি ভয়ে ভয়ে ডাব্বাটার দিকে এগিয়ে গেল। ডাব্বাটা প্রায় তার মতোই উঁচু। ঝুঁকে নিচু হয়ে ভাল করে দেখে বললে, "বাবা, শোনো।"

pathagar.net

"কেন রে।"

"এসো না তুমি।"

গোমেজ ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন।

"তলায় কী একটা পড়ে রয়েছে দ্যাখো।"

গোমেজ ঝুঁকে পড়ে দেখলেন। তেমন আলো নেই তো। তবু মনে হচ্ছে তলায় একটা পেতলের চাবির মতো কী পড়ে আছে। বেশ বড় চাবি।

"মনে হচ্ছে একটা চাবি পড়ে আছে। তুই নেমে তুলে আনতে পারবি মা?"

"না বাবা। এটা অনেক উঁচু। সুকুকে ডেকে আনব, বাবা? ও পারবে।"

"না, এখন থাক। পরে হবে।"

গোমেজ ক্রাচ ভর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। পেছনে শেলি। গোমেজ ভাবতে-ভাবতে আপন মনে বাংলার দিকে এগোচ্ছেন। খুব রহস্যজনক ব্যাপার। সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে ধরতে পারছেন না। যা ছিল না, তা এল কী করে? পা এল কোথা থেকে? আবার গেলই বা কোথায়? চাবি? চাবিটা কার? কিসের চাবি? কবে থেকে পড়ে আছে ওই ডাব্বার ভেতর?

॥ ৪ ॥

বেলা দুপুর। কৈলাসবাবুর কাঠচেরাই-কলের সামনে সুকু দাঁড়িয়ে আছে। বগলে বই। স্কুল থেকে বেরিয়ে এসেছে ছুটি করে। কৈলাসবাবুর বিশাল বাড়ি একপাশে। আর একপাশে বিশাল কল।

বৈদ্যুতিক চেরাই কলে কাঠ ফাঁড়ার শব্দে সুকুর বুক কেঁপে উঠছে। অদ্ভুত একটা তীক্ষ্ণ শব্দ। কাঠের মৃত্যু-আর্তনাদ। গা শিউরে ওঠে। গভীর রাতে এই নিষ্ঠুর শব্দ শুনলে সুকু আরও ভয় পেত। সুকুর মন বললে, "যারা কাঠ চেরাই করে, তারা মোটেই ভাল লোক নয়। সুকু, খুব সাবধান।"

চারপাশে নরম-নরম কাঠের গুঁড়ো ছড়িয়ে আছে। বাতাসে ভেজা কাঠের গন্ধ। ঝিঁআঁক, সিঁআঁক করে ধারালো করাত চলছে।

কৈলাসবাবুর দুটো হাতি পাশের একটা খোলা মাঠে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে রোদে বোকার মতো। মাঝে-মাঝে শুঁড় দোলাচ্ছে। খুব পয়সা হয়েছে কৈলাসবাবুর। নতুন একটা মোটরগাড়ি রোদে ঝকঝক করছে।

সুকু ধীরে ধীরে কৈলাসবাবুর গদি-ঘরে ঢুকল। দেয়াল নীল রঙে ক্যাট-ক্যাট করছে। রাজ্যের দেবদেবীর ছবি ঝুলছে। মোটা-মোটা চেহারার তিনটে লোক ধবধবে সাদা গদিতে বসে মৌজ করে শিঙাড়া খাচ্ছে। মনে হয়, খুব ঝাল। সকলেরই চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। একজন আবার হুসহাস্ শব্দ করছে।

pathagar.net

সুকুকে দেখে একজন বললে, "কী চাই, খোকা।"

সুকুর মাথায় দুষ্টুমি বুদ্ধি খেলে গেল। একগাল হেসে বললে, "আমি কৈলাসকাকুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"কাকু যে এখন ঘুমোচ্ছে, খোকাবাবু। কী চাই চাঁদা ?

"না মেসোমশাই, আমার বাবা ডক্টর মুখার্জি, কাকুর কাছে একটা খবর নেবার জন্যে পাঠিয়েছেন।"

"ও, তুমি ডাক্তারবাবুর ছেলে ? কোন ছেলে ?"

"ছোট ছেলে।"

"আরে, বোসো বোসো। এই নাও সামোসা খাও।"

অনেক আগেই সুকুর একটু-একটু লোভ হচ্ছিল। ঠোঙা থেকে বড় সাইজের গরম একটা শিঙাড়া তুলে নিল। খাঁটি ঘিয়ে ভাজা চমৎকার জিনিস।

হু হা করতে করতে লোকটি বললে, "তোমার বাবা বহুত ভাল লোক। একেবারে দেওতা। সেবার আমার মেয়েকে যেভাবে ভালো করে দিলেন! বুঝলেন মিশিরজি, একেবারে, এক নম্বর আদমি।"

"হাঁ, হাঁ, সো বাত তো ঠিকই হ্যা। হাম আজ সামোসা খাতা হ্যায়, দু' বরষ পহেলে..."

"আরে, তোমার তো তখন পানি খেলেও হজম হত না।"

"হাঁ, সো বাত ঠিকই হ্যায়।"

আর-একটা শিঙাড়া নেবার জন্যে মিশিরজি হাত বাড়াচ্ছিল, যে কথা বলছিল, চট করে ঠোঙাটা সরিয়ে নিল, "নেহি। তোমহারা খতম হো গিয়া জি।"

"হুয়া ? ক্যায়সে হুয়া ?"

"য্যায়সে হোতা হ্যায়, ওইসে হো গিয়া।"

সুকুর দিকে ফিরে লোকটি গম্ভীর মুখে বললে, "তোমার বাবার কাছে একদিন যেতে হবে। মাঝে-মাঝে বুকটা ব্যথা করে ওঠে। তোমার জানা আছে, হার্টের অসুখে কোন দিকটা ব্যথা করে ?"

সুকু বাবার চেয়েও গম্ভীর গলায় বললে, "আপনার কোন দিকটা করে ?"

"বাঁ দিক।"

সুকু অভিজ্ঞের মতো শুধু একটা হুঁ শব্দ করল। যার মানে, ধরেছে, বলার আর কিছু নেই।

"বাঁ দিকেই করে, তাই না ?"

সুকু বললে, "হুঁ।"

"এই শিঙাড়াটা তুমিই তা হলে খেয়ে নাও। একটু সাবধান হওয়াই ভাল। ঝপ করে মরে গেলে শিঙাড়া আর কে খাবে!"

pathagar.net

সুকু এরকম শিঙাড়া গোটাচারেক সহজেই খেতে পারে।

চুলে ঘিয়ের হাত মুছে লোকটি লাল-রঙা টেলিফোনের রিসিভার কানে তুলে একটা বোতাম টিপল। "কে, বড়বাবু ? ডক্‌টার মুখার্জির লেড়কা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে,.....উল্লু ? হাম ! নেহি সাব, হাম উল্লু নেহি, বদরিপ্রসাদ হো....হাঁ, ও বাত ঠিকই হ্যা। উল্লুকা মাফিক কাম কিয়া হোগা !....ভেজ দুঙ্গা ? ঠিক হায় সাব।"

রিসিভার নামিয়ে রেখে হাসি-হাসি মুখে সুকুর দিকে তাকিয়ে বললে, "বহুত গালি দিয়া। উল্লু বোলা। হাম ভাল্লু হো সেকতা। উল্লু কভি নেহি। যাও, চলে যাও ভেতরে। বাবু দোতলায় আরাম করছেন।"

সুকু যেতে যেতে ভাবল, "এর নাম চাকরি ! উল্লুক, ভাল্লুক, যা খুশি বলবে, আর মুখ বুজে সহ্য করতে হবে। জীবনে আমি চাকরি করব না। ব্যবসা করব। ব্যবসা।"

লোকটা পাগলের মতো একটা বাড়ি বানিয়েছে। কী নেই ? রামধনু রঙের। দেউড়িতে পোশাক-পরা, গালপাট্টাঅলা দরোয়ান।

"এ লেড়কা, যায়েগা কাঁহা ?

দোতলার বারান্দা থেকে মেয়েলি গলায় কে বললে, "আনে দো।"

সুকু ঘাড় উঁচু করে দেখল, চেক-চেক লুঙ্গি পরা এক দৈত্য। দোতলায় উঠে বুঝল, উনিই সেই বিখ্যাত কাঠ-কৈলাস। থলথলে বিশাল শরীর। গোলগোল চোখ। জিবেগজার মতো নাক। গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি। গলায় ঝুলছে হাতির দাঁতের লকেট।

মেয়েদের মতো গলায় বললে, "তুমি ডাক্তারবাবুর ছেলে !"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এসো, এসো।"

কৈলাসবাবুর পেছন-পেছন যে ঘরে এসে ঢুকল, সেটাকে ঘর না বলে দোকান বলাই ভাল। রাজ্যের জিনিস দিয়ে এমন ভাবে সাজানো। বিশাল সোফায় সুকু যেন তলিয়ে গেল।

উল্টো দিকে ঠ্যাঙের ওর ঠ্যাঙ তুলে অসভ্যের মতো বসেছে কাঠকৈলাস। ভুঁড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বললে, "লস্যি খাবে, লস্যি ?"

সুকু ঘাড় নাড়ল। সে সব খাবে। খেয়ে ফাঁক করে দেবে।

"গোদা। গোদা। আরে, এ গোদা।"

নাম গোদা। চেহারায় টিকিটিকি।

"দো গ্লাস গোলাপি লস্যি লে আও।"

লোকটা চলে গেল নেচে নেচে।

হেউ করে একটা ঢেঁকুর তুলে কৈলাস বললে, "তোমার পিতাঠাকুর

pathagar.net

দেবতা। আমাদের এই শহরে তাঁর একটা মূর্তি স্থাপন করব।"

সুকুর ভীষণ রাগ হল। লোকটা বাবার মৃত্যুর কথা ভাবছে। বাবার আগেই তো তুমি জল-ভরা ঠোঙার মতো ফেঁসে যাবে। চেহারার যা ছিরি হয়েছে।

কৈলাস বললো, "তা বলো, তোমার পিতা কী জন্যে পাঠালেন তোমাকে ? অনেক দিন আগে কাঠের কথা বলেছিলেন। ফার্নিচার করাবেন।"

সুকু অনেক চেষ্টা করে রাগ কমিয়ে ফেলল। এখন তাকে বেশ মেলায়েম করে কথা বলতে হবে।

"কাকাবাবু !"

কৈলাস অবাক হয়ে সুকুর মুখের দিকে তাকাল।

"কাকাবাবু, আপনার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে।"

"আমার কাছে ? প্রার্থনা তো ঈশ্বরের কাছে করে। চাঁদা চাইতে এসেছ ? ডোনেশান ?

"না, ডোনেশান নয়।"

"তবে ?"

গোদা বড় বড় দু'গেলাস লস্যি এনে সামনের নিচু টেবিলে রেখে নেচে নেচে চলে গেল।

"কাকাবাবু, আপনি ওদের ছেড়ে দিন।"

"অ্যাঁ, কাকে ছাড়ব ? আমি কি পুলিশ ! ধরে রেখেছি কাউকে ?"

"গোমেজ-স্যারের বাড়িটা নেবেন না। বৃদ্ধ মানুষ। একটা পা নেই। বাচ্চা একটা মেয়ে। বাড়িটা নিয়ে নিলে ওরা কোথায় যাবে ?"

"জাহান্নামে যাবে।"

সুকুর ইচ্ছে করল লস্যির গেলাসটা সঙ্গে-সঙ্গে মুখে ছুড়ে মারে।

"জাহান্নামে যাবে ?"

"হ্যাঁ। পঁচিশ হাজার টাকা সুদে বেড়ে হাজার পঞ্চাশ হয়েছে। টাকা ইজ টাকা। টাকার ব্যাপারে দয়ামায়া চলে না খোকাবাবু। তা ছাড়া ওই বাংলোটার ওপর আমার অনেক দিনের লোভ। দ্যাট ইজ দি বেস্ট। খাসা, খুবসুরত, ওয়ান্ডারফুল। নাও লস্যি। লস্যি খাও।"

"কাকু, আপনার তো অনেক টাকা ! বিশাল বড়লোক ! মাস্টারমশাইয়ের বাংলোটা আপনি ছেড়ে দিতে পারবেন না ?"

"না।"

"কত টাকা পাওনা ?"

"কেন, তুমি শোধ করে দেবে ? পঞ্চাশ হাজার। ফিফটি থাউজান্ড।"

কৈলাস খিলখিল করে হাসছে। পুরু ঠোঁটে লস্যির মাঠা জড়িয়ে গেছে। ক্লাউনের মতো দেখাচ্ছে।

pathagar.net

"পঞ্চাশ হাজার! ধার নিয়েছিল পঁচিশ, হয়ে গেল পঞ্চাশ?"

"আরে বাবা, টাকায় টাকা সুদ। সুদেই তো বড়লোক করে। ব্যবসা শেখো, খোকাবাবু। ব্যবসা। তোমার পিতা অত পড়ে বিলেত গিয়ে মাসে যা কামাই করেন, আমি তা একদিনে করি। আমার বিদ্যা! ঘোড়ার ডিম। হর্স-এগ।"

হাসতে গিয়ে বিষম খেল কৈলাস।

সুকু উঠে পড়ল।

কী হল, লস্যি খাবে না?

"না।"

"গোঁস্‌সা হল কি? খোকাবাবু, মানুষ দয়া করতে পারে না। দয়া করবেন ঈশ্বর। দি অলমাইটি গড। তোমার পিতারও তো অনেক রোজগার। বলো না, ওদের হয়ে টাকাটা দিয়ে দিতে। বলে দ্যাখো না, তিনিও ওই কথাই বলবেন। টাকা রোজগারের জিনিস। কামাইয়ের জিনিস। গাছে ফলে না। পাতার মতো ঝরে পড়ে না। মালুম? লোও, লস্যি লোও?"

সুকু অ্যাবাউট টার্ন করে সোজা বাইরে। কৈলাস খিলখিলিয়ে হাসছে। সেতনির মতো। সুকু হাঁটতে-হাঁটতে লোধাটুলি পেরিয়ে, টিলার পাশ দিয়ে, শালবনের ভেতর দিয়ে একেবারে শহরের বাইরে। বিকেল হয়ে গেছে। সুকু যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, সে-জায়গাটা উঁচু। অনেক উঁচু। সামনে জমি নিচু হতে হতে, ভেঙে ভেঙে চলে গেছে একেবারে পায়ের তলায়। সেখানে একটা জঙ্গল একেবারে এক দৌড়ে চলে গেছে দূর পাহাড়ে।

ধোঁয়া ধোঁয়া, কেমন যেন একটা অস্পষ্ট পরিবেশ। বড় কঠিন জায়গা। সহজে কেউ যেতে পারবে না। গেলেও হারিয়ে যাবে। আরি ফিরবে না কোনও দিন।

বিশাল একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় সুকু বসে পড়ল। কী করা যায়! পঞ্চাশ হাজার। সহজ ব্যাপার! আকাশের গায়ে পাহাড়ের রঙ আরও নীল হয়ে যাচ্ছে। একটা ছায়া নেমে আসছে সামনের মালভূমিতে। সারা দিন পৃথিবী তেতেছে। যেই এবার ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছে, বাষ্প ফিরে আসছে চারপাশ থেকে।

সুকু একা বসে আছে। চুপচাপ। নানারকম পোকামাকড়, হয়তো সাপও, মাঝে-মাঝে চলে যাচ্ছে এ-পাশ ও-পাশ দিয়ে। চিরকালই সুকুর ভয়ডর কম। সে গ্রাহ্যই করছে না। গোমেজের কথা ভাবছে। ভাবছে শেলির কথা।

"কাঠ-কৈলাস! তুই বেটা মানুষ?"

ধীরে-ধীরে সূর্য নেমে গেল পশ্চিমে। ঝাঁ ঝাঁ রাত ছুটে আসছে পাহাড়ের দিক থেকে। সুকুর খেয়াল নেই।

pathagar.net

॥ ৫ ॥

সুকু আসছে না দেখে, গোমেজ অতি কষ্টে বাঁকা তার ছড়ির মাথায় লাগিয়ে কাঠের ডাব্বা থেকে সেই চাবিটা তুলে আনলেন। বেশ বড় মাপের চাবি। এমন চাবি গোমেজ আগে কখনও দেখেননি। চারপাশে লতাপাতার কাজ করা পেতলের চাবি। স্বপ্নলোকের দরজা খুলবে, না কি রূপকথার জগতে নিয়ে যাবে!

নরম ছাই আর নরম ন্যাকড়া দিয়ে বাগানের লোহার বেন্‌চে বসে গোমেজ ঘষে ঘষে চাবিটাকে সোনার মতো করে ফেললেন। ঘষেন আর ভাবেন, কোথাকার চাবি? কিসের চাবি? এতকাল ছিল কোথায়? এল কোথা থেকে? এ-বাড়িতে এত জিনিস, কোথায় কী আছে ভালোভাবে জানেন না নিজেই। পায়ের জন্যে সে-ভাবে চলাফেরাও করতে পারেন না।

শেলিকে ডাকলেন। চাবিটা হাতে দিয়ে বললেন, "দ্যাখ তো মা, এটা দিয়ে কী খোলে?"

আর ঠিক সেই সময় সুকু এসে হাজির। সন্ধে হয়ে এসেছে। জঙ্গলের ধারে ফেউ আর বুনো কুকুর ডাকছে।

"এই দ্যাখো সুকু, কী সুন্দর একটা চাবি!"

সুকু চাবিটা দেখে অবাক হয়ে গেল। এমন চাবি সে জীবনে দেখেনি।

সে এক ভীষণ উত্তেজনা! সুকু আর শেলি দু'জনে খুঁজছে, এ চাবি কিসের চাবি! কী খুলবে এ-চাবিতে। বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে আছেন বৃদ্ধ গোমেজ। কপালে ঝুলে আছে কাঁচাপাকা চুলের গোছা। দেওয়ালে খাড়া একজোড়া অ্যালুমিনিয়াম ক্রাচ। বসে বসে শুনছেন, সারা বাড়িতে একজোড়া কিশোর-কিশোরীর পায়ের শব্দ। গোমেজ স্বপ্ন দেখছেন, এরা যদি এইভাবেই সারাজীবন, এই মন নিয়ে পাশাপাশি ঘুরতে পারত! তা হলে বড় শান্তি নিয়ে মরতে পারতেন! সুকু ছেলেটার কোনও তুলনা হয় না। তা কি আর হয়! এতকাল বেঁচে আছেন, একটা কিছু ভাল হয়নি। কিচ্ছু না। তবু! চাবিটা এল কীভাবে! স্বপ্নে বাগানের বেঞ্চি থেকে ক্রাচ ছাড়া আস্তাবল অবধি গেলেন কী করে! গোমেজ ভাবছেন। কূলকিনারা নেই ভাবনার।

ঘরের পর ঘর। বিশাল-বিশাল ঘর। সুকু আর শেলি জমে গেছে। সব ঘরই ধুলো আর ঝুলে ভরা। কে পরিষ্কার করবে! লোকজন নেই ঘরে ঘরে আলমারি, ড্রয়ার, দেওয়াল-আলমারি, লোহার সিন্দুক। বিলেতে তৈরি।

দুজনে একটা করে জিনিসে চাবি ঢোকায়। পাক মারে। খোলে না। আবার অন্যটায়। শেলি এক সময় সুকুর কাঁধে মাথা রেখে বলে, 'ওঃ গড, আর পারছি না।"

pathagar.net

সুকুর ঘাড়ে, বুকে লুটিয়ে পড়েছে শেলির সোনালি চুল। নাকের কাছে উশখুশ করছে একটা চুল। সামনের দেওয়ালে বিবর্ণ এক তৈলচিত্র। শেলির মায়ের। লেস-দেওয়া গাউন পরে সুন্দর এক চেয়ারে বসে আছেন সুন্দরী মহিলা।

সুকু বললে, "আমার যা খিদে পেয়েছে না! পেট জ্বলে যাচ্ছে।"

"দাঁড়াও না, একটু পরে তোমাকে আমি স্যান্ডউইচ খাওয়াব।"

পেছনের বারান্দার একপাশে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি। উঠে গেছে ছোট্ট একটা কুঠুরিতে। শেলি বললে, "দাঁড়াও, আমি বাতি ধরে আগে আগে উঠি। তুমি সাবধানে এসো পেছনে-পেছনে। দু'একটা ইঁদুর-টিঁদুর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লে ভয় পেও না।"

"ভয়!" সুকু হাসল।

ভয় কাকে বলে সুকু জানে না।

ভীষণ অন্ধকার এক চোরকুঠুরি। মোমবাতির কাঁপা-কাঁপা আলোয় ভয়ঙ্কর ভাঙাচোরা চেয়ার। ছেঁড়া তাদের গদি। ল্যাম্প স্ট্যান্ড। তাল-তোবড়ানো শেড। সুকুর পায়ের ওপর দিয়ে খচমচ করে কী একটা চলে গেল। মনে হয় ধেড়ে ইঁদুর।

শেলি বলল, "এই কুঠুরিতে আগে আমি কখনও আসিনি ভয়ে।"

"আজ প্রথম এলে?"

"হ্যাঁ।"

"কী মজা! তবে ভীষণ গরম।"

খুঁজতে খুঁজতে, এক কোণে দেখা গেল অদ্ভুত একটা সিন্দুক। লম্বা-লম্বা পেতলের পাটি বসানো। টেনেটুনে মালপত্তর সরাতেই সিন্দুকটা বেরিয়ে পড়ল। রূপ দেখে শেলি আর সুকু দু'জনেই হাঁ। জলদস্যুর গল্পে এই রকম সিন্দুকের ছবি দেখা যায়।

সুকু হাঁটু গেড়ে বসে চাবি লাগাল। ঘোরাতেই খুলে গেল তালা। উত্তেজনায় সুকুর শরীর কাঁপছে। শেলি আনন্দে সুকুকে জড়িয়ে ধরেছে পেছন থেকে। দুজনে অনেকক্ষণ রইল ওইভাবে। সুকু কেবল ভাবছে, এটা যদি রাজা সলোমনের সিন্দুক হয়ে যায়! ডালা খোলামাত্রই শেলির জন্য বেরিয়ে আসে মুঠোমুঠো মণি, মাণিক্য, রত্ন!

সুকুর বুকের দু'পাশে ঝুলছে শেলির গোলগোল হাত। পিঠের ওপর তার গোটা শরীরের ভার। শেলির হাত দুটো মুঠোয় ধরে সুকু বললে, "এবার খুলি তা হলে! খুলে দেখি কী আছে!"

শেলি ফিসফিস করে বললে, "আমার ভয় করছে। যদি অন্য কিছু থাকে?"

pathagar.net

"অন্য কিছু মানে ?"

"ধরো যদি আস্ত একটা কঙ্কাল থাকে।"

"কঙ্কাল ? কঙ্কাল থাকবে কেন ? তোমার কী মাথা !"

শেলি বিজ্ঞের মতো বললে, "অনেক সময় থাকে গো। ইংরেজি গল্পের বইয়ে আমি পড়েছি।

"খুব করেছ।"

সুকু উঠল। সিন্দুকের ডালা ধরে টানল। ভীষণ ভারী। তা হোক। সুকুর শরীরে কম জোর ! ধীরে-ধীরে ডালা খুলল। অনেক দূর পর্যন্ত ভেতরে থই-থই অন্ধকার। শেলি বাতিটা কাছে নিয়ে এল। অনেক নীচে পড়ে আছে একতাড়া কাগজ। পার্সেলের মতো বাঁধা। আর কিছুই নেই। হীরে নেই, পান্না নেই। গয়না উপচে পড়ছে না। সুকু হতাশ হতে বললে, "ধ্যুত। এই একতাড়া কাগজের জন্যে এত খাটুনি !"

"তুলে দ্যাখো না, কী কাগজ। এত যত্ন করে সিন্দুকে ভরা !"

কাগজের বান্ডিলটা সুকু তুলে নিল নিচু হয়ে। দলিলটলিল হবে মনে হয়। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওরা দুজনে ধীরে ধীরে নেমে এল নীচে। মাথায় ঝুল। সারা শরীরে ধুলো।

শেলি বললে, "সুকু, আজ তুমি এখানে থাকো না গো !"

"মা বকবে। বলে তো আসিনি।"

"তোমার মা কোনও দিন কাউকে বকেন না। আমি জানি।"

"ভাববেন তো ! কাল পূর্ণিমা। কাল থাকব।"

"ঠিক ? তিন সত্যি করো।"

"থাকব, থাকব, থাকব।"

গোমেজ বেতের চেয়ারে বসে এলোমেলো ভাবতে-ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। শেলি আলতো হাত কাঁধে রেখে নরম গলায় ডাকলে "বাবা।"

গোমেজ চমকে উঠলেন।

"চাবি লেগেছে।"

"অ্যাঁ, লেগেছে ?"

"চোরকুঠুরিতে একটা অদ্ভুত সুন্দর সিন্দুক আছে। তুমি জানতে ?"

"সিন্দুক !" গোমেজ ভাবনায় পড়লেন।

"তা কী পেলি ? পেলি কিছু ?"

"এই যে একতাড়া কাগজ।"

"কাগজ ? কী কাগজ ?"

"দ্যাখোই না।"

"ঘরের টেবিলে রাখ। পরে দেখব।"

pathagar.net

বনের পথ ধরে সুকু যখন বাড়ি ফিরে এল, তখন বেশ রাত। বারান্দা পেরিয়ে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে, চেয়ারে বসে ছিলেন মা। গম্ভীর গলায় বললেন, "দাঁড়াও।"

সুকু থমকে দাঁড়াল।

"কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ?"

রুকু ঘর থেকে বেরিয়ে এল, "আগে ওকে ভিতরে আসতে দাও মা, তারপর বকবে।"

"তুমি ঘরে যাও। সেই বেলা দুটোর সময় স্কুল থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিলে, আমাকে জানতে হবে।"

সুকু শান্ত গলায় বললে, "আমি কোনও অন্যায় করিনি, মা। সব শুনলে তুমি বলবে, ঠিক করেছিস, সুকু।"

সুকুর বলা আর গলা শুনে রাজ্যেশ্বরী থমকে গেলেন। বললেন, "জানিস তোর জন্যে আমি অনবরত ঘরবার করছি।"

"জানি মা, আমার কোনও উপায় ছিল না।"

"কারুর অসুখ?"

"না তুমি বোসো, আমি সব বলছি।"

"এখন থাক। আগে খেয়ে নে। মুখ শুকিয়ে গেছে।"

"পাঁচ মিনিট মা। পাঁচটা মিনিট সময় দাও আমাকে। তোমাকে না বললে আমি যে খেতে পারব না।"

সুকু ধীরে-ধীরে গোটা কাহিনীটাই মাকে শোনাল। কাঠ-কৈলাস কী বলেছে তাও বলল। কৈলাসের একটা কথা ভীষণ মনে লেগেছে, 'তোমার বাবার তো অনেক পয়সা, তাঁকেই বলো না টাকাটা শোধ করে দিতে।'

রুকু বললে, "পাজি!"

রাজ্যেশ্বরী ছেলেকে ধমক দিলেন, "ছিঃ, তোমরা যত বড় হচ্ছ, তত অসভ্য হয়ে যাচ্ছ। কৈলাসবাবু তোমাদের চেয়ে বয়েসে অনেক বড়, তাঁকে গালাগাল দিচ্ছ!"

"আমার রাগ হয়ে গেছে, মা।"

"রাগ দমন করতে শেখো। তোমরা আমাদের ছেলে। আমাদের আলাদা একটা সভ্যতা আছে।"

ডাক্তার মুখার্জি পুজো সেরে বাইরের বারান্দায় এলেন, "কী গো, তোমাদের কিসের সভা?"

রাজ্যেশ্বরী বললেন, "এখানে বোসো। কেস খুব সিরিয়াস।"

"সে তো জানি, কেস সিরিয়াস না হলে আমার কাছে আসবে কেন?"

"এ কেস সে কেস নয় গো।"

pathagar.net

রাজ্যেশ্বরী স্বামীকে সব বলে প্রশ্ন করলেন, "কী করা যায় ?"

ডক্টর মুখার্জি লাফিয়ে উঠলেন, "কী এত বড় কথা বলেছ ? আমি এখুনি যাব।"

"কোথায় ?"

"কৈলাসের কাছে।"

"কী করবে ? ঝগড়া ?"

"এই তোমার ধারণা ! জীবনে আমাকে ঝগড়া করতে দেখেছে ? একটা নতুন গাড়ি কিনব বলে ষাট হাজার জমিয়েছি। সেই টাকা থেকে পঞ্চাশ হাজার দিয়ে দোব।"

"তোমার এই গাড়িটা ঝরঝরে হয়ে গেছে।"

"যাক। ইঞ্জিন ঠিক আছে। একেবারে বাঘের বাচ্চা।"

"এক কথায় পঞ্চাশ হাজার দিতে তোমার কষ্ট হবে না ?"

"তোমার হবে ?"

"না।"

"তা হলে আমারও হবে না। কটা বাজল ?"

"সাড়ে ন'টা।"

"আমি আধঘণ্টার মধ্যে ঘুরে আসছি।"

"রুকুকে নিয়ে যাও।"

"নাঃ, বড়দের কথার মধ্যে ছোটদের না থাকাই ভাল।"

বসার ঘরে ফরাসে কাঠ-কৈলাস তাকিয়া ঠেসান দিয়ে আড় হয়ে পড়ে আছে। ষণ্ডামার্কা একটা লোক গায়ে পাউডার ছড়িয়ে ভীম-বিক্রমে ডলছে।

"আরে, আরে, ডাক্তারবাবু যে ! কী ভাগ্য ! যাঁকে কল দিয়েও পাওয়া যায় না, তিনি বিনা কলে এসে গেলেন। বৈঠিয়ে, বৈঠিয়ে। আরে, এ লখনুয়া, তু যা রে।"

লোকটা কুচকাওয়াজ করতে করতে বেরিয়ে গেল। কৈলাস ঢেকেঢুকে সোজা হয়ে বসল। কোলের ওপর তাকিয়া। ডক্টর মুখার্জির বিশ্রী লাগছিল। যত তাড়াতাড়ি লোকটার সামনে থেকে সরে পড়া যায়, ততই ভালো। কোনওরকম ভণিতা না করেই বললেন, "টাকাটা আমিই দোব।"

"কোন টাকা জি ?"

"গোমেজসায়েবের বাড়ি বন্ধকি।"

"অউর দেনেসে কেয়া হোগা ! কেয়া ফয়দা ! কোর্টের ডিক্রি তো হয়েই গেছে।"

pathagar.net

"আপনার একটু মানবতা নেই ?"

"মানবতা ? হাম তো মানব ছে। ও বাঙলোটা আমার চাই। বহত বড়িয়া ছে। ওখানে আমি একটা বড় মোটেল বানাব জি। বড়িয়া স্পট ছে।"

"আর ওই বৃদ্ধ শিক্ষক তাঁর মেয়েটিকে নিয়ে ভেসে যাবেন ?"

"তো হাম কেয়া করেগা। হামারা বিজনেস।"

"একটু ভেবে দেখবেন না ? কভি কভি শোচ্‌না তো পড়তাই।"

কৈলাস হা হা করে হেসে বললে, "আপনি আপনার লাইনে শোচুন, আমি আমার লাইনে। সম্পত্তি বহত্‌ গন্ধি চিজ ডাক্তারসাব।"

"বেশ ! তবে কী জানেন, কে কতদিন ভোগ করবে, এই হল কথা। আপনার হার্টের যা অবস্থা !"

"ডাক্তার হয়ে আপনি আমার মৃত্যু কামনা করছেন ? আজিব বাত। আমি মরলে আমার ছেলে ভোগ করবে। মউত কা বাঁত কোন্‌ বোলনে সেকে। রাত যাদা বেড়ে গেল, ডাক্তারসাব। আমার খানার টাইম হয়েছে। আপ কুছ খায়েঙ্গে ?"

"না।"

"তব তো ঠিক হ্যায়। রাগ করেছেন ?"

"না, রাগ নয়। দুঃখ পেয়েছি।"

"জীবন তো দুঃখেরই ডাক্তারবাবু। দুখহরণকো ভজনা চাহি। দুখতারণ করুণাময়। আরে এ লখনুয়া, খানা লাগা রে।"

সাড়ে দশটার সময় ডক্টর মুখার্জি ফিরে এলেন, গম্ভীর মুখে।

রাজ্যেশ্বরী জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল ?"

"একটা পিশাচ, বুঝলে। মানুষ নয়, পিশাচ। টাকাই সব। টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। আমি কাল সকালে গোমেজসায়েবের কাছে যাব কেসের কাগজপত্র দেখে ঠিক করব, পাল্টা কেস করা যায় কি না ! তেমন হলে, সায়েব আর তার মেয়েকে আমাদের এখানে রাখব। ঠাকুর আমাদের কোনও অভাব রাখেননি। বেশ চলে যাবে। বুকু-সুকুকে পড়াবেন। গৃহশিক্ষকের সম্মানে থাকবেন।"

"ওরাঁ যে খ্রিস্টান গো।"

"তাতে কী হয়েছে ? মুসলমানদের আল্লা, খ্রিস্টানদের গড, আমাদের ভগবান, আসলে তো এব এক।"

"এ-বোধ তোমার হয়েছে ?"

"অনেক আগেই হয়েছে।"

রাত নেমে এল মুখার্জি-বাড়িতে। ঘরে-ঘরে নিবে গেল সব আলো। বাগানের গাছে-গাছে ফুলের কুঁড়ি পৃথিবীর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে একটু-একটু করে মুখ খুলছে। ভোরবেলা ফুটতে হবে তো !

pathagar.net

ওদিকে বৃদ্ধ গোমেজ সেজ জ্বেলে সিন্দুক থেকে উদ্ধার করা পুরনো দলিলের বান্ডিল নিয়ে বসেছেন। বাইরে বাতাস বইছে হু হু করে। শেলি ঘুমিয়ে পড়েছে। চেয়ারে পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা ক্রাচ দুটোর ছায়া পড়েছে দেওয়ালে।

অসাধারণ একটা জিনিস পেয়েছেন গোমেজ। গুপ্তধনই বলা চলে। ও জেসাস্। গোমেজ ক্রস আঁকলেন বুকের কাছে। এই যে সেই কাগজ, তাঁর বাবা কৈলাসের বাবাকে বসতবাড়ি বাঁধা রেখে পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার দিয়েছিলেন। এ তো জানা ছিল না। তিনিও জানেন না, কৈলাসও জানে না। নিজেদের মধ্যে ব্যাপার, নিজেদের মধ্যেই চাপা ছিল। তারপর বাবার মৃত্যুর পর কৈলাসের ব্যবসা ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। সাবেক আটচালার জায়গায় ইমারত তুলেছে। এদিকে বন্ধকি দলিল পড়ে আছে গোমেজের মায়ের পর্তুগিজ সিন্দুকে! ও জেসাস্!

চেয়ারের পাশ থেকে ক্রাচ দুটো বগলে নিয়ে গোমেজ মধ্যরাতের বাগানে নেমে এলেন। চাঁদের আলোয় মোরাম বিছানো সাদা পথ। দূরে ফোয়ারার মাথায় সাদা পরী। এইমাত্র যেন কোথা থেকে উড়ে এসে বাগানে বসেছে। কেউ কোথাও নেই, কিন্তু গোমেজের মনে হচ্ছে, কেউ যেন আছে। আরও একজন। সব সময় তাঁকে রক্ষা করাই যার চেষ্টা। ওই যে চাবিটা! চাবিটা এল কোথা থেকে? কে রেখে গেল কাঠের ডাব্বায়! কৈলাসের নিজের জমিই তো তাঁর বাবার কাছে বহুদিন বাঁধা পড়ে আছে। এ-কথাও লেখা আছে দলিলে, 'কোনও কারণে টাকা শোধ করতে না পারলে আমার ব্যবসায় আপনার বা আপনার বংশধরের ভাগ থাকবে।'

লোহার বেঞ্চিতে বসে গোমেজ ভাবতে লাগলেন, 'এই তো আমার গুপ্তধন। পঞ্চাশ হাজার এতদিনে সুদে বেড়ে নিশ্চয় এক লাখ হয়েছে। তা ছাড়া ওই অতবড় কাঠের কারবারের আমিও তো অংশীদার।'

মধ্যরাতের খই-ফোটা বাগান। দামাল-বাতাস। একা বসে বৃদ্ধ গোমেজ। বাতাসে চুল উড়ছে।

একঝাঁক তারা তাকিয়ে আছে নীচের দিকে। চাঁদ হাসছে দূর পাহাড়ের মাথায়।

॥ ৬ ॥

পরের দিন সকালেই ডক্টর মুখার্জি আর সুকু এলেন গোমেজসায়েবের বাগানে। ঝনঝনে তাজা বাতাসে ইউক্যালিপটাসের গন্ধ মাখামাখি হয়ে আছে। আকাশের গায়ে নীল পাহাড় সবে যেন স্নান করে উঠল।

সুকুর বাবার হাত দুটো নিজের মুঠোয় ধরে বৃদ্ধ গোমেজ আবেগে কাঁপছেন। দু'চোখে জল চিকচিক করছে। ধরা-ধরা গলায় বললেন, "আপনারা

pathagar.net

আমার জন্যে এত ভাবেন ? এত ভালোবাসেন আমাকে ! কেন কৈলাসের কাছে গেলেন অপমানিত হতে ?"

"আপনি একজন নামী শিক্ষক। শ্রদ্ধেয়। আপনার মেয়েটি আমারও মেয়ে। আপনার আপনজন কেউ না থাক, আমরা আছি। আমি আপনার সব শোধ করতে চেয়েছিলুম ; কিন্তু লোকটা অসম্ভব লোভী।"

গোমেজ এতক্ষণ একেপায়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এইবারে ক্রাচে শরীরের ভর রাখলেন। বারান্দায় এসে বসলেন সকলে।

শেলি বললে, "কাকাবাবু, বসুন, আমি এখুনি চা আনছি।"

ডক্টর মুখার্জি মিষ্টির প্যাকেট শেলির হাতে দিতে-দিতে স্নেহের গলায় বললেন, "মা আমার। এ ফেয়ারি। অ্যান এঞ্জেল।"

বুকের কাছে মিষ্টির প্যাকেট দু'হাতে আঁকড়ে ধরে শেলি ভয়ে-ভয়ে বাবার মুখের দিকে তাকাল। নেবে কি নেবে না ! গোমেজ হেসে অনুমতি দিলেন।

গোমেজ ডক্টর মুখার্জিকে বললেন, "একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল কাল রাতে।"

"কী রকম ?"

"বহুকালের পুরনো এক সিন্দুক থেকে হঠাৎ এই কাগজগুলো পেয়ে গেলুম। ওই যে টেবিলের উপর। ওর মধ্যে একটা হল বন্ধকি দলিল। কৈলাসের বাবা আমার বাবার কাছ থেকে বসতবাড়ি বাঁধা রেখে পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন। আমার বাবা কী-রকম মানুষ ছিলেন, জানেন আপনারা। বিপদে সাহায্য করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। দলিল একটা করাতে হয়, তাই করিয়েছিলেন। আর ফেলে রেখেছিলেন এমন এক সিন্দুকে, যেটার কোনও ব্যবহার ছিল না। সাজিয়ে রাখার জন্যে তৈরি। ধার দেবার শর্তে এও বলা আছে, এই পরিবারের উত্তরপুরুষ কারবারের এক-চতুর্থাংশের মালিক হবে।"

"তার মানে কৈলাস জানেই না, আপনি তার জমি, বাড়ি এক পুরুষ আগেই দখল করে বসে আছেন। সে যা কিছু করেছে, সবই করেছে আপনার জমির ওপর। হায় মানুষের ভাগ্য ! এবার তা হলে আমরা একটা পালটা কেস ঠুকে দি।"

"প্রথমে আমিও তাই ভেবেছিলুম। তারপর ভাবলুম, লোভ ভাল নয়। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। তা ছাড়া আমার বাবা ব্যাপারটাকে আমাদের চোখের আড়ালে রাখতে চেয়েছিলেন। তা চোখের আড়ালেই থাক। কী হবে ! কী আর হবে ! ভেসেই না হয় যাই। দেখি না কী হয় !"

"এ কী বলছেন ? পাওনার টাকা বুঝে নিতে হবে না। একটা অসভ্য, লোভী মানুষের সঙ্গে এ সব-চলে না। টিট ফর ট্যাট। উঠুন। চলুন আপনার উকিলের কাছে।"

pathagar.net

গোমেজসায়েবকে জোর করে তোলা হল। সুকু আর শেলি রইল বাড়িতে। মিনিট পনেরোর মধ্যে উকিল-বাড়ি। গ্রোভার খুব জাঁদরেল উকিল। এক সময় গোমেজসায়েবের ছাত্র ছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে দলিলটা পরীক্ষা করে মুখ তুলে তাকালেন।

ডঃ মুখার্জি আশার চোখে, উজ্জ্বল মুখে জিজ্ঞেস করলেন, "কী মিস্টার গ্রোভার, এইবার কৈলাসকে নিশ্চয় কাত করা যাবে?"

গ্রোভার করুণ হেসে বললেন, "আমি একটা মূর্খ। মহামূর্খ। আপনাদের চোখে পড়েনি। না পড়ুক। আমার প্রথমেই চোখে পড়া উচিত ছিল। এতক্ষণ ধরে দেখার প্রয়োজন ছিল না।"

"কেন, কী হল?"

"এ-দলিলে দু'পক্ষের কারুরই সই নেই। এটা একটা কপি। আসলটা কোথায়! নিশ্চয়ই আছে কোথাও! ভাল করে খুঁজে দেখুন, স্যার! আসলটা পেলে ভীষণ ব্যাপার হয়ে যাবে। আপনি, স্যার, বড়লোক হয়ে যাবেন। সারা জীবন আপনার আর কোনও দুঃখ থাকবে না।"

গোমেজসায়েবের চেয়ারের পাশ থেকে ক্রাচ টেনে নিলেন। বগলে লাগিয়ে সোজা উঠে দাঁড়ালেন। ডানপাশে ঘুরে গিয়ে চেয়ার আর টেবিলের মাঝখান থেকে নিজেকে বের করে আনলেন। তারপর হেসে উঠলেন হা হা করে। বহুকাল হাসেননি এমন প্রাণখোলা হাসি।

হাসি থামিয়ে বললেন, "লোভ। লোভে আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আবার আমি আমার দৃষ্টি ফিরে পেয়েছি। লর্ড জেসাস আমাকে পথ দেখাবেন।"

ঘুরে দাঁড়ালেন গোমেজসায়েব। সামনে খোলা দরজা। তারপরেই পথ। সোজা চলে গেছে দূর পাহাড়ের দিকে। গোমেজসায়েব খটখট করে এগিয়ে চললেন দরজার দিকে।

গ্রোভার বললেন, "স্যার, আপনার কাগজ। অল ইওর পেপারস।"

"বার্ন দেম। ইউসলেস গ্যারবেজ।"

ডক্টর মুখার্জি তাড়াতাড়ি পিছু নিলেন, "যাবেন কোথাও? দাঁড়ান, দাঁড়ান। আমি তো আপনাকে পৌঁছে দেব?"

গোমেজসায়েব গাড়ি পেরিয়ে ততক্ষণে বেশ কিছু দূর এগিয়ে গেছেন। আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "ব্রাদার, এরপর আমাকে তো একাই হাঁটতে হবে। আমাকে অভ্যাস করতে দাও। আমার মনোবল ভেঙে দিও না। আমি এখন চার্চে যাব। তুমি ভেবো না।"

গোমেজ ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছেন। বেশ দ্রুতই। পেছনে অনুসরণ করছে তাঁর ছায়া।

pathagar.net

গ্রোভার মুচকি হেসে টেলিফোনের রিসিভার তুলে কৈলাসের নম্বর নিতে নিতে, অনুচ্চ গলায় বললেন, "বোকা মাস্টার।" ওপাশ থেকে ভেসে এল কৈলাসের গলা, "কওন ?"

"গ্রোভার। শুনিয়ে। আমার হাতে একটা জিনিস আছে, যা দিয়ে তোমাকে বধ করা যায়। হ্যাঁ, একেবারে শেষ করে দেওয়া যায়। কী জিনিস ? গেলেই দেখতে পাবে। যাচ্ছি। যাচ্ছি। টাকা রেডি রেখো। আমার টাকা চাই। এক লাখ।"

ফোন ছেড়ে গ্রোভার হাসছেন। মানি, মানি, মানি।

ডক্টর মুখার্জি স্টার্ট বন্ধ করলেন। কী হল ব্যাপারটা ? ডাক্তারের চোখ। এ তো ভুল হবার কথা নয়। সই আছে। কালোকালির সই। বাদামি হয়ে এসেছে। দরজা খুলে নেমে এলেন। দৌড়ে গিয়ে ঢুকলেন। গ্রোভারের বৈঠকখানায়।

ঘরে গ্রোভার নেই। টেবিলে পড়ে আছে ভাঁজ করা সেই দলিল। গ্রোভার ভাবতেও পারেননি, মুখার্জি বা স্যার আবার ফিরে আসতে পারেন। মুখার্জি ছোঁ মেরে দলিলটা তুলে নিয়ে, পায়ের কোনও রকম শব্দ না করে সোজা গাড়িতে। জীবনের প্রথম চুরি। বুক কাঁপছিল। নিশ্বাস পড়ছিল দ্রুত। নতুন ব্যাটারি। গাড়ি চাবুকের মতো স্টার্ট নিল। একেবারে ষাটে স্পিড তুলে দিলেন।

দূরে, ওই যে চলেছেন বৃদ্ধ গোমেজ। ক্রাচে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। মুখার্জি মনে মনে বললেন, 'আমি আপনার ভাগ্য। ভাগ্যের পরোয়া যে করে না, ভাগ্য এসে তারই হাত ধরে।' একেবারে পাশে গাড়ি থামিয়ে মুখার্জি দরজা খুলে দিয়ে বললেন, "গেট ইন স্যার।"

"আই শ্যাল ওয়াক। আমি হাঁটব। আই ক্যান ওয়াক।"

"পরে, পরে হাঁটবেন। এখন হাঁটলে বিপদ হতে পারে। কুইক।"

গাড়ির গতি আশি। গোমেজের কোলে রাবার ব্যান্ড জড়ানো দলিলটা ছুড়ে দিয়ে বললেন, 'গ্রোভার ইজ এ স্কাউন্ড্রেল।'

গোমেজসায়েব চুপচাপ। কথা নেই মুখে। তাকিয়ে আছেন সামনে। গাড়ি চলেছে ঝড়ের বেগে। সত্তর,আশি। আশি, সত্তর।

হঠাৎ বললেন, "আমরা যাচ্ছি কোথায় ?"

"পিটার মিত্রের কাছে। আমার উকিল। যাকে বিশ্বাস করা যায়।"

"আপনি গাড়িটা ঘুরিয়ে আর-একবার গ্রোভারের কাছে নিয়ে যাবেন ?"

"কেন ?"

"একটা কথা। জাস্ট ওয়ান ওয়ার্ড উইথ হিম।"

"ও তো অপরাধী। এ ক্রিমিন্যাল।"

"লর্ড জেসাস বলে গেছেন, হেট দি সিন, নট দি সিনার।"

pathagar.net

গাড়ি ঘুরে এল গ্রোভারের বাড়ির সামনে। ক্রাচে ভর দিয়ে নেমে এলেন গোমেজ। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন। পেছনে ডাক্তার। সামনের ঘরে টেবিলে বসে গ্রোভার। বিধ্বস্ত চেহারা। সারা ঘর ওলটপালট। যেন ঝড় বয়ে গেছে। গোমেজসায়েবকে দেখে ভূত দেখার মতো লাফিয়ে উঠলেন।

"স্যার, আপনি ?"

"হ্যাঁ, আমি। তোমার কাছে ফিরে এলুম, সামান্য একটা প্রায়শ্চিত্ত বাকি আছে, মাই সান। তুমি আমার ছাত্র ছিলে। আমি তোমার শিক্ষক। ব্যর্থ শিক্ষক। তোমাকে আমি মানুষ হবার শিক্ষা দিতে পারিনি। তার কারণ আমি নিজেই হয়তো মানুষ হতে পারিনি। আমি লোভী, তুমি নির্লোভ হবে কী করে ? এই দ্যাখো, এই সেই দলিল।

ক্রাচে ভর রেখে একপাশে হেলে গোমেজ পকেট থেকে কী একটা বের করলেন।

গ্রোভার কাঁপছেন, ভয়ে-লজ্জায়।

কেউ কিছু বোঝার আগে লাইটারের লকলকে আগুনে দলিলের কোণটা ধরলেন, "তোমার আর আমার লোভ পুড়ে শেষ হয়ে যাক।"

"ও নো !"

গ্রোভার ওপাশ থেকে, ডক্টর মুখার্জি এপাশ থেকে, লাফিয়ে এলেন। দলিল, লাইটার, বগলের ক্রাচ ছিটকে চলে গেল। গোমেজসায়েব পড়ে যেতে-যেতে চেয়ার ধরে সামলে নিলেন নিজেকে।

আর ঠিক তখনই একটা নীল রঙের গাড়ি এসে থামল বাইরে। নেমে এল কৈলাস। কাঠ-কৈলাস। গায়ে ধবধবে সাদা, গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, ঢোলা পাজামা। গাড়ির গরমে ঘেমে গেছে।

দলিলের একটা কোণ সামান্য একটু পুড়েছে মাত্র। মেঝে থেকে তুলে নিয়ে গ্রোভার বললেন, "কৈলাসবাবু, আপনি যে বাড়িটায় আছেন, সেটা আপনার নয়।"

"কেয়া। দিমাক গড়বড় হো গিয়া।"

"সেই ঝড়িটা আমার স্যারের। আর এই তার প্রমাণ। দলিল।" কৈলাস একটা চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ল।

ওদিকে পিচ ফলের গাছের নিচে বসে আছে সুকু আর শেলি। শেলির কোলে একটা পাকা পিচ। গাছের প্রথম ফল।

"খাব ?"

শেলি ফলটা তুলে দিল সুকুর হাতে।

pathagar.net

ফলটার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে সুকু বললে, "কী সুন্দর ! খেতে মায়া হচ্ছে, তোমার কোলেই থাক।"

"কখন গেছেন ওঁরা ? কবে আসবেন ?"

গাড়ির শব্দ। মোরামের পথ ধরে গাড়ি আসছে। সুকু আর শেলি ছুটল 'বাবা' 'বাবা' বলে ! গোমেজ নেমে এসে গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ডক্টর মুখার্জি দুটো আঙুল 'ভি'-এর মতো করে দেখালেন।

"ভিকট্রি, ভিকট্রি।" সুকু লাফাচ্ছে। গোমেজ আর মুখার্জি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখছেন, সুকু আর শেলি নয়, ভবিষ্যৎ যেন আনন্দে নাচছে।

Book No 410
Date 1.9.2005

বই নং
তারিখ
ফোন

pathagar.net